সমকালীন ছোটগল্প

ডঃ দিলীপ মালাকার

প্রকাশ ভবন
১৫, বঙ্কিম চাটুজ্জ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রথম সংস্করণ : মাঘ, ১৩৭১

প্রকাশক :
শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
প্রকাশ ভবন
১৫, বঙ্কিম চ্যাটুজ্যে ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২

মুদ্রক: শ্রীসতীশ চন্দ্র সিকদার
বন্দনা ইম্প্রেশন প্রাইভেট লিমিটেড,
৯এ, মনমোহন বসু ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদ পট
শ্রীকানাই পাল

৺জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর স্মৃতির উদ্দেশে

সম্পাদকের কথা

সংখ্যাধিক্য এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিচারে বাংলাসাহিত্যে, কবিতাকে বাদ দিলে ছোট গল্পের জুড়ি নেই। বিশেষকরে কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে অনেকেই একথা স্বীকার করবেন, সার্থকতা ও সাফল্যে ছোট গল্প এখনও শীর্ষস্থানে রয়েছে। ফলতঃ একথা বলতে বাধা নেই যে, ছোটগল্পের সঙ্গে নিবিড় পরিচয় ছাড়া বাংলাসাহিত্যের হৃদস্পন্দনটুকু সঠিকভাবে অনুধাবণ করা সম্ভব নয়। অথচ, ছোটগল্প পাঠক এও নিশ্চয়ই লক্ষ্য করে আসছেন, পত্রপত্রিকার বাইরে স্বতন্ত্র-ভাবে অর্থাৎ গ্রন্থাকারে ছোটগল্পের প্রকাশ ক্রমশঃ সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে। যথেষ্ট জনপ্রিয়তা থাকাসত্ত্বেও গল্পের বই প্রকাশের এই দৈন্যের কারণ কি তা আমরা জানি না। প্রকাশকেরা এ ব্যাপারে ব্যবসায়িক অসাফল্যের দোহাই দিয়ে থাকেন। একথা কি সত্যি, না যথার্থ উদ্যোগ এবং সদিচ্ছার অভাবই হল গল্পগ্রন্থ প্রকাশের আসল বাধা। কারণ যাই হোক না কেন এ দৈন্য যে বাংলা সাহিত্যের অগ্রগতির পক্ষে দুর্লক্ষণ তাতে সন্দেহ নেই। এসব কথা জেনেই আমরা এই সংকলন গ্রন্থ প্রকাশে দুঃসাহসী হয়েছি।

সংকলনে মোট তিরিশটি গল্প আছে। প্রথমেই বলে রাখা ভালো 'সমকালীন ছোটগল্প' শুধুমাত্র একালের প্রতিষ্ঠিত ছোট গল্পকারদের সুনির্বাচিত গল্পের সংকলন নয়। এখানে যেমনি অতিপরিচিত লেখকদের লেখা স্থান পেয়েছে, তেমনি তার পাশাপাশি এমন অনেক লেখকের লেখা ভিড় করেছে যারা সাহিত্যের ক্ষেত্রে একেবারেই নবাগত। অর্থাৎ, সংকলনটি নিশ্চয়ই একালের

প্রতিনিধি স্থানীয় গল্পসংগ্রহ নয়। আমাদের উদ্দেশ্য হল মোটামুটি ভাবে তিনদশক ধরে বাংলা ছোট গল্পের ক্ষেত্রে যে পরীক্ষা নিরীক্ষা চলেছে তার সঙ্গে পাঠকসাধারণকে পরিচয় করিয়ে দেওয়া। সেদিক থেকে এই সংকলনকে একই সময়পরিধির মধ্যে বিভিন্ন প্রজন্মের লেখকদের অভিজ্ঞতা ও অভিব্যক্তির একটি বিচিত্র নকশীকাঁথা বলতে পারেন।

প্রলয় সেন

গল্পক্রম

জীবনের আয়নায়

অন্নদামোহন বাগচী

রত্নাকে যে এখানে এভাবে আবার কোনদিন দেখতে পাব—তা স্বপ্নেও ভাবিনি। ছয় বছর পরে, এমন একটা আকস্মিক চমক যে আমার জন্য অপেক্ষা করেছিল,—তা আমার কাছে একান্তই অপ্রত্যাশিত। নিজের বুকের মধ্যে হাতড়ে দেখলাম—, সেদিনের সেই বঞ্চনার ব্যথা, আর হৃদয়ের রক্তক্ষরণ কবেই বন্ধ হয়ে গেছে। ওর স্মৃতি জীবনের পাতা থেকে একেবারে মুছে ফেলেছি।···

এই শহরে এর আগে আমি আর কোন দিন আসি নি। এখানকার প্রগতি-নাট্যম্ নামের একটি সুপ্রতিষ্ঠিত সাংস্কৃতিক সংস্থা আমার লেখা একটা নাটক মঞ্চস্থ করছেন। তারই প্রথম অভিনয় রজনীর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবার জন্য কর্তৃপক্ষ আমাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়ে আমন্ত্রণ করেছেন। উদ্বোধন করবেন—ঐ এলাকা থেকে নির্বাচিত প্রথম সারির একজন মন্ত্রী। আর প্রবীণ অতিথি হবেন মহকুমা-হাকিম। যাকে বলে এলাহি কাণ্ড।

কর্তৃপক্ষ আমাকে শুধু নিমন্ত্রণ জানিয়েই ক্ষান্ত হন নি, আমার উপস্থিতিকে অনিবার্য করার জন্য আমাকে মানিঅর্ডার করে পঞ্চাশটা টাকাও পাঠিয়ে দিয়েছেন পথের খরচ বাবদ। অতএব না এসে পারিনি। সেই উপলক্ষে গতকাল সন্ধ্যার ট্রেনে এখানে এসে পৌঁচেছি। তারপর রাত দুটো পর্যন্ত অভিনয় দেখে, স্থানীয় ডাকবাংলায় আমার জন্য সংরক্ষিত ঘরে ফিরে এসে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। আমার বরাবরই খুব ভোরে শয্যাত্যাগ করা অভ্যাস। আজ উঠতে একটু দেরি হল, তবুও খুবই ভোরে উঠেছি বলতে হবে। ডাকবাংলার আশেপাশের বাড়ীঘরে সাড়া শব্দ নেই। চৌকিদার উঠেছে বলেও মনে হল না। উঠলে এতক্ষনে বেডটি দিয়ে যেত। ডাকবাংলার সামনে জাতীয় সড়কে আনাজপাতি নিয়ে কয়েকখানা গরুর গাড়ি যেতে দেখলাম। মাঝে মাঝে দুই একখানা রিক্সাও চোখে পড়ল। কোনটায় লোক আছে, কোনটা বা খালি। আজই দুপুরের ট্রেনে আমি ফিরে যাব। তাই ভাবলাম—এই ফাঁকে ঘণ্টাখানেক ঘুরে শহরটা একবার দেখে আসি।

তাই সোজা রাস্তা ধরে হাঁটতে শুরু করলাম। বোধহয় মিনিট কুড়ি হেঁটেছি, হঠাৎ পেছন থেকে কচি গলায় কে যেন ডেকে উঠল—মামা। ও মামা। একটু দাঁড়ান্ না। চমকে উঠে পিছনে তাকিয়ে দেখি বছর দশেকের—ফ্রকপরা একটি মেয়ে ছুটতে ছুটতে আমার পিছনে এসে দাঁড়িয়ে ডাকছে। ওকে চিনি

না। কাকে ডাকতে ভুল করে কাকে বা ডাকছে। পিছন ফিরে ওর দিকে তাকিয়ে বললাম—তুমি কাকে ডাকছ খুকী ?

ছুটে আসার জন্য ও তখনও হাঁপাচ্ছিল। একটু থেমে দম নিয়ে মিষ্টি হেসে বলল—কাকে আবার! আপনাকে।—আমাকে ? আমাকে তুমি চেন ?—ও ঘাড় নেড়ে বেণী দুলিয়ে মিষ্টি হেসে বলল—পিসী চেনে। আপনাকে দৌড়ে ডেকে আনতে বলল। ঐতো দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে!—ও আঙুল তুলে অদূরে একটা একতলা পুরানো বাড়ী দেখিয়ে দিল। দরজার বাইরে একজন মহিলা দাঁড়িয়ে আছেন, স্পষ্ট দেখা গেল।

এবারে আমি মনে মনে রীতিমত ভয় পেয়ে গেলাম। অচেনা জায়গা। আমি নবাগত। কে না কে কাকে ডাকছে। আমার চেনাজানা এখানে কেউ আছে বলে জানিনা। আমাকে ঐ মহিলা কী করে চিনলেন, আর ডাকছেনই বা কেন ? আমি রীতিমত বিব্রত বোধ করলাম। আশেপাশে চোখ বুলিয়ে নিলাম, একটা লোকও চোখে পড়ল না। ডুবন্ত মানুষের মত পায়ের নীচে মাটি হাতড়াতে হাতড়াতে বললাম—তোমার পিসী কে, আমি তো তাকে চিনি না খুকী। মেয়েটি আমার হাত চেপে ধরে টানতে টানতে বলল—চলুন না মামা, দেখলেই চিনতে পারবেন। ঐ তো একটু আগেই বাড়ি। আসুন আমার সঙ্গে।

আমার দ্বিধা কাটছে না। চিনি না জানিনা, কাকে বলতে কাকে ডাকছে। অতদূর থেকে মহিলাটি হয়তো চিনতে ভুল করেছেন। কী করব বুঝে উঠবার আগেই ঐ বাড়ি থেকে একজন মহিলা সদর দরজা পেরিয়ে—রাস্তায় এসে দাঁড়িয়ে, আশেপাশে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকলেন, আমি ডাকছি। আমি রত্না। এসো। আমার কতদিনের চেনা গলা, আজও সেই তেমনি আছে। সেই কণ্ঠস্বর—সেই সুরেলা আহ্বান, আমি চমকে উঠলাম। এখানে—এই মফঃস্বল মহকুমা শহরের একপ্রান্তে—এই জীর্ণ রঙচটা বাড়িতে তো ওর থাকবার কথা নয়। সুবিমল কলকাতার একটা বড় অফিসের এক্‌জিকিউটিভ অফিসার। মদে আর রেসে দারুণ আসক্তি।

আমাদের বন্ধুমহলে ও ছিল মধ্যমণি। রত্নার সঙ্গে আমিই ওকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলাম—আমার ভাবী স্ত্রী বলে। বিয়ের কথাবার্তা পাকা হয়ে গিয়েছে—উভয় পক্ষ থেকেই। মাসখানেকও আর দেরি নেই। কিন্তু শেষ-পর্যন্ত বিয়ে হলনা। কদিনের মধ্যেই সুবিমল আমাকে টপকে অনেক খানি এগিয়ে গেছে। তার চেহারা, গাড়ি, বাড়ি, আর চাকরির জৌলুস চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছে ওদের সবাইকে। বিশেষ করে রত্নাকে। আমি তখন কলকাতায় নেই। বিয়ে উপলক্ষে মাসীমাকে আনতে গিয়েছি আগ্রায়। মেসোমশাই কলেজের প্রিন্সিপাল। কদিনের মধ্যেই গভর্নর আসবেন। তাই ছুটি মিলবে না। আগ্রায় গিয়ে এদিকে ওদিকে ঘুরে সব দেখে বেড়িয়ে দিন দশবারো পরে যখন কলকাতায় ফিরে এলাম, তখন ওদের বিয়ে হয়ে গেছে।

জাতপাতে মিল হয় নি, তাই রেজিস্ট্রি করে বিয়ে হয়েছে।···সেদিন নিভৃতে অনেক চোখের জল আর বুকের রক্ত ঝরিয়েছিলাম। আর নিজেকে যতটা অপমানিত বোধ করেছিলাম, আহত বোধ করেছিলাম তার অনেক বেশি। সে আঘাত আমার হৃদয় নিঙড়ানো ভালবাসায়, সে আঘাত আমার অতলান্ত বিশ্বাসে! সুবিমল পরে আমার সঙ্গে দেখা করে, আমাকে নিমন্ত্রণ করে, সস্ত্রীক গাড়ী নিয়ে আমাকে নিয়ে যেতে এসেছিল। অসুখের অজুহাত দেখিয়ে আমি যাইনি। সেই সন্ধ্যায় শাড়ী গয়না আর প্রসাধনের চাকচিক্যে ঝলমলে রত্না কিন্তু একবারও চোখ তুলে তাকায়নি আমার দিকে। ওদের বিদেয় করে ঘরে ফিরে এসে আমি দরজা বন্ধ করে দিয়ে—শেষবারের মত আর একবার কেঁদেছিলাম। সেই শেষ দেখেছি রত্নাকে, আর ছয় বছর পরে আজ আবার প্রথম দেখলাম।

কাছে গিয়ে বিস্ময়ে ফেটে পড়লাম—রত্না, তুমি এখানে!

ঠোঁটের কোণে একটু ম্লান হাসি ফুটিয়ে রত্না বলল—ভিতরে এস। তারপর মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বলল—সদর দরজা বন্ধ করে দিয়ে বাইরের ঘরে পড়তে বোস।

রত্নার পিছু পিছু একটা ঘরে এসে ঢুকলাম। শোবার ঘর। একটা অতি সাধারণ খাটে ততোধিক পারিপাট্যহীন বিছানায় পাশাপাশি দুটো বালিশ। আসবাব বাহুল্যবর্জিত ঘর। একবার ঘরটার চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিলাম। মাথার উপরে এ্যাসবেস্টেসের ছাদ। দরজা ঐ একটাই। দক্ষিণ দিকে পাশাপাশি দুটো জানালা। ঘরের এককোণে একটা কুঁজো। মাথার উপরে একটা প্লাষ্টিকের গেলাস। মাঝখানে একটা অতি সাধারণ টেবিল। তার উপরে অগোছালো অবস্থায় একটা আয়না আর টুকিটাকি মেয়েলি প্রসাধনের সস্তা গোটা কয়েক সামগ্রী। সামনের দিকে দড়ি দিয়ে বাঁধা—এক বাণ্ডিল খাতা। খুব সম্ভব ইস্কুলের পরীক্ষার খাতা। রত্না কী মাষ্টারী করে? ঘরে একখানা মাত্র হাতলহীন চেয়ার। সেটাতে আমি বসেছি। রত্না একটু দূরে একটা মোড়ায় বসেছে। চোখ তুলে তাকালাম ওর দিকে। ও একদৃষ্টে আমার দিকেই তাকিয়েছিল। চোখে চোখ পড়তে চোখ সরিয়ে নিল। ছয় বছর পরে দেখছি। দেহে কিছুটা বয়সের ছাপ পড়েছে, কিন্তু সৌষ্ঠব আর সৌন্দর্য—এতটুকুও ম্লান হয় নি। সেই টানা টানা কালো চোখ। আমি আদর করে বলতাম—মৃগনয়না। তা আজও তেমনি আছে। আছে বাঁ গালের ঠোঁটের পাশে সেই ছোট্টো কালো তিলটাও। হাসলে এখনও বোধহয়—আগের মত ফরসা গালে টোল পড়ে। ও মুচকি হেসে বলল—কী দেখছ এমন করে? চিনতে পারছ না বুঝি?

আমার উত্তরের অপেক্ষা না করেই রত্না আবার বলে উঠল—আমি কিন্তু কাল রাত্তিরে স্টেজের উপরে এস. ডি. ওর পাশে তোমাকে দেখেই চিনতে পেরেছি।

খুব সুন্দর নাটকখানা লিখেছ তো। আর এরা করেছে যা একখানা। ছয় ছয়খানা মেডেল ডিক্লেয়ার হয়ে গেল; তার মধ্যে মিনিষ্টারেরটা তো সোনার! এ কী চাট্টীখানা কথা! আমি তো চোখের জল মুছে শেষ করতে পারিনে। আর আমার পাশে বসে—ঐ ছুঁড়িটা তো কেঁদে সারা।

—এতক্ষণে কথা বলার যেন একটা সুযোগ পেয়ে গেলাম। বললাম—ও মেয়েটা কে?

—আমার দাদার মেয়ে। আমার বড়দাকে মনে আছে তো তোমার? সেই সতীশদার মেয়ে রিংকু। তুমি যখন ও বাড়িতে যেতে তখন ওকে খুব ছোট দেখেছ, তাই হয়তো মনে নেই।

—ও এখানে থাকে বুঝি?

—ওকে আমার কাছে এনে রেখেছি, পড়াচ্ছি। ওহো! তোমাকে বলা হয়নি, আমি এখানে গভর্নমেন্ট গার্লস স্কুলের এ্যাসিষ্টেণ্ট হেডমিষ্ট্রেস! একা থাকি, তাই দাদাকে বলে ওকে নিয়ে এসেছি।

অনেকগুলো নতুন কথা কানে গেল, কিন্তু কিছুই স্পষ্ট হল না। বললাম, সুবিমল কোথায়?

রত্নার মুখখানা সহসা কঠিন হয়ে উঠল। দাঁতে দাঁতে চেপে কেমন যেন হিংস্র গলায় বলে উঠল, আজ চার বছরের বেশি হল—আমাদের ডিভোর্স হয়ে গেছে!

চমকে উঠলাম—এ খবর তো আমি কিছুই জানি নে!

শানিত গলায় রত্না বলল—যেমন বেহেড মাতাল, আর তেমনি ডিবচ্। লাজলজ্জা, ভয়ডর কিছু ছিলনা। রেসে মুঠো মুঠো নোট হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়ে সাহেব কনসোলেশ্যান পাবার জন্যে পার্কষ্ট্রিটের ব্রথেল থেকে রাস্তায় দাঁড়ানো মেয়ে বগলদাবা করে, বাড়িতে এনে ফুর্তি সারতে শুরু করেছিল।

বলতে বলতে রত্না ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল—তুমি জান ডাক্তার, এই দুটো বছরের মধ্যে স্কাউণ্ড্রেলটা আমাকে শেষ করে ফেলেছে। আমি···আমি ফুরিয়ে গেছি।

আমি নির্বাক শ্রোতা, নীরব দর্শক। মুখে একটা সান্ত্বনার কথাও জোগাল না। রত্না হঠাৎ মোড়া ছেড়ে ছিটকে উঠে এসে আমার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে—আমার হাত চেপে ধরে কান্নাভেজা গলায় বলে উঠল—তোমার অভিশাপেই আজ আমার এই দুর্দশা! আমি জানি, তুমি কোনদিনই আমাকে ক্ষমা করতে পারবে না। আর তা চাইবার মুখও আমার নেই। আমার মুখ আমি যে নিজেই পুড়িয়েছি। সেদিন যে আমাকে কী মরণ দশায় ধরেছিল, হীরে ফেলে কাঁচ আঁচলে বেঁধেছিলাম।

আমি একটা মোচড় দিয়ে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। বললাম—একটা কথা তুমি ভুল বলেছ রত্না, অভিশাপ আমি কোনদিন কাউকে দিইনা, তোমাকেও দিইনি!

রত্নাও আমার সঙ্গে সঙ্গে উঠে বিস্মিত গলায় বলল—ও কী! উঠলে কেন? তোমাকে ডাকতে পাঠিয়ে—আমি চায়ের জল চাপিয়েছি। আমি চা করে আনছি। বসো, চা খেয়ে যাও।

মুচকি হেসে বাঁকা গলায় বললাম—আমার জীবনে অনেক কিছুর মতই ওটাও আমার কপালে নেই। এখন যাই। ওঁরা হয়তো এসে আমার জন্য বসে আছেন ডাকবাংলায়। রত্না পাগলের মত ছুটে এসে আমার হাত চেপে ধরল—কতদিন পরে দেখা হল, কত কথা জমে আছে বুকের মধ্যে। এখনই যাবে কী? লক্ষ্মীটি, আর একটু বসো, চা করে নিয়ে আসি। খেতে খেতে গল্প করব।

আমি জোর করে হাত ছাড়িয়ে নিলাম। বললাম—তুমি তো জান রত্না, কোন ভাল জিনিষ আমার ফাটা কপালে সয় না। আজও সইবেনা।—আমি জোরে পা চালিয়ে সদর দরজা খুলে রাস্তায় এসে পড়লাম। হঠাৎ কি মনে হল—পিছনে ফিরে তাকালাম। রত্না দরজায় মাথা রেখে চোখে আঁচল চাপা দিয়ে ফুলে ফুলে কাঁদছে।

মনটার ভিতরে কেমন যেন করে উঠল। ভাবলাম—এগিয়ে গিয়ে রুমাল দিয়ে ওর চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে আসি। পরক্ষণেই মনে পড়ল—অভিনয়ের শেষে যবনিকা পতনের পরে—দর্শকদের তো আসন ছেড়ে উঠে যাবার পালা। কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে হাত তুলে বললাম—চললাম।

আত্মহত্যা

অর্ধেন্দু চক্রবর্তী

ধাপে ধাপে সে উঠে এসেছে এত উঁচুতে। এখান থেকে নিচে তাকালে সবকিছুকেই বড় ছোট, বড় পল্‌কা মনে হয়। যেন পুতুলের পৃথিবী দেখছে। পুতুলের সরু ভঙ্গুর হাতগুলি যখন অভিনন্দন জানায়, কালো কালো মাথাগুলি যখন দুলতে থাকে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে তখন অপার আত্মতৃপ্তিতে বুকটা ভরে যায়। অথচ এই পুতুলের সংসারে সে-ও ছিল কিছুদিন আগে পর্যন্ত। ওদের সঙ্গে মিছিলে হেঁটেছে, ক্রুদ্ধ হয়েছে মানুষের অবিচার দেখে। ছবি এঁকেছে স্পেনের গৃহযুদ্ধ নিয়ে, কৃষক সম্মেলনের মঞ্চ সাজিয়েছে রাত জেগে। ওকে অভিনন্দন জানিয়েছে জগদ্দলের চটকল মজদুর, কফিহাউসের রাগী ছেলেরা। ছেঁড়া পাঞ্জাবীর তলায় তার হৃৎপিণ্ডটা আনন্দে লাফিয়ে উঠত দপ্‌দপিয়ে।

টেলিফোনটার দিকে তাকিয়ে বেশ লাগছিল কথাগুলি ভাবতে; টেলিফোনে কেউ তাকে ডাকছে। ডাকুক না। সে একটু দেরীতেই ধরা দেবে। আজ আর অত সুলভ না সে।

সুরুতে অনেক অবহেলা অনেক অসম্মান সইতে হয়েছে তাকে। সমালোচকের কর্কশ রক্তচক্ষু, গুণীজনের অনাদর। দিনরাত অতৃপ্তির জ্বালায় জ্বলতে হয়েছে।

টেলিফোনটা বেজেই চলেছে। না, এবার ওঠা যাক্‌। মন্থর পায়ে টেলিফোনটার দিকে এমনভাবে এগোলো যেন সেই অতৃপ্ত দিনগুলির ওপর প্রতিশোধ নিতে কৃতসংকল্প হয়েই চলেছে।

খুব ক্লান্ত এবং উদাসীন গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কাকে চাই?' এভাবে কথা বলার মধ্যে বেশ একটা আত্মসন্তুষ্টি আছে। আগে সকলের কথা শুনবার জন্য দারুণ একটা ব্যাকুলতা থাকত। মুখের দিকে তাকিয়ে থাকত অপরাধীর মত। 'ছবিটা আপনার ভাল লেগেছে?' বুকটা দুরু দুরু করত। 'আমার চেষ্টা তাহলে সার্থক হয়েছে।'

রিসিভারটা নামিয়ে রাখল। নিজের মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে নিল আবার। এখন আর কিছুর জন্য লোলুপতা নেই। বাঘা বাঘা সমালোচককেও গ্রাহ্য করে না। তার ছবি এখন প্রশ্নাতীত। সে একটা সময় ছিল যখন খবরের কাগজের দরজায় দরজায় ঘুরতে হয়েছে তাকে। সে সব এখন স্মৃতি মাত্র।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল বেলা বাড়ছে। চাকরকে চা দিতে বলল।

তারপর ঘরের মধ্যে পায়চারী করতে করতে নিজের আঁকা ছবিগুলির দিকে পরম তৃপ্তিতে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল।

এখন আর ছবি সম্বন্ধে কারো সঙ্গে আলাপ করে না সে। একমাত্র ভাইঝি অনুর সঙ্গে যা একটু কথাবার্তা। তাকে যখন সবাই তাচ্ছিল্য করেছে, এমন কী তার স্ত্রীও হতাশ হয়ে তাকে ছেড়ে চলে গেছে, তখন একমাত্র অনুই কাছে ছিল। স্ত্রীর কথা মনে হতেই মনে পড়ল কতদিন হল চলে গেছে। আশ্চর্য তারপর থেকে আর কোনো যোগাযোগ রাখে নি। মেয়েরা অদ্ভুত নিষ্ঠুর হতে পারে। যুক্তিহীন ওদের মন। বিশেষ করে প্রতিভা কিংবা সৃষ্টিশীলতার সঙ্গে ওদের একটা প্রচ্ছন্ন লড়াই থাকে। চেনা গণ্ডীর বাইরে সবকিছুতেই ওদের ভয়। ওর স্ত্রী বলত, 'তোমার পাগলামী আমার সহ্য হয় না।' তারপর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদত। কোনো কোনো দিন ওকে আক্রমণ করত তীক্ষ্ম অশ্লীল ভাষা ও ভঙ্গী দিয়ে। অনুটা অন্যরকম। কাকাবাবুকে সে ভালবাসে। কাকাবাবুর পাগলামী তাকে আকৃষ্ট করে। ওর রগের পাকাচুলে হাত রেখে বলে, 'কাকু তোমাকে দেখলে দারুণ শিল্পী মনে হয়।'

—দারুণ মানে ?

—দারুণ মানে বেশ বড় শিল্পী।

চেঁচিয়ে অনুকে ডাকল। দৌড়ে কাকাবাবুর ঘরে এল অনু।

—কেউ যদি দেখা করতে আসে বলবি আমি বাড়ি নেই।

—যে-ই আসুক, সব্বাইকে বলব তো ?

—যেই আসুক।

—কোথায় গেছ বলব ?

—যা মনে আসে বলে দিবি।

—কুলু-ভ্যালিতে বেড়াতে গেছ বললে বেশ হয়।

—যা তোর ইচ্ছে।

জীবনের সমস্ত প্রতিষ্ঠাকে সামনে রেখে যা খুশী করার একটা সর্বগ্রাসী ইচ্ছা তাকে পেয়ে বসেছে। এই অধিকার একদিনে সে অর্জন করেনি। 'অনেক অনেক দিনের ঘাম মাথা থেকে পায়ে ফেলতে হয়েছে আমাকে। ভোর ছ'টা থেকে শুরু করতাম ছবি আঁকা। বুঝতে পারতাম না কখন দিন গড়িয়ে রাত হয়েছে—রাত হয়েছে ভোর। তবেই না আজ যে-কোনো মানুষের নাকের ওপর রিসিভার নামিয়ে রাখার স্পর্ধা রয়েছে আমার। জীবনের দশটা বছর কেটেছে দম বন্ধ-করা স্টুডিওর স্যাঁতস্যাঁতে ঘরে। এখন ভাবতেও ভয় হয়। দশটা দামী বছর। যে বয়সে মানুষ তারিয়ে তারিয়ে জীবনকে ভোগ করে সবটাই আমি রঙের সঙ্গে গুলে ক্যানভাসে বিসর্জন দিয়েছি।'

সবকিছুর বিনিময়ে এখন সে খ্যাতির শীর্ষে। ক্যাকটাসের ভিড়ে বিশাল অর্জুন গাছ। আত্মতৃপ্ত।

অনু নিচের ঘরে কোন একটা ছেলেকে বসিয়ে এসেছে শুনে একটু অবাক হল সে। মৃদু তিরষ্কার করল অনুকে। অনুটার এই এক দোষ। হঠাৎ হঠাৎ এমন এক-একটা কাজ করে বসবে যার কোনো মাথামুণ্ডু নেই। তবু অনুই একমাত্র কাছের লোক।

কাঁচুমাচু মুখে অনু দাঁড়িয়ে রইল। অনু জানে এতেই কাজ হবে। মানুষটা অনুর সামনে বড় দুর্বল।

—ভাবলাম ভদ্রলোকের দরকারটা খুব জরুরী তাই আর না করতে পারলাম না।

কথাটা শুনল তারপর অর্ধসমাপ্ত একটা ছবির দিকে এগুতে এগুতে বলল, যা নিয়ে আয়। তুলিটা তুলে নিয়ে তন্ময় তাকিয়ে রইল ছবিটার দিকে, যেন ডুবে আছে। মাঝে মাঝে অভিনেতা সাজতে হয় নিজের ইমেজটাকে যথাযথ বাঁচিয়ে রাখবার জন্য।

অনু ছেলেটাকে নিয়ে ঘরে ঢুকল। পায়ের শব্দে টের পায় সে। কিন্তু তাকায় না। চোখে মুখে অপার তাচ্ছিল্য নিয়ে ছেলেটার কথাগুলি শুনল। ছেলেটা বলছে ওদের মিছিলের জন্য ছবি এঁকে দিতে হবে। বড় বিনীত আবেদন।

—আপনার ছবি যদি আমরা মিছিলে নিয়ে যেতে পারি তাহলে মিছিলের গুরুত্ব হাজার গুণ বেড়ে যাবে।

কথাটা শুনেই উত্তেজিত হয়ে উঠল সে। ভাবল ছেলেটা দারুণ উদ্ধত। সে যখন ভ্যান গগ্, রেণো, সেজ্যার মত অসাধারণ হয়ে উঠেছে তখন মিছিলের জন্য ছবি আঁকার অনুরোধটা অত্যন্ত বাড়াবাড়ি মনে হল তার। শিল্পীর জীবনযাপনে নানা ধাপ আছে, নানা চেহারা আছে, নির্জন নিজস্ব একটা ব্যক্তিত্বও আছে। মিছিলের জন্য আঁকার দিন বহু পেছনে সে ফেলে এসেছে। তাছাড়া মিছিলের জন্য যখন সে ছবি আঁকত, যখন মিছিলের মানুষরা তাকে ভালবাসায় আপ্লুত করে দিত তখনও সে ভাবত এসব হল বড় হওয়ার সিঁড়ি মাত্র—আর কিছু না। ওর স্ত্রী মুখের মত বলত, 'মনে প্রাণে বিশ্বাসঘাতক তুমি।'

—আমরা জানি আপনি অত্যন্ত ব্যস্ত তবু—তার কথাটা শেষ করতে না দিয়েই চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, 'অসম্ভব—মিছিলের জন্য ছবি আঁকার সময় নেই আমার।' কথাটা সোজাসুজি বলতে পারার জন্য সে শ্লাঘা অনুভব করল। তারপর তুলিটা নিয়ে ছবিতে ডুবে গেল।

ছেলেটার মুখ বেদনায় রক্তহীন হয়ে গেল। আড়চোখে লক্ষ্য করল সে। আযৌবন এটাই তো সে চেয়েছিল। যখন ষ্টুডিওর অন্ধকারে তার দিন কেটেছে, সোনার হরিণের মত অধরা ছিল খ্যাতি, প্রতিপত্তি—তখন সে এই দিনটার কথাই তো মনে মনে ভেবেছে। যে কোনো মানুষকে সে বলতে পারবে, 'অসম্ভব, আমি এখন ক্লান্ত।' এই অহংকার এখন তার করায়ত্তে। যে-কোনো

মানুষের আবেদনকে সে দলিত করতে পারে, মুখের ওপর নাকচ করে দিতে পারে যে কারোর প্রার্থনা।

'আঃ এখন আমি মরতেও ভয় পাই না।'

হিংস্র খুশীতে ফুলে ফুলে উঠছিল সে। ছেলেটার দিকে স্থির তাকিয়ে বলল, 'আমি এখন বড্ড ব্যস্ত, অন্য একদিন এসো কথা বলব।'

ছেলেটা অপমানিত হয়ে চলে গেল। ছেলেটার যাওয়ার দিকে তাকিয়ে নিজেকে অসম্ভব খুশি মনে হল তার। এই তো সে চেয়েছিল।

ছেলেটা চলে যেতে অনুকে কাছে ডাকল। কাছে বসিয়ে ঘোলাটে চোখে হাসল। অনেক কিছু বুঝিয়ে বলার আছে অনুকে। খ্যাতি মানেই এক ধরনের বিচ্ছিন্নতা, নিষ্ঠুরতাও বলা যায়। এইটেই নিয়ম। পৃথিবীর সঙ্গে, মানুষের সঙ্গে সম্পর্কটা আপনিই বদলে যায়। খ্যাতিকে রক্ষা করার জন্যই এত সব প্রয়োজন। প্রতিষ্ঠার জন্য অনেক দাম দিতে হয়েছে তাকে—গোটা একটা যৌবনকে হত্যা করেছে স্টুডিওর স্যাঁতসেঁতে ঘরে।

—না কাউকেই ঘরে ঢুকতে দিবি না···কাউকেই অত সহজে বিশ্বাস করবি না। না, কিছুতেই না। দরকার হলে ঘরের চারিদিকে আমি ব্যারিকেড তুলে দেব—কেউ যেন না আসতে পারে। লক্ষ টাকা দিলেও বলবি না আমি বাড়ি আছি। ছবিগুলিকে সরিয়ে রাখতে হবে মানুষের দৃষ্টি থেকে দূরে কোথাও—কাউকেই বিশ্বাস নেই।

অনু ভাবতে থাকল খ্যাতি আর আত্মহত্যা কী একই শব্দ।

শূন্যের খেলা

কমল লাহিড়ী

প্রথমে সরমা ভেবেছিল বাতাসের শব্দ। তারপর মনের ভুল। বাইরে যে-ভাবে বৃষ্টি শুরু হয়েছে, জোরে চিৎকার করে ডাকলেও ভিতরের বন্ধ ঘর থেকে সে ডাক শোনা যাবে না।

বৃষ্টি শুরুও হয়েছে বেশ কিছুক্ষণ হল। ব্লাউজের নতুন ডিজাইনটা শেষ করবে ভেবেই বসেছিল সরমা। কিন্তু কিছুটা সেলাই করার পরই মাথা কেমন ভার হয়ে উঠল। শরীরটাও বার বার গুলিয়ে উঠছিল। একটা বমি বমি ভাব। ব্লাউজ আর সুতোর বাক্স রেখে বিছানায় গা এলিয়ে দিয়েছিল। একটু ঘুমের আমেজও আসছিল দু'চোখের পাতায়। কিন্তু হঠাৎই আবেশটুকু কেটে গেল।

বাইরের দরজায় শব্দটা তখন বেশ দ্রুত বাজছে। বৃষ্টি আর বাতাসের শব্দকে ছাপিয়েও কানে বাজছে। আর চুপ করে শুয়ে থাকা ঠিক হবে না। উচিতও নয়। একটা লোক বাইরে দাঁড়িয়ে ভিজছে। কথাটা মনে হতেই উঠে পড়ল সরমা, মনে মনে একটু রাগও হল। আবার পরক্ষণেই একটা ভয়ের ছবি মনে দানা বেঁধে উঠল।

কাল দেবাংশুকে যেভাবে কথার মায়াজালে ভুলিয়ে ফিরিয়ে দিয়েছিল, আজ এই ঝড়—বাদলার দিনে হয়ত কথাগুলো সে ভাবে গুছিয়ে নাও বলতে পারে। দেবাংশুও যেন কেমন নাটকীয়ভাবে ওর মনের গোপন কামনার কথাটা কাল সরমার কাছে প্রকাশ করেছিল। এই ঝড়বৃষ্টি মাথায় করে এখন আবার কি নতুন কথা শোনাতে এল দেবাংশু। চিন্তাগুলো দ্রুত সরমার সমস্ত স্নায়ুতে আঘাত শুরু করল একসঙ্গে। তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে দরজা খুলল।

দেবাংশু সত্যি বেশ ভিজে গেছে। একবার সরমার মুখের দিকে তাকিয়ে ঘরে ঢুকে তক্তপোষে বসল। ওর পাশে এসে দাঁড়াল সরমা। জামা খুলে সরমার হাতে দিয়ে দেবাংশু বলল, "অনেক কষ্টে রাজি করাতে পেরেছি সরমা। প্রথমে তো কোন মতেই রিস্ক নিতে চাইছিলেন না। শেষে মল্লিনাথের নাম বলতেই ডাক্তার চ্যাটার্জী আর না বলতে পারলেন না। এটা তো এখন কোন সমস্যাই নয়। কিন্তু তোমার তো আবার নামী দামী জায়গায় ঝোঁক, তাই বাধ্যই হয়ে ডাক্তার চ্যাটার্জীর কাছে যেতে হল।"

একটানা কথা বলে সরমার মুখের দিকে হাসি মুখেই তাকাল দেবাংশু। সরমা তখন একটু সরে গেছে। মল্লিনাথ নামটা কানে যেতেই একটা অজানা

ভয় ওকে আচ্ছন্ন করে তুলছে। কেন যেন ওই নামটাই আর উচ্চারণ করতে পারে না সরমা। অন্য কারও মুখে ওই নাম শুনলেও কিসের একটা ভয়ে গা ছমছম করে ওঠে। বারবার মনে হয় মল্লিনাথের সঙ্গে যেন চরম বেইমানী করেছে সরমা। একটা চরম পাপও করতে যাচ্ছে। আর মল্লিনাথ ওর সেই পাপী মুখের ছবিটা দেখে খুব জোরে জোরে হাসছে।

কেন যে সরমার এইরকম মনে হয় সেটা ও কিছুতেই বুঝতে পারে না। অথচ বারবার যেকোন ভাবে সেই ভয় জাগানো নামটাই ওর সামনে উচ্চারিত হয়।

দেবাংশুর জামাটা দড়িতে ঝুলিয়ে সরমা দেবাংশুর কথাটা যেন তখন ভাল করে বুঝতেই পারেনি সেই ভাবে বলল, "কার কথা বলছিলে ডাক্তার চ্যাটার্জীকে।"

"কেন তোমার কথা—!"

"আমার কথা!" সরমা অবাক চোখে তাকায়।

"বাঃ মনে নেই, কাল যে তোমাকে কথা দিয়ে গেলাম—আজ অফিস ছুটি নিয়ে যেমন করে পারি ডাক্তার চ্যাটার্জীকে রাজি করাব।" দেবাংশু সহজভাবেই কথাটা বলে এবার।

সরমা উঠে দাঁড়িয়ে বলে, "তা সেই কথাটা এই বৃষ্টিতে ভিজে আমাকে বলতে আসতে হ'ল!"

সরমার একটা হাত ধরে দেবাংশু বলে, "কেন—আসতে নেই। তোমার কাছে আসার জন্য কি এখনও সময় দেখতে হবে। এমন কথা তো ছিল না।"

দেবাংশুর কথায় হাসতে গিয়েও থেমে যায় সরমা। অথচ এখন গম্ভীরও হওয়া যায় না। তাই প্রসঙ্গটা ঘুরিয়ে আবার সেই ভয়ের ছবিটাই মনে আঁকতে চায় সরমা। সোজাসুজি দেবাংশুর মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, "তোমার বন্ধুর কথা কি বলছিলে যেন।"

"হ্যাঁ' মল্লিনাথের নাম বলতেই তা ডাক্তার চ্যাটার্জী আর না বলতে পারলেন না। আগে তো অনেক টাকার কথাও বলেছিলাম। মল্লির কথাটা প্রথমে আমার মনেও আসেনি। ডাক্তার চ্যাটার্জীর নার্সিংহোমে ওর এক কলিগের সঙ্গে দেখা হওয়াতেই কথাটা মাথায় এল। মল্লি তো অনেক ওষুধ সাপ্লাই করত ডাক্তার চ্যাটার্জীকে। উনিও ভালবাসতেন ওকে!" কথাগুলো বলে আবারও হেসেই সরমার মুখের দিকে আত্মপ্রসাদের দৃষ্টিতে তাকাল দেবাংশু।

কিন্তু সরমা ততক্ষণে বেশ গম্ভীর হয়ে গেছে। মল্লিনাথ নামের সেই ভয়টা ওর মনে দারুণভাবে ক্রিয়া শুরু করেছে।

বৃষ্টিটা একটু কম এখন। বাতাসের একটানা শব্দ হচ্ছে বাইরে। সরমার এ হঠাৎ চুপ করে যাওয়াটা ভাল লাগল না দেবাংশুর। ওর মনের সবকিছু কামনাই এখন সরমাকে ঘিরে। আর কামনার স্বীকৃতিও সরমার কাছ থেকে

পেয়েই সে এতটা এগিয়ে এসেছে। অথচ, সরমার মন থেকে এখনও মল্লিনাথ নামটা মুছে যায় নি।
মুছে যেতে পারেও না। দেবাংশুর কাছে হয়ত ওই মল্লিনাথ নামটা এখন আর কিছু নয়। মৃত বন্ধু হিসেবে ওই নামটা হঠাৎ মুখে এসে একটু অনুকম্পা আসে মনে। তবে, সরমার কাছে ওই নাম তো শুধু বন্ধুত্বের হাল্কা পরিচয়ে আসে নি। ওই নাম ঘিরে অ নক জীবন-স্বপ্ন যে বাস্তবে রূপ দিতে চেয়েছিল সরমা।
সরমার চরম বিপদের দিনে দেবাংশু অবশ্য পাশে এসেই দাঁড়িয়েছিল। সেখানে সেদিন কোনও মুখোশের আড়াল ছিল না। সেজন্য দেবাংশুকে ঠিক অপরাধীর পর্যায়ে ফেলা যায় না। বন্ধুপত্নীর সবরকম মর্যাদা দিয়েই আপনার করে নেবার প্রয়াস চালিয়েছে দেবাংশু। সরমাই বরং সে সময় কুণ্ঠাবোধ করেছে। হয়ত তখন মনের দুর্বলতাটুকু কাটিয়ে উঠতে পারেনি বলেই ওরকম করেছে।
দেবাংশুর ব্যবহারেও কোন বিকৃত কামনার প্রতিফলন ছিলনা। কিন্তু সুষ্ঠু সমাধানের একটা ছবি তখন থেকেই সরমার মনে মাঝে মাঝে আঁকতে চেষ্টা করত দেবাংশু। সরমারও আর উপায় ছিল না তখন। তবে ও ভেবেছিল, দেবাংশু ওকে গ্রহণ করতে চাইলেও, মল্লিনাথ আর সরমার চরম আকাঙ্খার সত্তাকে হয়ত বা পুরোপুরি মেনে নিতে চাইবে না। তাই বর্তমান অবস্থা থেকে মুক্ত হয়ে একটা সুষ্ঠু ব্যবস্থা করার পরই দেবাংশুকে গ্রহণ করার কথা ভেবেছিল। আর সরমার সে কথায় তখন দেবাংশুও মত দিয়েছিল।
কিন্তু যা শুধু এক সুদূর সম্ভাবনা হয়ে মনে উঁকি দিয়েছিল তার আসল রূপটা সরমা ধরে রাখতে পারল না। দেবাংশু যেন বড় তাড়াতাড়ি নিবিড় ভাবে আঁকড়ে ধরতে চাইছে সরমাকে।
আজ এভাবে নার্সিং হোমের কথা দেবাংশুর কাছে শুনে খুবই ভয় হয়েছে সরমার। ইদানিং হঠাৎই যেন দেবাংশুও কেমন বন্য হয়ে উঠেছে। বারবার সরমার চোখে ধরা পড়েছে ওর মনের আদিম নগ্নতাগুলো। সামান্য একটু প্রশ্রয়েই দেবাংশুর মন বাঁধন-ছাড়া হয়ে পড়েছে। কিন্তু মল্লিনাথের সত্তার সঙ্গে দেবাংশুকে জড়িয়ে ফেলার কোন কল্পনাই মনে আঁকতে পারবে না সরমা। ভয়টাও তাই বড় বেশী ঘিরে ফেলছে ওকে। আর বারবার মল্লিনাথের নাম শুনে সেই হারিয়ে যাওয়া মুখটাও যেন স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠছে মনের আয়নায়। চুপ করেই বসে আছে দেবাংশু। সরমা মাথা নীচু করে কি যেন ভাবছে। ওকে আরও কিছু কথা বলত দেবাংশু। কিন্তু এই হঠাৎ গাম্ভীর্যে কিছু কথা না বলে দেবাংশু একবার ওর মুখের দিকে তাকিয়ে উঠে দাঁড়ায়। ভেজা জামাটাই গায়ে গলিয়ে নেয় আবার। সরমা মুখ তুলতেই বলে, "আমি একটু ঘুরে আসছি। তোমার সঙ্গে আমার রান্নাটাও করে রেখ। আজ আর দেশে ফিরব না।"

কথাগুলো বলেই আর দাঁড়ায় না। বাধা দিতে গিয়েও দিতে পারে না সরমা। সব কথাগুলো গলায় আটকে যায়। দেবাংশু দরজা খুলে রাস্তায় নেমে যায়। বৃষ্টি আর হচ্ছে না। ঝড়ো হাওয়া আর মাঝেমাঝে মেঘের ডাক। ঘরের মধ্যে অখণ্ড নীরবতা। অজানা একটা ভয় সরমার দেহমন আচ্ছন্ন করে ফেলছে বারবার। এখনও কিছুটা বেলা আছে। ঝড়বৃষ্টির জন্যই ঘরটা অন্ধকার মনে হচ্ছে। সুইচ টিপে আলো জ্বালল সরমা। একবার বাইরেটা দেখে দরজা বন্ধ করে আবার বিছানায় এসে শুয়ে পড়ল।

মাথার দিকের দেয়ালে কালো পিঁপড়ে সারিবন্ধভাবে উপরে উঠছে। ওদের মুখে সাদা সাদা কি যেন রয়েছে। বোধহয় ডিম। বাদলার দিনে আশ্রয় খুঁজে নিতেই যাচ্ছে পিঁপড়েগুলো। বালিশটা বুকের কাছে চেপে ধরে পিঁপড়েগুলোর দিকেই তাকিয়ে রইল সরমা। ভারি মজা লাগছে ওদের লাইন করে উপরে ওঠা দেখতে। মুখে ডিম নিয়ে পিঁপড়েগুলো অনেকটা যেন শূন্যের দিকেই এগিয়ে চলেছে। লাইটের জোরটা একবার কমছে আবার বাড়ছে। ঝড়ের জন্যই এমন হচ্ছে বোধ হয়। তবুও কি ভাগ্যি যে লোড-সেডিং হয় নি।

কথাটা মনে পড়তেই আলো নিভে গেল। কড়্ কড়্ শব্দে একটা বাজ পড়ল। অন্ধকারে ভীষণ ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি বিছানায় উঠে বসল সরমা। পিঁপড়েগুলো কি অন্ধকারে দেখতে পায়? ওদের মুখের ডিমগুলো ঠিক আছে তো? আলো জ্বালতেই হবে। অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে টেবিলের পাশ থেকে মোমবাতি আর দেশলাই নিয়ে জ্বালল সরমা।

মোমবাতি হাতে নিয়ে দেয়ালের দিকে এগিয়ে গেল সে। না পিঁপড়েগুলো নেই। একটু এগিয়ে দেখল, সবগুলো দরজার কোণে গিয়ে ঢুকছে। এবার একটু হেসে ফুঁ দিয়ে মোমবাতিটা নিভিয়ে আবার বিছানায় শুয়ে পড়ল সরমা।

রান্না করতে বিছুতেই ইচ্ছে করছে না। দেবাংশু যদিও বলে গেল. কিন্তু তবুও আজ দেবাংশুর জন্য রান্না করতে মন চাইছে না। অন্ধকারের অতলে নিজেকে সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলে এই মুহূর্তে কেন যেন শুধু মল্লিনাথের মুখের ছবিটাই বারবার দেখতে ইচ্ছে করছে। এমন কি সেই ভয়ের মুখোশটাও যেন আর সরমাকে ভয় দেখাতে পারছে না। চেতন অচেতনতার সব দরজা দিয়েই শুধু মল্লিনাথের মুখের ছবি ভেসে উঠেছে।

বিয়ের পর থেকে মনপ্রাণ দিয়েই মল্লিনাথকে ভালবাসায় ভরিয়ে রাখতে চেষ্টা করেছে সরমা। মল্লিনাথও ভালবাসার পরীক্ষায় পিছিয়ে ছিল না, সরমাকে সুখে রাখার সব রকমের প্রচেষ্টাই গভীরভাবে করত। সরমা এতটা বাড়াবাড়ি দেখে যদি বাধা দিতে চাইত, তাহলে দরাজ গলায় হেসে আর পরম আবেশে দুই হাতে সরমাকে জড়িয়ে ধরে মল্লিনাথ বলত, "কি যে বল না তুমি। সামান্য একটা শাড়ী, তাইতেই এত কথা। এ আর বেশী কি। মাদ্রাজে গিয়ে

কাঞ্জিভরম শাড়ীটা পছন্দ হয়ে গেল তোমার জন্য, কিনে ফেললাম। তোমার জন্যই তো আমার এত উন্নতি।"

সরমা বলত, "কি যে বল তার ঠিক নেই। তুমি ভাল কাজ করেছ তাই উন্নতি হয়েছে। বরং তোমার ভাগ্যেই আমার সুখ আহ্লাদ মিটছে।"

সরমার কপালে আলতো করে চুমু খেয়ে আবেগের সুরে মল্লিনাথ বলত, "না সরমা তা নয়। সামান্য সেলসম্যান থেকে আজ এই যে জোনাল রিপ্রেজেন্টেটিভের পোস্টটা পেয়েছি, সেটা তুমি আমার ঘরে এলে বলেই না হলো। আসলে তোমার ভাগ্যই পয়মন্ত।"

এইভাবে সুখ আর আনন্দের জোয়ারে গা ভাসিয়েই বেশ কাটছিল সরমার দিন আর রাত্রিগুলো। কোন কিছুর অভাব নেই, নেই কোন অভিযোগও। কিন্তু এত ভাল তো রইল না। সরমার পয়মন্ত ভাগ্যটা যে বেশী দিনের স্থায়িত্ব নিয়ে আসে নি, সে কথাটা মল্লিনাথ আর সরমা কেউই বুঝতে পারে নি। অফিসেরই কাজে মাঝে মাঝেই বাইরে যেতে হত মল্লিনাথকে। সেই সময়গুলো খুব ফাঁকা ফাঁকা, একা লাগত সরমার। মল্লিনাথের নিকট আত্মীয়-পরিজন কেউ ছিল না। সরমার দিকেও একই অবস্থা। দূর সম্পর্কের মামারা বাপ-মা মরা ভাগ্নীকে বিয়ে দিয়ে দায়মুক্ত হয়েছিলেন। মল্লিনাথের অফিসের বন্ধুরা ওর সঙ্গে প্রায়ই বাড়িতে আসত। সেই সূত্রেই দেবাংশুর সঙ্গে পরিচয়। আর মল্লিনাথের সঙ্গে দেবাংশুরও ঘনিষ্ঠতা ছিল বেশী। ও অফিসে চাকরি করে। মল্লিনাথের বাইরে ঘোরার কাজ। ছন্নছাড়া জীবনে দেবাংশুরও আপনজন বলতে কেউ ছিল না। মিলটা সেইজন্যই বেশী দু'জনার।

মল্লিনাথের অনুপস্থিতির দিনগুলো দেবাংশুর সঙ্গে হাসিগল্পে ভুলে থাকতে চেষ্টা করত সরমা। মল্লিনাথও সরমার দেখাশোনার ভার দেবাংশুর উপর চাপিয়ে খুশী মনেই ট্যুরে বেরিয়ে যেত, অনেক সময় পনের কুড়ি দিনও বাইরে কাটাতে হত মল্লিনাথের। সরমা মাঝেমাঝে অস্থির হয়ে উঠত। ভয়ও করত মল্লিনাথের কথা ভেবে। যা তাড়াহুড়ো করে সব কাজ করার অভ্যেস। কখন অজানা পথেঘাটে বেহিসেবী ভাবে চলতে গিয়ে কি সর্বনাশ ডেকে আনবে কে জানে! মল্লিনাথ বাইরে গেলে এই ভয়টাই কেন যেন বারবার সরমাকে বেশী ভাবিয়ে তুলত।

সরমার সেই ভয়টাই যে এমন করে রূঢ় বাস্তবের রূপ নেবে এ কথা কোন মতেই চিন্তায় আনতে পারেনি ও। কিন্তু সেইটাই হয়ত ভবিতব্য ছিল। উত্তর প্রদেশের এক শহরে ট্যুরে গিয়ে সরমার জীবন থেকে সত্যি বহুদূরে চলে গেল মল্লিনাথ।

চলন্ত গাড়িতে তাড়াতাড়ি উঠতে গিয়েই পা পিছলে পড়ে যায় মল্লিনাথ। তিনদিন তিনরাত অজ্ঞান হয়ে থাকার পর সরমার জীবন থেকে মল্লিনাথ নামটা চিরদিনের জন্য মুছে গেল।

সরমার দেহের কোষে তখন মল্লিনাথেরই আর এক সত্তা ছড়িয়ে পড়েছে। সরমার দেহের আধারে থেকে রূপে রসে যা একদিন আর এক মল্লিনাথ হয়ে পৃথিবীর আলো দেখবে। তাকে আশ্রয় করেই তো আগামী দিনের বেঁচে থাকার শপথ নিয়েছিল সরমা।

কিন্তু কোথা দিয়ে যে কি হয়ে গেল। কিসের এক লোভ দুর্বলতা আর কামনা এসে সরমাকে ধীরে ধীরে গ্রাস করে ফেলল। দেবাংশুকে নিয়ে নতুন এক স্বপ্ন-বাসর গড়ার ছবিটা যে কি ভাবে সরমার মনে দানা বেঁধে উঠল সেটা এখনও ভাল করে বুঝে উঠতে পারেনা ও। ঘটনাটা যত দানা বেঁধে উঠছিল, ততই কিন্তু ভয় পেয়ে সরমা নিজেকে শোনাতেই বলেছে, না-না-এ হয়না-এ পাপ-এ এক চরম বিশ্বাসঘাতকতা। তারপর দেবাংশুর প্রস্তাব শোনার পর থেকেই সেই ভয়টা বড় বেশী আঘাত করে চলেছে ওকে।

না-কিছুতেই না। মল্লিনাথের স্বপ্নের ছবিকে হারাতে পারবে না সরমা। তাকে ঘিরে যে সব আশা আকাঙ্ক্ষার শপথগুলো সে করেছিল তা নষ্ট হতে দেবে না। মনে মনেই আগামী ভবিষ্যতের একটা ছবি এঁকে ফেলে সরমা। এখন আর ভয়ও করছে না এসব কথা চিন্তা করতে। বারবার শুধু মনে হচ্ছে মল্লিনাথ ওর জীবন থেকে মুছে যায় নি। বরং সারাক্ষণ ওকেই ঘিরে রয়েছে।

ধীরে ধীরে বিছানা থেকে উঠে আবার মোমবাতিটাই জ্বালল সরমা। বাক্স খুলে পুরনো ডায়েরী থেকে জিয়াগঞ্জের ছোট মাসিমার বাড়ির ঠিকানাটা ছিঁড়ে নিল। দুটো শাড়ী যা মল্লিনাথ খুব পছন্দ করে সরমাকে কিনে দিয়েছিল, সেই দুটো নিয়ে খবরের কাগজের প্যাকেট করল।

এবার মোমবাতিটা নিভিয়ে অন্ধকারের মধ্যেই ছুঁড়ে দিয়েছিল। মল্লিনাথের মুখের ছবিটা মনে করে একবার প্রণাম করল। তারপর খুব তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে দরজায় শিকলটা টেনে দিল। আর কিছু ভয় নেই। সব মোহ ওই ঘরে বন্দী হয়ে রইল।

রাস্তায় নেমে দেখল, গলিটা বেশ অন্ধকার। যেতে গিয়েও আবার একটু দাঁড়াল। পিছন ফিরে আর একবার বাসাটার দিকে তাকিয়ে অন্ধকার গলির দিকেই দ্রুত পা চালাল সরমা।

উত্তরণ

কালিদাস ভদ্র

সুমন হাঁটছিলো। হাঁটতে হাঁটতে ভীষন রোদ লাগছিলো। বুনো মোষের মত শরীরটা যেন ক্রমেই নিস্তেজ হয়ে যাচ্ছে। অথচ ত্রিশ বছরের বেপরোয়া জীবনে কখনই এমন হয়নি। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। কপালে মুক্তোর মত বিন্দু বিন্দু ঘাম। দু-চোখে সূর্যের রুপোলি আলো। বুকের গভীরে মিলের ঢাউস চিমনিটা যেন আজও গলগলে রাশি রাশি ধোঁয়া উগরে চলেছে ছুটিয়ে চলার মাতনে।

সহসা কার্জন পার্কের মুখে ফণিমনসার জঙ্গলে দৃষ্টি আটকে যায়। সূর্যাস্তের জাফরানী রঙ রাজভবনের গাছগাছালির ফাঁক ফোঁকর দিয়ে ফণি-মনসার পরে এসে পড়েছে। অমনি সুমন হারিয়ে যায় ছাব্বিশ বছর হারিয়ে যাওয়া পাড়া গাঁয়ে।...

কোন পাড়াগাঁ ...

রূপসার মোহনা, বকফুল, হিজল, আম, জাম, বাঁশ আর বেতের বনে। ময়নাকালী বাবলার জঙ্গলে। দশ বছরের কিশোর সুমন খুঁজতে বসে বেনেবউ, কাঁচপোকা, ভাবতে গিয়ে চোখ ফেটে জল নামে—রূপসার মোহনায়, বঁইচির বনে যা হয়েছিল, এই কলকাতায় ভাবতে গেলেও ব্যথা !

মুহূর্তের জন্যেও আর দাঁড়াতে পারে না সুমন। এক দৌড়ে উঠল রাস্তায়।

ঠিক তখনই একটা মিছিল অজগরের মত এঁকে বেঁকে এগিয়ে আসছে। রুদ্ধবাক সুমন। জ্যোতির্ময় রৌদ্রালোকে বীরদর্পী অজস্র সৈন্য। হাতে হাতে ফেস্টুন, রঙিন ঝাণ্ডা। ভয়ানক বিস্ফোরক শব্দ ভরাট গলায় দীপ্ত উচ্চারিত হচ্ছে বারবার। শহরের আনাচে কানাচে অলিতে গলিতে রাস্তায় প্রতিধ্বনিত হচ্ছে বেআইনি লকআউট মানছি না মানবো না।

বস্তির দুরন্ত কিশোরের হাতের মুঠোয় পতপত করে উড়ছে নিশান। সুমনের দশ বছরের কিশোর যেন এই মুহূর্তে কোলকাতায় যুদ্ধের মুখোমুখি উঁচিয়ে বলুক—রূপসা অথবা গঙ্গা পেরিয়ে অবিচ্ছিন্ন একাকার।

ভুলে যায় সুমন নিজেকে। অতলান্ত অন্ধকার নক্ষত্রের নীচে সুমন একা নয়; লক্ষ লক্ষ সুমন আজ দুনিয়ায় শৃংখলিত।

সহসা ভয়বৃক্ষের শিকড় ছিঁড়ে দুন্দুভি বেজে ওঠে সুমনের সমস্ত শরীরে; সমস্বরে গর্জে ওঠে 'মোহিনী মিলের বেআইনি লক আউট মানছি না মানবো না। নব্বই দিনেও মিল খুলল না কেন মালিক তুমি জবাব দাও।'

ধীরু বাবুর শেষ দিন

কুনাল বন্দোপাধ্যায়

সকাল থেকেই ধীরুবাবুর মেজাজটা বিষিয়ে আছে। তেলাপিয়া মাছের জন্য কবে থেকে রমলা চিৎকার করে বাড়ী মাথায় করছেন কিন্তু বাজারে না মিললে ধীরুবাবু কি করবেন। সকালথেকে বাজার, দুধ, রেশনের ফাঁকে দুঘটনার সংবাদগুলো পর্যন্ত দেখতে পারেননি আজকের কাগজে। রমলার অবিশ্রান্ত গর্জনের মাঝে ধীরুবাবু ভাবেন আকাশ, মেঘ, গাছ নদী পাহাড়ের মতই বড় অবুঝ তাঁর রমলা। অতএব তাড়াতাড়ি চান সেরে অফিস বেরোনোটাই নিরাপদ। ওদিকে রাত্রে ব্যাঙের প্রস্রাবেই কলকাতা জলাশয় হয়ে আছে। আর মোড়ের মাথায় মন্টু বন্ধুদের সাথে বসে বসে বিড়ি ফুঁকছে। তা ফোঁক, কিন্তু স্কুলের মেয়েগুলোর পিছনে লাগা কেন? অস্ফুটে মন্টুর ও রমলার উদ্দেশ্যে অশ্রাব্য গালি বর্ষন করতে করতে চানের ঘরে ঢুকে যান ধীরুবাবু।

কালকে বিকেলের দিকে ধীরুবাবুর মেজাজ শরীফের একটা সুযোগ এসেছিল। পোদ্দার কোর্টের কাছে একটা জোয়ান ছেলের লাশ পড়ে ছিল ভরদুপুরে। সাততলা থেকে ঝাঁপ দিয়েছিল বেচারা। শুনেই দৌড়েছিলেন ধীরুবাবু, ভিড় ঠেলে এগিয়েও গিয়েছিলেন সামনের দিকে। কিন্তু তেমন কিছু বুঝতে পারলেন না। একটু দূরে সাদা থকথকে ঘিয়ের মতো কি পড়ে আছে, মাথারও হতে পারে, বোতলেরও হতে পারে। রক্তের ছিটে খুবই সামান্য, মুখটা গুঁজড়ে আছে ফুটপাথে। মাথার উপর দিকে একটা হাল্কা আঠালো চকচকে কালো ভাব। কিন্তু মুখের সেই আতঙ্কটা ছুঁতে পারলেন না ধীরুবাবু। তবে আর এ দেখার মূল্য কি রইল। ধীরানন্দ কানের দিকে তাকিয়ে একআধ ফোঁটা রক্তের আভাষ পেলেন, একটা দুটো পিঁপড়ে নড়ছে মনে হোল। একটু চোখটা জ্বলে উঠল ধীরুবাবুর, আবার জটলার ধাক্কায় ছিটকে গেলেন আর পুলিশ ভ্যানও এসে গেল। কেমন একটা ফাঁক রয়ে গেল, কি যেন একটা হোল না—ভাবতে ভাবতে ফিরে এলেন ধীরুবাবু। বাঁচোখের মাইনাস লাইনের উপর দিকটা একটু কুঁচকে উঠেছিল, একটু উষ্ণতার আশ্বাসে তাকিয়ে ছিলেন পথচলতি মানুষের দিকে। কিন্তু একটা মুখকেও নিজের জৈবিক অনুভূতির রেশটা পোঁছে দিতে পারলেন না ধীরানন্দ। তখন থেকেই বিষন্নতার সূত্রপাত—রমলার চিৎকার একটা নৈসর্গিক আভাষ তৈরী করেছে মাত্র।

তেরোশো আশির চৈত্র প্রথম দেখেছিলেন গলায় দড়িদেওয়া মেয়েমানুষটাকে। তখন মাঝে মাঝে মর্গের ধারে ঘুরে বেড়াতেন ধীরুবাবু, ডোমগুলো হাঁ করে তাকিয়ে থাকত ধুতিপরা বাবুটার দিকে। মেয়েটার চোখটা সেদিন ঠিকরে দেখছিল না জানা রহস্যগুলোকে, গলার কাছে কালো দাগ একটা, ঘাড়টা তখনও

২

রাগে শক্ত হয়ে আছে। কিন্তু জিভের ফ্যাকাসে ভাবটা বড় করুণ লেগেছিল ধীরুবাবুর। কে জানে, লোভের অভাবেই এই রক্তহীনতা কিনা—ধীরুবাবুর ভাবনায় শুধু এইটেই ঘুরছিল, বছর সাতাশের যৌবন টলটল তো করছেই না, বরং রিরংসার অতৃপ্তির কাঙ্গালীপনার ছাপটাই ফুটে উঠেছিল মেয়েলোকটা মুখে। একটু সুখ ছেয়ে যাচ্ছিল ধীরুবাবুর বুকে, একটু কোমল দোলা লাগছিল সন্ধ্যার নীলরতনের মর্গের সামনে। আলোগুলো কেমন যেন বুদ্দ হয়ে গেছিল ধীরুবাবুর চোখের পর্দায়। আনমনে মাতালের মতো টলতে টলতে বাসে উঠে পড়েছিলেন তিনি। বাড়ীতে বৌ এর বিরক্তির ঢেউ পিছলে যাচ্ছিল ধীরুবাবুর বুক আর পিঠের পাশ দিয়ে। এক হাল্কা অচৈতন্যতায় কেটে গেছিল সমস্ত রাত্তির। এই কি সুখ—এক মনে ভেবে চলেছিলেন ধীরুবাবু, অন্তত যতক্ষণ না পরের দিন অফিসে গিয়ে লেটমার্কটার দিকে চোখ পড়েছিল তাঁর।

ছেচল্লিশের অঘ্রানেও ধীরুবাবুর খুব আমলা হওয়ার শখ ছিল, সত্যিকারের আমলা। গনগনে চোখে তাকাবেন কেরানীগুলোর দিকে, ফুরফুরে মেজাজে কথা বলবেন সাহেবদের সাথে; বাঘের মতো গর্জন করবেন পাবলিকের ওপর, লোকগুলোর কাল্পনিক লেজগুলো নড়তে থাকবে ধীরুবাবুর বুটের আওয়াজের তালে তালে, সেই না জীবন। লোকগুলো কারণে অকারণে যদি বৌ ছেলে নিয়ে এসে পা জড়িয়ে নাই ধরল, কি লাভ তবে সেই চাকরীতে। একটা দুটো জন্তুকে সবাই ভয় পায় জঙ্গলে, তবেই না তা জঙ্গল। সেখানকার জীবনযাত্রা, শাসনপ্রণালী সবই তখন অখণ্ড মনোযোগে পড়তেন ধীরানন্দ। হিংস্রতার মধ্যেও কেমন নিয়মানুবর্ত্তিতা, ক্ষুধার মধ্যেও এক অসহায়তা, এগুলো সমস্ত নেশার মতো পড়ে যেতেন ধীরানন্দ। রক্তের গন্ধের মধ্যে জীবনের অর্থ খুঁজতেন উনিশ বছর বয়সে, একটা সুর্যের জোরালো আবেগে আঁকড়ে ধরতেন বন্ধুদের—আস্তে আস্তে ঘোর কেটে গেলে খোঁয়াড় ভাঙ্গা মাতালের মতো পড়ে থাকতেন বিছানায়। নিজের উপর ঘেন্নায় বিরক্তিতে সমস্ত আকাশ তেতো হয়ে ঝরে পড়ত ধীরানন্দর মুখে বুকে, পাঁজরার ফাঁকে ফাঁকে।

তেরোশো বিয়াল্লিশেই ইলিশমাছের ঝুড়িটা প্রথম বাবার কাছে আসতে দেখেন ধীরানন্দ। বাবা ডাকসাইটে হাকিম, পেশকারদের মুখে বাবার নাম ভগবানের আগেও উচ্চারণ হতে শুনেছেন তিনি। বাবা এজলাসে উঠলেই চোখ জ্বলে উঠত উকিল মুহুরীদের। আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়ানো পাঁটা ঘাস চিবোত একান্ত নির্ভয়ে। কেবল রাতের ভোজে ইলিশমাছের খুশবুটা বড়ো আঁশটে আগত বিয়াল্লিশের ধীরানন্দর। সন্দেশে একটা টক গন্ধ পেতো, দইএর মধ্যে একটা আঠালো ভাব মিশে থাকতো, বেতের লাঠিটা বাবার কাছে আশ্রয় হিসেবে আর অনুভব করতে পারতেন না তিনি। একটা নিয়মের মাথায়, একটা ইচ্ছের তালুতে, বাবার বেতের লাঠির কাল্পনিক আঘাতে শিউরে উঠতেন। মায়ের

উজ্জ্বল মুখে হাল্‌কা ছটা দেখতে পেতেন, রুক্ষ লিপস্টিকের আস্তরণ ভেদ করে ইস্কুলের পথের বেশ্যাগুলোর মুখ মনতাজ হয়ে ঘুরে বেড়াতো তাঁর মস্তিকে। এক এক রাত্তিরে স্বপ্নেও টক দইয়ের মধ্যে আঁশটে গন্ধ পেতেন, ঘুমের রেশ কেটে যেতে ধীরানন্দর। একদৃষ্টিতে অন্ধকারে সিলিংএর দিকে তাকিয়ে আনমনে কেঁদে ফেলতেন তিনি। যেদিন অনুপমের দিদিকে ফুসলোনো লপেটামার্কা ছেলেটা বাবার হাতে খামটা পৌছে দিল, সেদিনই প্রথম খুনটা করে ফেলেছিলেন ধীরানন্দ। বাবার মাথার ধারে রগের সাদা চুলগুলো রক্তমাখা দেখতে দেখতে এক শান্তির ঘোর নেমেছিল ধীরানন্দর আত্মায়, বাবার থেঁতলানো নাকটায় স্বপ্নের মধ্যেও পরম আনন্দে হাত বুলিয়ে ছিলেন তিনি, চণ্ডাল রাগটা আস্তে আস্তে সাপুড়ের বাঁশীতে কেমন যেন মিইয়ে গেল। আবার পরের দিন ভোরে বাবার শান্ত সমাহিত পাঠরত রূপ দেখেই মনের ধাক্কাটা দ্বিগুনিত হয়েছিল। আগের রাতের স্বপ্নের রেশ কেটে যাচ্ছিল। আইনের বইয়ের ফাঁকে সাপের মুখটা দেখে বিষে নীল হয়ে গেছিল পনের বছরের ধীরানন্দ।

আটত্রিশের শ্রাবণে মায়ের ডুকরে ওঠা কান্না প্রথম কানে বাজে ধীরানন্দর। দাদুর মরার দিন। বাবা তখনও ফেরেননি কোর্ট থেকে। তখনও তিনি প্র্যাকটিশ করেন, হাকিম হননি, নেকড়ে শুয়োরের আড্ডায় নির্ভার কচ্ছপের মতো ধৈর্যের মধ্যে দিন কাটাতেন, আর কে এক বেলারানীর ঘরে তার ছিল নিত্য যাওয়া আসা। দাদুর মৃত্যুতে তার ব্যতিক্রম হবে এমন ছেলেমানুষীর অর্থ বাবার মাথায় ঢুকত না। মায়ের কান্নার মাঝে মাঝে বুক চাপড়ানোর যন্ত্রনা আর বাবার শারীরিক হিংস্রতা ধীরানন্দর বুকে মাসাইদের বাজনা শুনিয়েছিল। তখনও ধীরানন্দর চোখে পৃথিবীটা কেমন সবজে ছিল, আকাশ ছিল নীলচে, জলের রং তখনও দেখতে পেতেন না তিনি। পাখির ডাকে মনটা একটু তারের উপর ছড়টানার অনুভূতি ছড়িয়ে দিত, মাঝে মাঝে কাঠবেড়ালীর দৌড়ের সাথে একটা উদ্দাম প্রাকৃতিক আহ্বান অনুভব করতে পারতেন। মায়ের ফ্যাকাশে মুখটা পৃথিবীর শ্যামলতা শুষে নিল, জলের রংও আস্তে আস্তে দেখতে পেলেন ধীরানন্দ। ক্রমে ক্রমে আকাশের ধূসরতা নীলকে ঢেকে দিল ধীরানন্দর আটত্রিশের শ্রাবণে।

তেত্রিশের আশ্বিনে, পুজোর মাসে অদ্ভুত দু সেট জ্যামা প্যাণ্ট এনেছিলেন ধীরানন্দর বাবা। নিকারবোকার। সাহেবরা পরে, বাচ্চাদের পরায়। আশপাশের বাড়ীর শিশুগুলোর অসূয়া আর কৌতূহল ফুলিয়ে দিয়েছিল ধীরানন্দর পাখির মতো ছোট্ট ছবছরের বুকটাকে। বাবার মুখে অপার্থিব জ্যোতি দেখেছিলেন তিনি, মায়ের মুখে ফুটে উঠেছিল সুখের আভাষ। দেবদূতের আদলে গড়া বাবার মুখটা দেখতে দেখতে আর মায়ের হাত ধরে হাঁটতে হাঁটতে আনন্দে পাগলের মতো লাগছিল ছোট্ট ধীরুবাবুর। চোখের কোনে

জলের আভাষ নীরব কৃতজ্ঞতার চিহ্ন মাখিয়ে দিয়েছিল ধীরানন্দর নিষ্পাপ কোমল মুখটায়।

সেই মুহূর্তের ধীরানন্দর মুখের স্বপ্নের আভাষে অজ্ঞ পবিত্রতার চিহ্ন দেখে সূর্য, আকাশ, জল, পৃথিবী অট্টহাস্যে ভরিয়ে দিচ্ছিল সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড। সুখের গানের বিদ্রূপে মুখরিত হয়ে উঠেছিল সমগ্র বিশ্বচরাচর। সেই আওয়াজ গুলোকে প্রতিহত করতে পারেন না ধীরুবাবু। এক আধটা রক্তের ফোঁটায়, দুচারটে মাছির আর পিঁপড়ের নড়াচড়ার মুহূর্তগুলোই ধীরানন্দর অস্তিত্বকে বাঁচিয়ে রাখতে চায়।

ধীরুবাবু সাড়ে নটায় অফিসের বড়বাবুর ধমকের চিন্তায় উন্মন হয়ে ধুরপায়ে বাসরাস্তায় এসে দাঁড়ান। বড়বাবুর হুমদো মুখখানা ভেবে আবার ঘড়ি দেখতে গিয়ে রক্ত জল হয়ে যায় তাঁর............

'আজকেও লেট' ?

'বিশ্বাস করুন স্যার, রেশনের.......

'আর তিনমাস তো—তারপর সারাদিনই রেশন ধরবেন। এক্সটেনশানটা পেতে গেলে একটু সিনসিয়ার হতে হয়

'বিশ্বাস করুন স্যার, আমি ইচ্ছে করে—

'খাতা সাহেবের ঘরে, ওঁকেই বিশ্বাস করাবেন, আমায় আর জ্বালাবেন না।

'কিন্তু স্যার'— —ইতিমধ্যে বাসটা এসে পড়ে। তিলধরলেও ধরতে পারে, কিন্তু ধীরুবাবুকে ধরানো অসম্ভব। বাসের হ্যাণ্ডেলে, পাদানিতে সমস্ত আকুতি ঢেলে দেন ধীরানন্দ। আস্তে আস্তে পা পিছলে যেতে থাকে। পরের স্টপেজের আগেই শরীরের সমস্ত শক্তি নিঃশেষ হয়ে আসে। আলগা হাতটা গড়িয়ে নেমে আসে হ্যাণ্ডেল বেয়ে। শরীরের গ্রন্থি দিয়ে শেষরসগুলিও যেন বেরিয়ে যায়। আকাশটা ধুপ করে নেমে আসে ধীরানন্দর ব্রহ্মতালুর খুব কাছে। বুক চেপে বাস ছেড়ে ফুটপাথে বসে পড়েন তিনি।

মিনিট পনের পরে রমলার প্রিয় তেলাপিয়া মাছটার মতোই খলবল করতে করতে শেষ বায়ুটাও বেরিয়ে যায় ধীরানন্দর নাক দিয়ে। মাথাটা একপাশে কাৎ হয়ে যায়। কেবল দু একটি মাছি সন্দিগ্ধ চোখে নাক মুখের উপর দিয়ে ঘুরে বেড়াতে থাকে। একটা পিঁপড়ে ধীরানন্দর পা বেয়ে কোমরের দিকে ওঠে আর পিছন ফিরে ফিরে অন্য পিঁপড়েদেরও আহ্বান জানায় শরীরের উপর দখল নেবার জন্য। নিরাসক্ত ধীরানন্দ মুর্দাফরাসের প্রতীক্ষায় অপেক্ষা করতে থাকেন।

জয় পরাজয়

জয়ন্ত জোয়ারদার

গুমোট গরম। কালবৈশাখীর মেঘ জমছে কিন্তু বৃষ্টি হচ্ছে না। খেয়ে উঠে পান খেতে গিয়েছিল সাধন, নিখিলেশ ও দ্যুতি। ফেরার সময় হোস্টেলের গেটের কাছে কংক্রীটের বেঞ্চের দিকে তাকিয়ে দ্যুতি বলে—আয় একটু বসি। ঘরে যা গরম। ওরা বসে সিগারেটে সুখটান দিতে থাকে। পাশেই বিশাল ঝিলটার জল থির দাঁড়িয়ে। একফোঁটা বাতাস নেই। ঝিলের চারপাশের নারকেল গাছগুলোর পাতা নড়ছে না। একটা দম বন্ধ করা ভাব।

হোস্টেলের গেট দিয়ে ঢুকেই প্রথমে 'ডি' ব্লক। রাত প্রায় সাড়ে দশটা। কোন কোন ঘরে আলো নিভিয়ে ছেলেরা শুয়ে পড়েছে। ঝিলের পাশে বড় ব্লক 'এ'। 'এ' ব্লকের ঘরগুলোর আলো এসে পড়ছে জলে। বহুদূর থেকে ফায়ারিং এর শব্দ ভেসে আসে। নিখিলেশ বলে—কোন দিকে রে?—মনে হচ্ছে তো চণ্ডীতলা টালিগঞ্জের দিকে।

—আজ নাকি ইউনিভার্সিটির সামনে ট্রাফিক পুলিশ খতম হয়েছে।

—কখন?

—শুনিস নি? এই খানিকক্ষণ আগে—নটা নাগাদ।

—চল। ঘরে যাই। বাইরে না থাকাই ভাল।

—বোস না আরেকটু। টালিগঞ্জে ফায়ারিং হচ্ছে। এখানে তোর গায়ে তো আর এসে লাগবে না।

সত্তর দশকের বয়েস সবে এক বছর মাস তিনেক। কলকাতার বাতাস বারুদে ঠাসা। আর ওদের সেই বয়েস—যে বয়েসটাকে কলকাতা পুলিশ নকশালপন্থী বলে সন্দেহ করে।

দ্যুতির মনটা খারাপ। সুমির সঙ্গে রোজই কোন না কোন ব্যাপারে মন কষাকষি হচ্ছে। দ্যুতিই বাইরে আর একটু বসার জন্যে বলছিল। ঘরে ঢুকেই তো সেই রুমমেটদের ক্যাচাল। একটা কুড়ে। ঘরে ঢুকতেই হয়ত বলবে—বাঃ, এনেছিস 'চারমিনার'। আমি শুয়ে শুয়ে কি ভাবছিলাম জানিস? এই ঝিল থেকে প্রাগৈতিহাসিক ডাইনোসর তার অতিকায় দেহ নিয়ে জল থেকে উঠে এল। লম্বা গলাটা আমার এই পাশের তিনতলার জানলা দিয়ে বাড়িয়ে দিল। আর দেখি কি তার দাঁতের ফাঁকে এক প্যাকেট চারমিনার। শুয়ে শুয়ে এসব আজব কথা ভাববে তবু দুমিনিট হেঁটে সিগারেট কিনে আনবে না। আরেক মাল তরুণ। টেবিলের ওপর ধূপকাঠি জ্বলছে। রামকেষ্ট বিবেকানন্দ সারদা মায়ের ছবি সাজানো। হয়ত এতক্ষণ মশারির মধ্যে বসে শোবার আগে ঠাকুরের নাম করছে। আরেকটা বাঙাল—রতন।—কাইল কি স্বপ্ন দেখছি জানস। স্তালিনরে—অবিকল স্তালিন, আমারে বিড়ি দিত্যাছে।

সাধন বকেয়া সেশনালের কথা ভাবছিল। কার 'মাদার' থেকে চোথা করবে ঠিক ভেবে কুল পাচ্ছিল না। সবার অবস্থাই ওর মত। এও শালা বেকার ইঞ্জিনিয়ার। তার ওপর চারদিকের আবহাওয়া গরম। কার আর লেখাপড়া করতে ভালো লাগে।

—বুঝলি গুরু শ্যামলদারা ঠিকই বলে। দেশটা রিয়্যালি সেমি ফিউড্যাল সেমি কলোনিয়াল।

হঠাৎ দ্যুতির এই কথায় সিগারেটের মুখ ভর্তি ধোঁয়াতেই বিষম খায় সাধন।

—হঠাৎ? তুই? স্টেট ক্যারাকটার নিয়ে ভাবতে শুরু করলি?

—শালা নিজের ক্যারাকটার আগে ঠিক কর। নিখিলেশ টিপ্পনি কাটে।

—কেন গুরু? কৃষ্ণ করলে লীলা আর আমরা করলে বিলা?

—তাতো বলছি না। প্রেম কচ্ছিস কর। তুই পলিটিক্সে নাক গলাচ্ছিস কেন?

—না মাইরি। সিরিয়াসলি বলছি। তোরাই বল। সুমি খুব মডার্ন তো?

—তাই তো মনে হয়। ফুটফাট ইংরেজী বলে। সিগ্রেট খায়। ইংরেজী ছবি দেখে। ক্যামু পড়ে।

হাতে তাবিজ বাঁধা আছে জানো?

—ই গুরু মাইরি?

—শুধু হাত কাটা ব্লাউজ যেদিন পড়ে সেদিন খুলে ব্যাগে রাখে। নিখিলেশ আর সাধন হেসে ফেলে। হঠাৎ মাঝপথেই সাধনের হাসি থেমে যায়। আলো আঁধারিতে গুটি গুটি কালো কালো ওগুলো কি এগিয়ে আসছে! গাড়ি—পুলিশভ্যান। যোধপুর পার্কের ভেতর থেকে। হেডলাইট অফ করে সামনের দিকের গাড়িগুলোর ইঞ্জিনও বোধহয় বন্ধ। কোন শব্দ হচ্ছে না। সাধনের শিরদাঁড়া দিয়ে একটা ঠান্ডা অনুভূতি ওঠা নামা করে। নিখিলেশ তখনও দ্যুতির দিকে মুখ করে বলে চলেছে—নারায়ণ ওর গাঁয়ের কথা বলে শুনিসনি, ভাগচাষী 'বোল রাধা বোল সঙ্গম হোগা কি নেহী' গেয়ে ধান কাটে। সাধনের ভয়ে চাপা গলা দিয়ে শুধু বেরোয়—নিখিলেশ। নিখিলেশ আর দ্যুতি সাধনের দৃষ্টি লক্ষ্য করে বাইরে রাস্তার দিকে তাকায়। প্রথমে কিছুই দেখতে পায় না।—কিরে? সাধন শুধু অস্ফুট স্বরে বলে—আমাদের হোস্টেলের দিকেই আসছে। দ্যুতি দ্যাখে ভ্যানের পর ভ্যান ঘাপটি মেরে দাঁড়িয়ে। হঠাৎ শক খাওয়ার মত তড়াক করে লাফ দিয়ে উঠে গেটের পাশে দারোয়ানের ঘরে ঢুকে গেটের চাবিটা নিয়ে তড়িৎ গতিতে গেটটায় তালা দেয়। আর নেপালী দারোয়ানটা চেঁচাতে থাকে—কেয়া হুয়া সাব, কেয়া হুয়া সাব? সাধন ঠিক কি করবে ভেবে পায় না। নিখিলেশ এ ব্লকের দিকে ছোটে—শ্যামলদাকে খবর দিতে হবে।

—শালা বরানগরের বদলা। বেশ করেছে। পুলিস মারবে নাতো কি বিপ্লবীরা ছারপোকা মারবে?

—কিন্তু আবার গুরু ইউনিভার্সিটি বন্দ ফন্দ হবে নাতো ?

—তোর মাইরি শুধু কেরিয়ারের চিন্তা।

—অলরেডি ছমাস পিছিয়েই আছি। অল ইন্ডিয়া রিক্রুটমেন্টে এক বচ্ছর বেঙ্গল এর ছেলেরা ঝাড় খাবে।

—হ্যাঃ তোর জন্যে চাকরি নিয়ে তো মা জননী বসে আছে।

—আরে আর তো কদিন। মুক্তাঞ্চলেই আমাদের দরকার হবে।

—এ কথা ভাবলেই সত্যি দুঃখ হয়। কমাস পরে ফাইনাল দেবো। নম্বরও আজঅব্দি মন্দ পাইনি। কিন্তু শিখিনি শালা কিছু যা কাজে দেবে।

—আমরা 'তাতু'র ওপর লোহার সাঁকো বানালে আর দেখতে হচ্ছে না।

হঠাৎ ছুটতে ছুটতে নিখিলেশ ঢোকে—শ্যামলদা কোথায় রে ?

—তুই হাঁপাচ্ছিস কেন ?

—পুলিশ।

—পুলিশ ? কোথায় ?

যে যার বিছানায় গা এলিয়ে গপ্পো করছিল। ঝটতি উঠে দাঁড়ায়। নিখিলেশ একবার দম নিয়ে বলে—বাইরে দ্যাখ। সবাই গিয়ে ঝিলের ধারের জানলায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে। প্রথমে ঠাওর হয় না। তার পর দেখতে পায়। 'জয়া' কারখানার দিককার কোণটায় এক ঝাঁক গাড়ি। যোধপুর পার্কের দিকেও সারি সারি কালো গাড়ি দাঁড়িয়ে। আলো নিভিয়ে ইঞ্জিন বন্ধ করে চুপচাপ।

শ্যামলরা মিটিং শেষ করে নামছিল সিঁড়ি দিয়ে। শ্যামলকে চিন্তিত দেখাচ্ছে। যাদবপুরের মোড়ে ট্রাফিক পুলিশ কারা খতম করল! শ্যামল ছাত্রসংগঠনের নেতা। লোকাল কমিটিরও সদস্য। এমন কোন প্রোগ্রাম ওরা নেয়নি। এল. সি. এস পরিতোষদার কাছে ও খবরটা পেয়েই লোক পাঠিয়েছিল। উনিও কিছু জানেন না। যদিও এইমাত্র হোস্টেল সংগঠনের মিটিংএ বেশীর ভাগ সদস্যই বলল—পুলিশ খতম মানেই রাষ্ট্রযন্ত্রের ওপর আঘাত। অতএব সঠিক। কিন্তু শ্যামলের ভাল ঠেকছে না। শ্যামল ভাবে বহুদিন ধরেই ওরা মজা করে শ্লোগান দিত—পুলিশ তুমি যতই মারো মাইনে তোমার একশো বারো। এলাকার শ্রমিকদের মধ্যে সংগঠনের কাজ এগোচ্ছে। এ সময় অহেতুক ধর পাকড় হলে নাহক কাজের ক্ষতি হবে। শ্যামল ঘড়ি দেখে। রাত্রি সোয়া এগারোটা। —কাল তাহলে পোদ্দার নগরে স্টাডি ক্লাশ তুই নিচ্ছিস। অশোক ঘাড় নেড়ে সায় দেয়। তিন তলার বারান্দায় নিজের ঘরের দিকে বাঁক নিয়ে আজকের আর করণীয় কজে কি আছে ভাবছিল। ওদের কলেজের ছেলেরা বাঁকুড়ার গ্রামাঞ্চলে কাজ করছে। তাদের জন্য পার্টির কাগজ পাঠাবার ব্যবস্থা করতে হবে। সারা ভারত জুড়ে পার্টির ওপর রাষ্ট্রযন্ত্রের অত্যাচার শুরু হয়েছে। গোপন পত্রিকা তাই সেভাবেই পাঠাবার ব্যবস্থা করতে হয়।

সাফে'র প্যাকেটের ভেতর পত্রিকা পুরে আবার এমন ভাবে বন্ধ করতে হবে যেন বাইরে থেকে মনে হয় নতুন প্যাকেট। হঠাৎ নিখিলেশ ছুটে এসে উত্তেজিত স্বরে বলে—শ্যামলদা, পুলিশ।

—পুলিশ। চমকে ওঠে শ্যামল। একটু আগেই মিটিংএ যখন ও বলেছিল—ইউনিভার্সিটিতে ব্যাপক ছাত্রদের সমর্থন আর এলাকায় দৃঢ় সমর্থনের জন্য এতোদিন তেমন আক্রমণ হয়নি। এই পুলিশ খতম হয়ত শত্রুরাই আক্রমণ করার অজুহাত তৈরীর জন্য করছে। উৎপল বলেছিল—আক্রমণ হতে পারে আশংকা করছি যখন হোস্টেল থেকে সটকে গেলেই হয়। অহেতুক কনফ্রনটেশনে গিয়ে কি লাভ?

—তোর না হয় মাসির বাড়ি বালিগঞ্জে। এই পাঁচ পাঁচশো ছেলে কোথায়

—অন্ততঃ তিরিশ চল্লিশটা গাড়ি।

—কমরেডস আমাদের বিশ্লেষণ ভুল প্রমাণিত হল। শত্রু আমাদের আক্রমণ করেছে। আর প্রস্তুতি না নিয়ে আমরা অহেতুক সময় নষ্ট করেছি। শ্যামল ঠাণ্ডা গলায় দাঁতে দাঁত চেপে বলে।

শ্যামল সংগঠনের সবার মুখের দিকে একবার দেখে নিয়ে বলে—অলক, এক্ষুনি বি, সি. আর ডি ব্লক থেকে সবাইকে এ ব্লকে চলে আসতে বল। সজল, কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে গেট থেকে ডি ব্লক অব্দি যতগুলো সম্ভব ব্যারিকেড বানা।

—মেইন অফ করে দেবো।

—হ্যাঁ, এ ব্লক ছাড়া বাকি গুলোর।

—গোটা বারো চোদ্দ ছোট মাল হাঁড়িতে মাটির মধ্যে পোঁতা আছে। উৎপল বলে।

—পাঁচশো ছেলের জানের সওয়াল। তাদের সম্মতি না নিয়ে কিছু করা ঠিক হবেনা। মালগুলো বার করে রাখ শুধু। এ ব্লকের দোতালার বারান্দায় আগে মিটিং হবে। সবাইকে জমায়েত কর। নারায়ণ আমার সঙ্গে আয়।

শ্যামল আর নারায়ণ ছাদে উঠে প্রথমে কিছুই দেখতে পায়না। তারপর একাদশীর চাঁদের আলোয় অনেকক্ষণ তীক্ষ্ন চোখে তা কয়ে বুঝতে পারে। গেট থেকে পনেরো বিশ গজ দূরে গোটা পাঁচ সাতেক গাড়ি চুপচাপ দাঁড়িয়ে। যোধপুর পার্কের ভেতরের রাস্তাতেও যেন কয়েকটা গাড়ি দাঁড়িয়ে। ঠিক কটা বোঝা যায় না। আনোয়ার শা রোড পোদ্দার নগরের মোড়েও বেশ কয়েকটা। উত্তর পশ্চিম দুদিক থেকে ঘিরছে। পূর্বদিকে খোদ যাদবপুর থানা আর তার কোয়ার্টার। একমাত্র দক্ষিণ দিকে পোদ্দার নগরের বস্তির দিক দিয়ে যদি কর্ডন ভাঙ্গার কোন উপায় থাকে। শ্যামল পেছনে বস্তির দিকে তাকায়। ইস যদি আরো কিছুদিন সময় পেত। পোদ্দারনগর বস্তি এলাকায় সবে কাজ শুরু হয়েছে। খুব সামান্য শক্তিই সংগঠিত হয়েছে। ধোঁয়ার হালকা মেঘের

আস্তরণে বস্তি ছেয়ে রেখেছে। ওদিকেও গাড়ি ঢুকেছে কিনা বুঝতে পারেনা শ্যামল।

—নারায়ণ, পোদ্দারনগরে আমাদের সমর্থক কাউকে চিনিস ?

—না।

—হরিকে গিয়ে বল।

—কোন হরি ?

—আমাদের ২ নং মেসের থালা বাসন ধোয় যে।

—ওকি আমাদের……

—হ্যাঁ। ওকে বল হারাণদাকে—ইলেকট্রিসিটি বোর্ডে যে কাজ করে—তাকে বলতে যে হোস্টেল পুলিশ ঘেরাও করেছে। হারাণদারা যেন পেছন থেকে মানে পোদ্দার নগরের দিক থেকে পুলিশকে আটকানোর চেষ্টা করে। ওদিক দিয়ে কোন রাস্তা নেই। এলে বস্তির ঘরবাড়ির ভেতর দিয়েই আসতে হবে। বিশাল ফাঁকা ছাদটা প্রায় একটা রাণওয়ের মত। একা শ্যামল এক কোণে দাঁড়িয়ে। পুলিশের গাড়িগুলো থেকে অনেক ছায়া ছায়া মূর্তি যেন নামছে মনে হয়। শ্যামলের ভীষণ কান্না পায় হঠাৎ। এই কুড়ি বছর বয়সে এমন কঠিন সময়ে কখনও পড়েনি। এত ছেলে ওরই মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। একটা ভুলের জন্য কত ছেলের প্রাণ……কি করবে ভেবে পায় না। হঠাৎ ছুটে নীচে নামতে থাকে। একটু পরেই খেয়াল হয়—এখন ওর অনেক দায়িত্ব। ওকে ছুটতে দেখলে তারও অনেক রকম প্রতিক্রিয়া হতে পারে। একটু দ্রুত পায়েই ও একতলায় টেলিফোন বুথটায় যায়। দেওয়ালে লেখা একগাদা নম্বরের মধ্যে ওর নিজেরই লেখা ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সলারের নম্বরটা বার করে ডায়াল করে। অপর প্রান্তে রিং হতে থাকে। শ্যামল অধৈর্য হয়ে পড়ে। ঘড়ি দেখে। এগারোটা পঁয়ত্রিশ।

—হ্যালো—ডঃ সরকারকে একটু—এক মিনিটের জন্য—মেন হোস্টেলে পুলিশ—রেখে দিল। ঘুমোচ্ছেন। ঘুম ভাঙানো সম্ভব নয়। শ্যামলের ভীষণ নার্ভাস লাগছে। আরেকটা কাশীপুর বরানগর বেলেঘাটা ঘটতে যাচ্ছে। উঃ—মাথার ওপর একটা কেউ থাকতো।—সুপার। হোস্টেল সুপার। শালা সুপারও হোস্টেলে থাকে না। ক্যামপাসে কোয়ার্টারে থাকে। নম্বর ঘোরায়। প্রথমবার পায় না। দ্বিতীয়বারে পেয়ে যায়।

—স্যার—হোস্টেল থেকে শ্যামল। না, মাছ পচা নয়। —পুলিশ। হোস্টেল ঘিরে ধরেছে। —আপনি কি করবেন ? —আপনার হোস্টেলে মাস ম্যাসাকার হবে।—আপনি একটা……রাগে উত্তেজনায় শ্যামল কাঁপতে থাকে। বলে কিনা কৃতকর্মের ফল। ওপাশ থেকে ছেড়ে দিয়েছে টেলিফোন। ইন-হিউম্যান। আবার ডায়াল করে সুপারকেই—মরিয়া হয়ে। এনগেজড ফোন। জানোয়ার। টেলিফোন নামিয়ে রেখে দিয়েছে। নিউজ পেপার—একটা ইংরাজী দৈনিকের

নম্বর লাগায়। ...হোস্টেল পুলিশ ঘিরে আছে এই মাঝরাতে। কিছু একটা ব্যবস্থা করুন। রিপোর্ট দিয়ে দেবেন। হতভাগা। পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে এতজন নিহত আহতের লিস্ট ছাপবে। হারামির বাচ্চা। হঠাৎ টেলিফোনটা ডেড হয়ে গেল। শ্যামলের নিজেকে ভীষণ বিধ্বস্ত মনে হল। বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে শেষ যোগাযোগের সূত্র কেটে দিল। এবার, এবার কি করবে। এল. সি. এস-এর শেল্টারে লোক পাঠিয়েছে। তিনি কি নির্দেশ দেবেন এ অবস্থায় ভেবে পায় না শ্যামল। আর যে গেছে পেছনের প্রাচীর টপকে সে আর ফিরে এসে ঢুকতে পারবে কি না সন্দেহ।

টেলিফোন বুথের পাশেই সিঁড়ি। ছেলেরা সব এ ব্লকের দোতলায় উঠেছে। তাদের টুকরো কথা শুনতে পায় শ্যামল।— ছাড় ছাড় ওসব গরম কথা'... 'মগের মুলুক নাকি' '......এ কি দু একজনের ব্যাপার নাকি, পাঁচ পাঁচশো ছেলে' '...কয়েক জনের জন্য এত ছেলে' 'আমরা তো আর করিনি কিছু।'

শ্যামল সিগারেট ধরায়। হাতটা একটু কাঁপে। এই হোস্টেলেরই স্মরণ গ্রামে কাজ করতে গিয়ে শহীদ হয়েছে। ছেষট্টির খাদ্য আন্দোলনের সময় সারা বাংলা যখন উত্তাল তখন ওদের বিশ্ববিদ্যালয়ই একমাত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেখানে নিরুপদ্রবে ক্লাশ হয়েছে। শ্যামল শুনেছে প্রেসিডেন্সির ছেলেরা নাকি তখন শাঁখা আর সিঁদুর পাঠিয়েছিল।

ওপরে সব ছেলেরা জমায়েত হচ্ছে। বাইরে পুলিশ সারা চত্বর ঘিরে ধরেছে। শ্যামল কি করবে কি বলবে ভেবে পায় না। অনেক দিন ধরেই ভাবছে স্টাডি ব্রেক করে গ্রামে সংগঠন গড়ার কাজে চলে যাবে। কলেজের পুরোনো নেতৃস্থানীয় সংগঠকেরা অনেকেই চলে গেছে। গ্রামে চলে গেলেই ভাল ছিল। এ অবস্থায় ও কি করবে। মাথার ওপর কেউ নেই। পার্টি কমিটির সঙ্গে পরামর্শ করা যোগাযোগ করার রাস্তা বন্ধ। শ্যামল ভীষণভাবে একটা কারুর ওপর নির্ভর করতে চায়।

সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠতে থাকে। শ্যামলকে দেখে কেউ কেউ চুপ করে যায়। দু একজন এগিয়ে আসে কথা বলতে। তারা কি বলে যায় শ্যামলের মাথায় ঢুকেও ঢোকে না।

ও আসলে নিজেই কিছু ঠিক করতে পারছে না। নিজের মৃত্যু ভয়েই কি ভীত হচ্ছে? না না তা শ্যামলের মনে হয় না। মৃত্যু ব্যাপারটা সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণাই ও করতে পারে না। কিন্তু এই ভয়াবহ বোঝার মত দায়িত্ববোধটা। হঠাৎ জ্যোতি ছুটতে ছুটতে আসে।—শ্যামল কি করবো? একটা ভ্যান ঠিক গেটের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। যদি ঢুকতে চেষ্টা করে?

শ্যামলের বলতে ইচ্ছে করে যা ভাল বুঝিস কর। ও খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে।

—আধঘণ্টা অন্ততঃ যেভাবে হোক আটকে রাখ। মিটিং-এ সব ছেলেরা কি বলে সেটা অন্ততঃ শুনে নিই।

—ঠিক আছে। শেষ দম অব্দি আটকাবো কমরেড। লাল সেলাম।

এ ব্লকের লম্বা বারান্দা। বারান্দা উপচে কাছাকাছি ঘর সিঁড়ি বোঝাই করে ছেলেরা দাঁড়িয়ে। সবার চোখে মুখে উত্তেজনা ভয়ের মেশামেশি। শ্যামল ধীর পায়ে ভীড়ের মধ্যে দিয়ে এগোয়। মঞ্চ হিসেবে ব্যবহারের জন্য কে যেন একটা টেবিলও এনে রেখেছে। সুদেব এসে শ্যামলের কানে ফিসফিস করে বলে—বি ব্লকের পট্টনায়ককে শুধু আনা গেল না। মদে চুর হয়ে শুয়ে আছে। কিছু বলতে গেলেই বলছে—ওড়িষ্যার পট্টনায়ক ফ্যামিলির গায়ে ভারতের কোন বাপ্তোৎ পুলিশ হাত দেবে। —কয়েকজনে চ্যাংদোলা করে তুলে আনার চেষ্টা কর। না হলে বেঘোরে মরবে।

চাপা উত্তেজনায় থম থম করছে পরিবেশ। শ্যামল টেবিলের ওপর উঠে দাঁড়ায়। চোখ পড়ে ফার্স্ট ইয়ারের কয়েকটা ছেলের ওপর। এখনো ভালো করে গোঁফ দাড়ি গজায়নি।

—কমরেডস। প্রত্যেক মানুষের জীবনেই হয়ত কঠিন পরীক্ষার একটা দিন আসে। আমাদের সৌভাগ্য এমন দিনে আমরা কেউ একা নই। আপনারা জানেন প্রতিটি মুহূর্ত এখন মূল্যবান। পুলিশ চারদিক থেকে আমাদের হোস্টেল ঘিরে ধরেছে। আমরা জানিনা তাঁরা কি করতে চান। শুধু এটুকু আমরা জানি। এই কলকাতার বুকে বরানগর কাশীপুরের গণহত্যা হয়ে গেছে।

শ্যামল দম নেয়। ওর প্রতিটি কথা এই পাঁচশো জন অধীর আগ্রহে শুনছে। কিন্তু এরপর ও কি বলবে। হঠাৎ ভীড় ঠেলে ক্যান্টিন কণ্ট্রাক্টর বাচ্চুবাবু এগিয়ে আসতে থাকেন। শ্যামল একটু অবাক হয়। এত রাত্রে বাচ্চুবাবু। ক্যান্টিনের ক্যাশ গুণে রাত নটা নাগাদ লোকটা রোজই চলে যায়। শ্যামলের অনেক দিন ধরেই সন্দেহ লোকটা পুলিশের ইনফরমার।

—শ্যামলবাবু। খুবই অ্যাপোলোজেটিক টোনে বলেন বাচ্চাবাবু।

—আমার আজ বেরোতে একটু দেরী হয়েছিল। পুলিশ ধরল। বলল এই কজনকে ওদের চাই। তাহলে বাকিদের আর কিছু বলবে না। সাদা টুকরো কাগজে পনেরোটা নাম। শ্যামল চোখ বুলিয়ে নেয়। প্রথম নামটাই ওর নিজের। বাকি এগারোজন হোস্টেলের আর তিন জন বাইরের। কলেজের নয়। লোকাল ইউনিটের ছেলে। পাড়াতে টিঁকতে না পেরে মাঝে মাঝেই হোস্টেলে এসে থাকে। আজকে সৌভাগ্যক্রমে ওদের মধ্যে এক অলক ছাড়া কেউ নেই। শ্যামলের নিজেরও একটু আশ্চর্য লাগে। পনেরো জনের মধ্যে ন জন জেনুইন। পার্টির কাজে যুক্ত। দ্যুতির মত পাতি সিমপ্যাথাইজারের নামও ওয়ান্টেড লিস্টে ঢুকে গেছে।

—কমরেডস পুলিশ পনেরো জনকে গ্রেপ্তার করতে চায়। নামগুলো আমি পড়ছি। তার মধ্যে তেরোজন আমাদের মধ্যে উপস্থিত। শ্যামল নাম পড়তে থাকে।
দ্যুতি নিজের নামটা শুনে চমকে ওঠে। এরকম আরো দু তিনটে নামে অনেকেই চমকে ওঠে। শ্যামল সজল নারায়ণ এদের নামে কেউ আশ্চর্য হয় না।
শুধু ছাত্রফ্রণ্টেই নয়—বস্তি এলাকায় সংগঠন গড়ার কাজে শ্রমিকদের মধ্যে কাজেও ওরা সক্রিয়। দ্যুতি থাকতে না পেরে উত্তেজিত হয়ে বলে—আমার নাম কেন?
হঠাৎ কথার মাঝে বাধা পেয়ে শ্যামল দ্যুতির দিকে তাকায়।
—লিষ্টটা আমি বানাইনিরে। পাঁচশো ছেলের উত্তেজনা থমকে দাঁড়িয়ে। শ্যামল গলা ঝেড়ে আবার বলে—আমাদের সামনে দুটো রাস্তা আছে। এই লিষ্ট অনুযায়ী কজনকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া। দ্বিতীয়তঃ সবাই বিপদের ঝুঁকি নেওয়া। কমরেডদের পুলিশের হাতে তুলে দিতে অস্বীকার করা। সময় কম। আপনারা একটু ভেবে নিয়ে সিদ্ধান্ত নিন। টেবিল থেকে নেমে দাঁড়ায় শ্যামল। আর হঠাৎ কি হয়, নিখিলেশের মত সাতে-পাঁচে-থাকেনা ছেলে টেবিলের ওপর উঠে দাঁড়ায়। ঠিক রাজনীতি করা ছেলে ও নয়। কোনদিন প্ল্যাটফরমে ওঠা তো দূরের কথা শ্লোগান অব্দি লিড করে না। বড় জোর সমর্থক বলা যায়। আবেগে কাঁপা কাঁপা গলায় বলতে শুরু করে—বন্ধুগণ. আপনারা মানে তোরা সবাই জানিস—ভীড়ের মধ্যে দেবেশ পাশের ছেলের কানে ফিস ফিস করে—এ বেটাও কি নকশাল নাকি?
—রাজনীতি-ফিতি আমি কিছু বুঝিনা। কিন্তু চারপাশে বন্দুক উঁচিয়ে বসে আছে। এর মধ্যে শয়তান আর মৃত ছাড়া কেউ স্থির থাকতে পারে। আজ বন্ধুদের পুলিশের হাতে তুলে দেবার অর্থ কি আমরা জানি। এই রাতের অন্ধকারে কোথাও একটা এনকাউন্টারের গপ্পো তৈরী হবে। কয়েক জনের লাশ পাওয়া যাবে। কয়েকজন নিখোঁজ।
—কিন্তু তাতে আমরা কি করবো? দেবেশ ঝাঁঝের সঙ্গে বলে।—আমরা কি আমাদের লাইফ অহেতুক রিস্ক করবো?
—আমরা পাঁচশো জন রুখে দাঁড়ালে এই কজনকে তুলে নিয়ে যাওয়া সহজ হবে না। ভীড়ের মধ্যে থেকেই কে যেন চেঁচায়।
—বন্ধুদের হত্যার সাক্ষী হয়ে আমরা সারাজীবন বিবেকের কাছে কি জবাব দেবো?
ভীড়ের মধ্যে পরস্পরের হৃদস্পন্দনের শব্দ শুনতে পাওয়া যায়।
—আমরা সারারাত আগলে রাখবো বন্ধুদের। আটকে রাখবো পুলিশকে। পারলে কর্ডন ভেঙ্গে বেরিয়ে যাবো। অন্ততঃ ভোর অব্দি আটকে রাখবো।

কলকাতার আশি লক্ষ লোক জানুক জানুক বাংলার ছাত্ররা সংকীর্ণ স্বার্থপর নয়। বলুন সবাই আমরা কি করবো? সারেন্ডার না লড়াই?
হঠাৎ যেন কেউ ভরা বর্ষার ড্যামের স্লুইস গেট খুলে দেয়—লড়াই লড়াই লড়াই।
বাচ্চুবাবু গুটি গুটি কেটে পড়ছিল। সজল চেঁচিয়ে ওঠে—ধর ধর খোঁচরটা পালাচ্ছে। ভীড় ঠেলে দৌড়তে গিয়ে বহু হাতের বাঁধনে আটকা পড়ে বাচ্চুবাবু। সজল চেঁচায়
—একটা ঘরে আটকে রাখ। পরে ব্যবস্থা হবে ওর। খবরদার, পালাতে না পায়।
সুব্রত শ্লোগান তোলে—সংগ্রামের লাল আগুন দিকবিদিকে ছড়িয়ে দাও। সশস্ত্র মুক্তি সংগ্রাম জিন্দাবাদ।
আর গেটের দিক থেকে ফায়ারিং-এর শব্দ আসে। সঙ্গে মোটরের ঘড়ঘড় আওয়াজ আর লোহার মেন গেটটা ভাঙ্গার ঝন ঝন শব্দ। আবার এক পশলা ফায়ারিং-এর শব্দ। তারপরেই বম্ম—একটা শব্দ। আবার সব চুপচাপ। হঠাৎ এ ব্লকেরও সব আলো নিভে যায়। শ্যামল বলে—ইলেকট্রিক কানেকশান কেটে দিল। তারপর বজ্রকণ্ঠে হাঁক—কেউ উত্তেজিত হবেনা। নিজের জায়গা থেকে নড়বেনা। বাইরের দিককার জানালা বা বারান্দা দিয়ে ভুলেও কেউ উঁকি মারবেনা।
জ্যোতি ছুটে এসে বিজয়ীর মত রিপোর্ট করে—বন্ধুগণ, সি. আর. পি-র একটি ট্রাক গেট ভেঙ্গে ঢোকে তার পেছনে অনেক সি. আর. পি রাইফেল উঁচিয়ে। আমরা একটা কাঠের চেয়ার ছুঁড়ি গাড়ির উইন্ডস্ক্রীন লক্ষ করে। লাগে না। ওরা এক ঝাঁক ফায়ারিং করে। আমাদের কারোর কিছু হয়নি। তারপর গাড়ির ইঞ্জিনের ওপর নিখুঁত নিশানায় একটা মাল টপকানো হয়। এখন ওদেরই গাড়ি দিয়ে একটি সুন্দর ব্যারিকেড তৈরি হয়েছে। আর সি. আর. পি ব্যাটারা চোঁ চাঁ দৌড় দিয়েছে। জ্যোতির গলায় জয়ের উল্লাস।
শ্যামল দায়িত্ব বোধের বোঝায় ঘামতে থাকে। এই উৎসাহ উত্তেজনার ঠিকভাবে কি করে লাগাম ধরবে। জ্যোতিকে ফিস ফিস করে জিজ্ঞেস করে—কটা মাল আছে?
—আর সতেরোটা। কয়েকটা ড্যাম্প বেরোতে পারে।
সজল, তুই আর অলক—তিনজনের দায়িত্বে তিনভাগ করে তিন জায়গায় পজিশন নে। বি ব্লক ছেড়ে তোরা সি তে, আর এ ব্লকের ওই মাথায় ঝিল পোদ্দার নগরের কোণায় সজল। আর এ ব্লকের এ মুখে অলক। সঙ্গে সাত-আটজন করে ছেলে বেছে নে প্রত্যেকে। বাকিদের দিয়ে এই পেছনে এক্সটেনশনের জন্য যে ইঁট এসেছে, ছাদে তিন তলায় বারান্দায় তোলা।
লাইন করে ছেলেরা পেছনের খোলা জমি থেকে সিঁড়ি বেয়ে তিন তলার ছাদ

আব্দ দাঁড়িয়ে। হাতে হাতে ইঁট উঠে যাচ্ছে। শ্যামল দুজন করে তিনটে দলকে বলে—তিনটে তলার ঝিলের দিককার সমস্ত জানলা বন্ধ করতে। বেগতিক বুঝলেই যেন মেঝেতে বসে পড়ে।

শ্যামল এবার তিন তলার ছাতে যায়। চারদিক দেখে নেয়। সজলকে বলে—সাবধান থাকিস। ঝিলের এ পাশের সরু রাস্তাটা দিয়ে ঢোকার চেষ্টা করতে পারে। একজনকে পোদ্দার নগরের প্রাচীরটার দিকে নজর রাখতে বল। হঠাৎ একাধিক জোরালো টর্চের আলো বিভিন্ন ব্লকের ওপর দিকে ঘুরে ঘুরে যায়। চারিদিক শান্ত সমাহিত। হঠাৎ ফায়ারিং বোমার আওয়াজে উল্টোদিকে যোধপুর পার্কে যে বাড়িগুলোয় ঘুম ভেঙে গিয়েছিল তারা নাইট ল্যাম্পের মোলায়েম আলোয় জানলা সামান্য ফাঁক করে ব্যাপার বুঝে আবার জানলা বন্ধ করেছে।

খানিকক্ষণ সব চুপচাপ। কোথাও ঝিঁ ঝিঁ পোকা ডাকছে। পাঁচশো ছেলে অতন্দ্র প্রহরীর মত চোখ স্থির নিবন্ধ রেখেছে হোস্টেলে ঢোকার গেট ও ফাঁক ফোকরগুলোর ওপর। আনোয়ার শাহ রোডে কোনদিনই আলো জ্বলেনা। হোস্টেলের লাইন কেটে দেওয়ায় পুরো চত্বরটা একাদশীর চাঁদের আলো আর অন্ধকারে রহস্যময় হয়ে উঠেছে।

হঠাৎ মেন গেট দিয়ে ফায়ারিং করতে করতে এক দঙ্গল সি. আর. পি ঢুকতে শুরু করে। সি ব্লক থেকে জ্যোতিদের দলটা ঝপঝপ ইঁট মারতে শুরু করে। যেন শিলাবৃষ্টি। সি আর পিরা এলোপাথারি গুলি ছোঁড়ে। ঝনঝন শব্দে জানালার কাঁচ ভাঙ্গে। সি ব্লকের দোতলা তিনতলার বারান্দা তিন তলার ছাদ থেকে অঝোরে ইঁটের ধাক্কা সামলেও কয়েকটা সি. আর. পি এ ব্লকের দিকে এগিয়ে যায়।

অলক এ ব্লকে ঢোকার মুখে দোতলার বারান্দায়। কারুর মুখে কোন কথা নেই। সবাই বসে পড়ে দেওয়ালের আড়ালে। সি. আর. পি গুলো ছুঁড়ছে—এগিয়ে আসছে। অলক হাতটা পেছনে নিয়ে দোল খাইয়ে মালটা ছেড়ে দেয়। অব্যর্থ নিশানা। ঠিক সি আর পি গুলোর সামনে গিয়ে ফাটে। হয়ত কারুর কারুর গায়ে স্প্লিন্টারও লাগে। আর তারা এগোয় না পেছন ফিরে দৌড়ে পালায়। আর এদিকে রাত্রির অন্ধকার কাঁপিয়ে শ্লোগান ওঠে—প্রতিক্রিয়াশীলদের পুড়িয়ে মারো। সশস্ত্র কৃষি বিপ্লব জিন্দাবাদ।

সজল এসে শ্যামলকে বলে—জ্যোতিরা সি ব্লক ধরে রাখতে পারবে না। মারা পড়বে। পুলিশ বেটাদের মুভমেন্ট লক্ষ্য কর। আমার মনে হয় এরপর ওরা সি ব্লক টারগেট করে এ ব্লকের সঙ্গে কাট অফ করে প্রথমে ওদের ধরে এদিকে আসার রাস্তা পরিষ্কার করবে।

—বলছিস। ওদের উইথড্র করে চলে আসতে বলবো।

—অলকের সঙ্গে কথা বল। ও কি বলে দেখ।

—আমরা হেরে গেলে ওরা আমাদের মেরে ফেলবে? একটা বাচ্চা ছেলে শ্যামলকে কাঁদোমাচু মুখে জিগ্গেস করে। শ্যামলের খুব মায়া হয়। পিঠে হাত রেখে সান্ত্বনা দেবার ভঙ্গিতে বলে—না। আমরা ক'জন বলবো সব ঝামেলার জন্য দায়ী আমরা। তাহলে বাকিদের ছেড়ে দেবে।

—আর আপনাদের?

শ্যামল কোন উত্তর দেয়না। ছেলেটার মুখ শুকিয়ে যায়। সিনেমার পর্দার যুদ্ধ নয়, ওয়েষ্টার্ণ বইয়ের স্নাইপারের শট নয়—প্রত্যক্ষ লড়াই। নিজেদের জীবন—যে কোন মুহূর্তে জীবন যেতে পারে।

নির্দেশ মত জ্যোতিরা সি ব্লক থেকে গ্রুপে ভাগ ভাগ হয়ে ছুটে এ ব্লকে চলে আসে। আবার স্লোগান ওঠে।

এ দিকে দোতলার একটা ঘরে বাচ্চুবাবুকে জিজ্ঞাসাবাদ চলতে থাকে—আজকেই এত রাত্রি অব্দি কেন ছিলেন? কোনদিন তো থাকে না?

—না মানে একটু কাজ ছিল। সারা সপ্তাহের জিনিসপত্র কি লাগবে না লাগবে তার হিসেব।

—হিসেব। তোমার হিসেব বার করছি। বলু সত্যি কথা?

—বলছি তো সত্যি।

—বেদম ক্যালাবো। বলু শালা। কাকে কত ঘুষ দিয়ে ইউনিভার্সিটির সব কটা হোস্টেলের ক্যান্টিনের কন্ট্রাক্ট পাসু?

—আমাকে তোমরা ছেড়ে দাও।

—ছেড়ে দাও। বল পুলিশের খোঁচরগিরি কদ্দিন ধরে করছিস।

সম্মিলিত চড় চাপড় পড়ে। জ্যোতি থামায়। —বল সত্যি কথা নয়ত মেরেই ফেলবো। কোন্ তোর পুলিশ বাপ বাঁচাবে?

বাচ্চুবাবু এমন অবস্থায় জীবনে পড়েন নি। পুলিশকে খবরাখবর বহু বছর দিচ্ছেন। না ঠিক পয়সার জন্য নয়। পুলিশের সঙ্গে খাতির রাখলে অন্যদিকে সুবিধে হয়। এই যে অন্য লোককে শিখণ্ডী করে বোমার মশলা লাল সাদার ব্যবসাটা চালিয়ে যাচ্ছেন। প্রচণ্ড লাভজনক ব্যবসা। শুধু পুলিশকে খবরাখবর দিতে হয় কারা কিনছে। না হলে কি আর পুলিশ এ ব্যবসা করতে দিত। সে খবরটা ভাগ্যে এরা জানে না।

—বল, চুপ করে থাকলে মাথা গুঁড়িয়ে দেবো।

—জ্যোতিবাবু আপনি তো ভাল ছেলে। আপনার বাবা দিল্লীতে অতবড় সরকারি অফিসার। আপনি এদের দলে পড়ে।

—হারামিপনা করিস্ না। ওসব কথায় চিঁড়ে ভিজবে না। বল শালা।

আবার ঝড়ের বেগে নতুন উদ্যমে সি আর পি রা ঢোকে। এবার আর একদিক দিয়ে নয়। দুদিক দিয়ে। মেন গেট দিয়ে। সঙ্গে ঝিলের পেছন পোদ্দার নগরের দিক দিয়ে। পোদ্দারনগর বস্তির দিকেও সোরগোল ওঠে।

বোধহয় ওদিক দিয়েও ঢুকতে চেষ্টা করে বস্তির লোকেদের কাছে বাধা পেয়েছে।

ঘন ঘন ফায়ারিং, ইঁট বৃষ্টি, মাঝে মাঝেই বোম চার্জের আওয়াজ গমগম করে ওঠে। হঠাৎ কে যেন ছুটে এসে বলে নারায়ণের হাতে গুলি লেগেছে। শ্যামল ছাদ থেকে দৌড়ে দোতলায় যায়।

গল গল করে রক্ত বেরোচ্ছে। নারায়ণ গোবিন্দর কোলে মাথা দিয়ে শুয়ে আছে।

—শ্যামলদা ডান হাতটাই নিয়ে নিল। মুক্তাঞ্চলে যাবার ডাক পড়লে আর কাজে লাগবো নারে। বন্দুকই ধরতে পারবো না। নারায়ণ কেঁদে ফেলে ব্যথায় না দুঃখে ঠিক বোঝা যায় না।

—গুলিটা বার করা দরকার। অলককে ডাক।

শ্যামল ভাবে অলক আগে এক অ্যানার্কিস্ট গ্রুপে ছিল। ওদের বোধহয় এসব শিখিয়েছিল। অলক এসে হাল ধরে। এ ঘর ও ঘর খুঁজে তুলো ডেটল পাওয় যায় না। কে যেন একশিশি আফটার শেভ নিয়ে আসে। সুখদেব ওরই মধ্যে কিচেন থেকে পরের দিন সকালে রান্নার জন্য যে জল গরম চাপানো ছিল তার থেকে জল আনে। অলক পরিষ্কার করে হাত ধুয়ে ওপর ওপর দেখে বলে—মনে হয় বেশী ভেতরে ঢোকেনি। ডাইরেক্ট লেগেছে নাকি কোথাও রিবাউন্ড করে এসে লেগেছে? নারারণ—ঘাড় নাড়ে। কে আর অত খেয়াল করেছে। অলক শ্যামলকে বলে—তুলো ব্যান্ডেজ অ্যান্টিসেপটিক ও একটা ছুরি চাই।

—মেডিক্যাল রুম তো সি ব্লকে।

এ কথাটার অর্থ সবাই বোঝে। সি. আর. পি. রা এ রাউন্ডও পিছিয়ে গেলেও ওৎ পেতে বসে আছে। শ্যামল গা ঝাড়া দিয়ে উঠে বলে—আচ্ছা দেখছি। নারায়ণের জামা ভিজে রক্ত মেঝেতে গড়াচ্ছে। সঞ্জয় শ্যামলের হাত চেপে ধরে।

—না, আপনি যাবেন না। আপনার এখানে থাকা বেশী জরুরী।

—সঞ্জয় পাগলামো কোরোনা।

—ভেবে দেখুন। পাগলামো আমি করছি না।

—এখন সি ব্লকে যাওয়া আসা মানে জানো?

—হাঁ। যে কোন সময় বুলেট লাগতে পারে।

—সঞ্জয়।

শ্যামল সজলকে বিশেষ ভাবে মাল পত্র নিয়ে মেন গেটের দিকে নজর রাখতে বলে। সঞ্জয় শ্যামলের কথা মত ক্রল করে বুকে ছেঁচড়ে ছেঁচড়ে শত্রুর দৃষ্টি এড়িয়ে এগোতে থাকে। সি. আর. পি. রা গেটের কাছে ঘোরাফেরা করে। সঞ্জয় অন্ধকারে মিলিয়ে যায়। এ ব্লকে সবাই রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করতে থাকে। প্রতিটি মুহূর্ত ভারী হয়ে বুকে চেপে বসে।

একফালি চাঁদটা আকাশের এককোণে কখন যেন সরে গেছে। বেশ কিছু তারা

চকমক করছে। শ্যামলের কপালের ওপর বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে। সি ব্লক আর এ ব্লকের মাঝখানের গজ তিরিশেক রাস্তার বড়জোর অর্দ্ধেক অবিদ চেষ্টা করে দেখা যাচ্ছে। সঞ্জয় এত দেরী করছে কেন। —ওইতো। পাশ থেকে কে যেন বলে। শ্যামল বলে—চুপ।

এগিয়ে আসছে ক্রল করে। সঞ্জয় ব্রাভো। আর একটু জলদি। শ্যামল বাইরের দিকে তাকায়। ওই পক্ষে হঠাৎ যেন নতুন আক্রমণের তৎপরতা শুরু হয়েছে। হঠাৎ সমস্বরে জয়ধ্বনি ওঠে। সঞ্জয় পৌঁছে গেছে।

অলক নারায়ণকে একটা খাটের ওপর শুইয়ে চারজনকে নারায়ণের হাত পা চেপে ধরতে বলে। অভিজ্ঞ ডাক্তারের মত বলে—অ্যানেসথেসিয়া ছাড়া অপারেট করতে হবে তো। রোগী লাফিয়ে উঠবে। শক্ত করে ধরে রাখবি।

সজল শ্যামলকে আবার ছাদে ডেকে পাঠায়।—ওই দেখ আরো কতগুলো গাড়ি এল। শ্যামল দেখে একটা ট্রাফ ব্যাক করে গেট দিয়ে ঢুকল। অকেজো ট্রাকটাকে দড়ি দিয়ে বাঁধল। তারপর টেনে বার করে নিয়ে গেল।—ব্যারিকেড হঠাচ্ছে!

হঠাৎ দু তিনটে তীব্র সার্চ লাইট জ্বলে ওঠে। একটা বিচিত্র চেহারা ছোট মেশিন রাস্তার ওপর এদিক ওদিক ঘোরাতে ঘোরাতে কয়েকজন ঢোকে গেট দিয়ে

—আমি। শ্যামল বলে।

—ওই মেশিনটা কি?

—বোধহয় মাইন ডিটেক্টর। শালারা ভেবেছে আমরা মাইন পুঁতে রেখেছি। হঠাৎ একটা বোম ফাটে, আমি কন্টিনজেন্টাটার থেকে অনেক দূরে। জোরেই ছুঁড়েছিল। কিন্তু অতদূর পৌঁছোয় না।

ছাদের রেলিংয়ে সাবমেশিন গানের এক ঝাঁক বুলেট এসে লাগে। ওরা বসে পড়ে। শ্যামল দাঁতে দাঁত চেপে বলে—মাল নষ্ট করিস না।

—আর মাত্র পাঁচটা আছে।

বুলেটের শব্দের প্রতিধ্বনি হয়। দূরদূরান্তের পাখপাখালিরা সেই শব্দে চমকে জেগে ওঠে। শ্যামল উঁকি দিয়ে পূব আকাশে ভোরের আলো খোঁজে।

—আর একটু বাদেই আলো ফুটবে।

—তোকে বলিনি। একটা পাইপগান আর ছটা কার্তুজ আছে। আনবো।

—আন।

—শ্যামল কমিটেড কয়েকজনকে থাকতে বলে। বাকিদের বলে—দোতলা আর তিন তলার ঘরে ভাগ ভাগ হয়ে ঢুকে ভেতর থেকে বন্ধ করে দিবি। দরজার মুখে টেবিল চেয়ার যা পারিস দিয়ে আটকাবি।

—আর তোমরা?

—যা বলছি শোন। অহেতুক বেশী লোক শহীদ হয়ে তো লাভ নেই।

—না। যা হবার সকলের একসঙ্গে হবে। লোক কমে গেলে তোমাদের টিপে মারবে।

—বেশ যাদের ইচ্ছে তারা বাইরে থাক। বাকিরা গিয়ে ঘরে আটকে বস।

ব্যারিকেড সব সরিয়ে ফেলেছে। শুধু এ ব্লকের সামনে কয়েকটা টেবিল রাস্তা আগলে দাঁড়িয়ে। পোদ্দার নগরের দিক থেকে হল্লা ওঠে। শ্যামল বোঝে ওদিক দিয়েও আর্মি ঢুকছে। হঠাৎ তীব্র বেগে পরপর চারটে শক্তিমান ট্রাক ঢোকে মেন গেট দিয়ে। পেছনে ঝিলের পাশের রাস্তা দিয়েও একদল জওয়ান। সামনের শক্তিমানটার ধাক্কায় টেবিলগুলো ছিটকে পড়ে। সজলের পাইপগানের গুলিতে দ্বিতীয় ট্রাকটার একটা চাকা পাংচার হয়। দাঁড়িয়ে পড়ে পেছনের ট্রাকগুলো। আর হৈ হৈ করে ঢুকে পড়ে আর্মি। তুমুল আর্ত চীৎকার ফায়ারিং-এর শব্দ বোমার আওয়াজ।

পনেরো বিশজন আর্মি যখন উদ্যত স্টেনগান নিয়ে ছাদে পেঁছোল তখন সজলের হাতে কার্তুজহীন পাইপগানটা মরা টিকটিকির মত ঝুলছে। সঞ্জয় কেঁদে ফেলল—শ্যামলদা আমরা হেরে গেছি।

পুব আকাশে তখন ভোরের আলো ফুটেছে। পোদ্দার নগর যাদবপুর ঢাকুরিয়া গরফা সেলিমপুর উজাড় করে বাইরে মানুষ ভীড় করেছে। দাঁতে দাঁত চেপে সজল বলে—না আমরা জিতে গেছি।

কয়েকটা সি. আর. পি এগিয়ে এসে সজলের হাত থেকে পাইপগানটা কেড়ে নিয়ে সেটা দিয়েই কষে পাছায় মারে। —গাঁঢ়মে ভরদে।

এক আর্মি অফিসার খেঁচায়—খুদমে তো ইঁহা ঘুসনে কা হিম্মৎ নহী হুই। হম লোগোঁকো আনা পড়া। অভি দিখা রহা হ্যায় জোশ।

এই বিশাল সংখ্যক ছাত্র বন্দীদের যখন ভ্যান বোঝাই করে করে তুলছে তখন আবার শ্লোগান ওঠে। সমবেত ভীড়ে চাঞ্চল্য জাগে। সেদিকে তাকিয়ে শ্যামল স্বগতোক্তি করে—আমরা জিতিনি, হারিওনি। আমরা জিতবো।

গণেশের সিদ্ধিলাভ

তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

তার নাম গণেশ চক্রবর্তী। সে একজন সাধারণ মানুষ। চাকরী করে মাসের শেষে মাইনে পাওয়া, রোজ সকালে বাজার করা, দুই কি তিনবছর অন্তর চার-দিনের জন্য দীঘা অথবা শান্তি-নিকেতন বেড়াতে যাওয়া—এইসব, যা আরো অনেকেই বাঁধা ছকে সারাজীবন করে চলেছে, এতেই গণেশ সন্তুষ্ট থাকে। সে দার্শনিক নয়, ভাবুক নয়। জীবনের অর্থ কি, এইকথা ভেবে সে কোনোদিন রাত্তির জাগেনি। গণেশ একজন বাঙালী কেরাণী।

কিন্তু হঠাৎ কার মাথায় যে কি চিন্তা আসে কে জানে! পাড়ার রমেশ মল্লিক মারা যাওয়াতে গণেশ কেমন যেন চিন্তার পড়ে গেল। এই গরীব পাড়ায় রমেশ মল্লিককে মানাতো না। তার গাড়ি আছে বাড়িটা নিজের। পাড়ায় নানারকম গুজব আছে তার উপার্জনের পরিমান সম্পর্কেই। আচমকা কদিন আগে শোনা গেল মাথার রগ ছিঁড়ে রমেশ মল্লিক মারা গিয়েছে। গণেশ ভারি আশ্চর্য হয়ে গেল। অথচ অবাক হবার যে কোনো কারণ নেই একথা কি গণেশ জানে না? সে কি ভেবেছিল বড়লোক বলে রমেশ মল্লিক দেড়শো বছর বাঁচবে?

অফিসে টিফিনের সময় ক্যান্টিনে বসে চা-টোস্ট খেতে খেতে ননী দত্তকে জিজ্ঞাসা করল গণেশ—আচ্ছা ননী, চাকরী করে কি হয় বলতে পারো?

ওমলেট মুখে পুরতে গিয়ে ননী দত্ত হাঁ হয়ে গেল।

—সে আবার কি কথা দাদা? চাকরী করে মাইনে পাওয়া হয়। সেই মাইনে দিয়ে চাল ডাল তেল নুন কেনা হয়, দু একটা সিনেমা-থিয়েটার দেখা হয়। মোটের ওপর জীবনধারণ করা হয়। কেন, দাদা কি জানতেন না নাকি?

গণেশ বিব্রতমুখে বলল—না ঠিক তা নয়। মানে, মাইনে তো পাবোই। কিন্তু ধরো যদি আরো মাইনে পেতাম, তাহলে কি চিরকাল বাঁচতাম? মানে, মানুষ কি টাকার জন্যেই—আমি ঠিক বোঝাতে পারছি না—হচ্ছে গিয়ে, মানুষ বাঁচে কেন?

ননী দত্ত কিছুক্ষণ হাঁ করে থাকল, তারপর বাকি ওমলেটটুকু মুখে দিয়ে জলের গ্লাস হাতে নিয়ে বলল—দাদা মাঝে মাঝে ভারি মজা করেন।

হিসেবের গরমিল হচ্ছে আসলে। লোকে টাকা জমায় ভবিষ্যতে কাজে লাগবে বলে। যা কিছু করে পরে কাজে লাগবে বলেই করে। কিন্তু শেষ ভবিষ্যৎ তো মৃত্যু। তাহলে এত সব করে লাভ? এমন কি রমেশ মল্লিকও তার লাখ টাকা নিয়ে মাত্র দেড়শো বছর বাঁচে না। ভাল করে চুল পাকবার আগেই রওনা দেয়। তাহলে তার এত গাড়ি নিয়ে দৌড়া-দৌড়ি এত পরিশ্রম—সবই ফক্কা। সাধারণ কেরানী গণেশ চক্রবর্তী বিপদে পড়ল। এমন এক চিন্তা তার মাথায়

ঢুকছে যা তার আয়ত্তের বাইরে। মানুষ যখন মারা যাবেই তখন তারা কষ্ট করে বাঁচে কেন? যে ব্যাংক একদিন ফেল পড়বেই, তাতে কি কেউ জেনে শুনে টাকা রাখে?

অথচ উপায়ই বা কি? নইলে তো আত্মহত্যা করতে হয়। ভারি বিপদ। খুব বিপদ।

অমলা খোকাকে নিয়ে বাপের বাড়ি গিয়েছে কাল। ফিরতে এখনও তিন-চারদিন। কাজেই হাঁটতে হাঁটতে ময়দানে গিয়ে বসলো গণেশ।

একদম ভালো লাগছে না। যাচ্ছেতাই ব্যাপার জীবনটা। একদিন সে থাকবেনা। অথচ সেদিনও লোকে বাজার করবে, হিন্দি সিনেমার টিকেটের জন্য চড়া রোদে লাইন দেবে। ট্রেনে চেপে বেড়াতে যাবে পুরী অথবা গোপালপুর। বিকেলে ময়দানে ওইরকম একটা ফুচকা ওয়ালার কাছে সেই গণেশ চক্রবর্তী, একেবারে 'না' হয়ে যাবে। কি অন্যায়। ভবিষ্যতের গর্তে নিহিত তার অবর্তমানে এইসব আনন্দ উপভোগকারীদের ওপরে মনে মনে দারুণ চটে গেল গণেশ।

মাত্র সাড়ে ছটা বাজে। বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে করছে না। ভেবেচিন্তে গণেশ তাপসের বাড়ি যাবে ঠিক করলো। ছোটবেলার বন্ধু, একসঙ্গে ইস্কুলে পড়েছে। সন্ধ্যেবেলটা আড্ডা দিয়ে বাড়ি ফেরা যাবে।

কিন্তু যা ভাবা যায় তা হয়না। তাপস বাড়ি নেই। তাপসের বুড়ো বাবা ছাড়া কেউই নেই সবাই আসানসোলে কোন এক আত্মীয়ের বিয়ের নেমন্তন্ন খেতে গিয়েছে। গণেশ চলে আসছে, তাপসের বাবা ডেকে বসালেন—আরে বোসো বন্ধু বাড়ি নেই তাতে কি? আমি তো আছি। বোসো।

বুড়োদের অনেক কথা বলবার থাকে যা কেউ শুনতে চায় না। ভদ্রতাবশত গণেশ সহানুভূতিশীল শ্রোতার মত মুখ করে বসেছিল, ফলে তাপসের বাবা তার জন্ম থেকে বর্তমান মুহূর্ত পর্যন্ত জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি গণেশকে শোনাতে লাগলেন। গণেশ বাইরে আগ্রহ ফুটিয়ে রেখে ভেতরে অন্যমনস্ক হয়ে গেল।

দেওয়ালে দাড়িওয়ালা বাঘছালের ওপর বসে থাকা একজন লোকের ছবি। কে লোকটা?

তাপসের বাবা কথা থামিয়ে গণেশের দৃষ্টি অনুসরণ করে দেওয়ালের দিকে তাকালেন।

—ওঃ, তুমি গুরুদেবের ছবি দেখছ? চোখে পড়বার মত চেহারা একটা, না? মস্ত লোক, দিব্যাত্মা। একবার উনি—

—উনি কোথায় থাকেন?

—এই কোলকাতাতেই। কেন বলো তো? যাবে?

—তা—ঠিকানা পেলে একবার—

তাপসের বাবা খুশি হলেন। —গুরুদেবের একটা জ্যোতি আছে, জানো?

লোককে ভারি আকর্ষণ করে। ঠিকানা হচ্ছে—পরের দিন ছুটির পরে গণেশ গুরুদেবের কাছে গেল। সে ভক্ত-টক্ত কিছুই নয়। তবে এসব লোকের নাকি নানা ক্ষমতা থাকে। হয়তো বা হিসেবটা মিলিয়েই দেবে।

মানুষপুজো ব্যাপারটা গণেশের ভালো লাগে না। বড় ঘরের মধ্যে মখমলের তাকিয়ায় হেলান দিয়ে গুরুদেব বসে রয়েছেন। সামনে দশ-বারোজন লোক হাতজোড় করে চোখ বুজে বসে, তাদের চোখে জল। এইমাত্র বোধহয় কোনো গুরুতর ভক্তির কথা হয়ে গিয়েছে।

সে একপাশে বসলো। গুরুদেব দুজন ভক্তের সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন। সে কথার মাথামুণ্ড কিছু বুঝলো না গণেশ।

সামনে বসে থাকা একজন মধ্যবয়েসী লোক বলল—বাবা, তন্ময়তা কি করে পাবো ?

গুরুদেব হাসলেন। যেন চার্টার্ড এ্যাকাউনট্যানটকে দুই আর দুইয়ে কত হয় জিজ্ঞাসা করা হয়েছে। বললেন—চিৎশক্তিকে মূলাধারে কেন্দ্রীভূত করো। একটা গাছ কি একটা পাথর, যাতে হোক মন কেন্দ্রীভূত করে সেখানে ব্রহ্মের সন্নিবেশ কল্পনা করবে, দেখবে সবই পরাৎ পরে লীন হয়ে যাচ্ছে।

কে একজন আবেগে ভাঙা গলায় বলে উঠল—আহা। আহা। গণেশ তাকিয়ে বসে আছে।

প্রায় আধঘণ্টা পর গুরুদেবের চোখ পড়ল গণেশের দিকে। মৃদু হেসে মিষ্ট গলায় বললেন—তুমি কে বাবা ? কি চাও ?

গণেশ প্রথমে লজ্জায় পড়ল, তারপর কেশে গলা পরিষ্কার করে বলল—আজ্ঞে আমার মনে একটা প্রশ্ন জেগেছে। তাই আপনার কাছে এসেছি—যদি উত্তর পাই।

—কি প্রশ্ন ?

—আজ্ঞে, মানুষ বাঁচে কেন ? যদি একদিন মারা যাবেই, তাহলে এত খেটে জীবনে উন্নতি করবার চেষ্টাই বা করে কেন ? বাঁচা নিরর্থক নয় কি ?

গুরুদেব চোখ বুজে বললেন—আহা, বড় সুন্দর প্রশ্ন। সনাতন প্রশ্ন। বাবা, আমরা কেউই নিজের মালিক নই। পৃথিবী হচ্ছে একটা বড় ফুলের বাগানের মত। পরের বাগান। বাগানের মালিক মাঝে মাঝে ফুল তোলবার জন্য মালী পাঠিয়ে দেন। মৃত্যু হচ্ছে সেই মালী, আর আমরা হচ্ছি ফুল। মালী এসে তুলে নিয়ে যেতে পারে এই ভয়ে কি ফুল বিকশিত হবে না ? তার কাজ সে করবে, মালিকের কাজ মালিক করবেন।

ভাঙা গলায় ভেসে এল—আহা ! আহা !

গণেশ চুপসে গেল। ভণ্ড কোথাকার। এক্ষুণি ভূমিকম্প আরম্ভ হলে তুমি ভগবান মালী পাঠিয়ে দিয়েছেন ভেবে ভজন গাও কিনা দেখতে ইচ্ছে করছে। প্রেমাশ্রু শুকিয়ে যাবে তোমার।

কিন্তু সেদিন রাত্তিরে গণেশের উত্তর এসে গেল। আপনাআপনি।

জনতা স্টোভে রান্না ভাতে-ভাত খেয়ে বই পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছিল গণেশ। তখন কত রাত্তির কে জানে, কেমন একটা অস্বস্তিতে ঘুম ভেঙে গেল। এমনিতেই অমলা আর খোকা না থাকলে বিছানাটা যেন বিরাট ফাঁকা ঠেকে, ঘুম আসতে চায়না। কিন্তু আজ ঠিক সেরকম নয়। অন্যরকম।

জেগে প্রথমেই গণেশের মনে হল—এত অন্ধকার কেন? বাঁদিকের দেওয়ালে যে সবুজ মৃদু আলোটা জ্বলে রাত্তিরে, সেটাই বা জ্বলছে না কেন?

ঘোর অন্ধকার। বাইরে থেকে কোন আলো আসছে না। সে কি তাহলে জানালা বন্ধ করে শুয়েছিল? নাঃ, গরমকালে জানালা বন্ধ করে শোবে কেন? তাহলে এত অন্ধকার কিসের?

চোখের চার ইঞ্চি দূরে হাত এনেও নিজের আঙুল দেখতে পেল না গণেশ। নিশ্ছিদ্র জমাট অন্ধকার। লোড শেডিং হয়েছে বোধহয়। নইলে বাইরে থেকেও তো কিছু আলো আসতো।

শোবার আগে সিগারেট খেয়ে ড্রেসিং টেবিলের ওপরে দেশালাই রেখেছিল। ড্রয়ারে একটা মোমবাতিও বোধহয় আছে। আলোর কথা মনে হতেই হাঁপিয়ে উঠল গণেশ। অন্ধকারে সে আদৌ থাকতে পারেনা, ছোটবেলা থেকেই। বুক চেপে ধরে। এক্ষুণি নেমে মোম জ্বালাতে হবে। একটু আলো চাই।

মশারি তুলে মেঝেয় নামলো গণেশ। কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না। কোনাকুনি পাঁচ-ছ'পা গেলে ড্রেসিং টেবিল পাওয়া যাবে। অন্ধকারে সামনে হাত বাড়িয়ে আস্তে আস্তে এগুলো গণেশ। এক-দুই-চার-ছয়-আট, আরে! আট পা হবে কি করে! পাঁচ পা হাঁটলেই তো টেবিলটা হাতে ঠেকার কথা। কোথায় যেন শুনেছিল, অন্ধকারে সরল রেখায় হাঁটা যায়না। তাই হয়েছে নিশ্চয়। বেঁকে অন্যদিকে কিছুটা সরে এসেছে। হিসেব করে ডানদিকে এগুলো গণেশ। এক-দুই-পাঁচ-আট, মরেছে! এ কি কাণ্ড! আচ্ছা, আরো দু'পা দেখা যাক। কিচ্ছু না। আরো দু'পা—নাঃ, তবুও সামনে কেবলই শূন্য। আর কয়েক পা—তবুও শূন্য।

আস্তে আস্তে অদ্ভুত, অপ্রাকৃতিক একটা ভয় মনের মধ্যে দানা বেঁধে উঠল গণেশের। ধাক্কা লাগবার ভয় ত্যাগ করে সে পাগলের মত দৌড়ে গেল একদিকে। অনেক, অনেকখানি। ধাক্কা লাগলো না কোথাও। বাঁদিকে, ডানদিকে, পেছনে যতদূরেই সে গেল, কোথাও কিছু নেই। নিঃসীম অন্ধকারে এক দুর্বোধ্য সীমাহীনতার মধ্যে কে তাকে ছুঁড়ে ফেলেছে। সে এই অন্ধকারকে চেনে না বুঝতে পারছে না। তার ঘর কোথায় গেল? ঘরের দেওয়ালগুলো? তার, অমলার আর খোকার পরিচিত প্রিয় সংসার? কোথায় গেল সেই ঘরটা? সেখানে আলনায় খোকার জামা আছে, অমলার শাড়ি আছে। ড্রেসিং টেবিলের চিরুনিতে অমলার চুলের গন্ধ। এর যে কোনো একটা কিছু হাতে ধরতে

পেলে সে চেনা পৃথিবীটার সঙ্গে একটা যোগসূত্র পাবে। ওঃ কি অন্ধকার। শুধু পায়ের নীচে মেঝেটা আছে। চারদিকের অন্ধকারে অসীম অবধি বিস্তৃত একটা দাঁড়াবার জায়গা কেবল।

একটা গল্প মনে পড়ে গেল গণেশের। অন্ধকার কারাগারে বন্ধ কে এক কয়েদী পাগল হয়ে যাওয়া থেকে বাঁচবার জন্য মেঝেতে একটা ছুঁচ ফেলে দিয়ে সেটাকে খুঁজে খুঁজে বের করত। পেলে ফেলে দিয়ে আবার খুঁজত। তার এমন কিছু নেই? অন্তত সকাল হওয়ার আগে সে যেন পাগল না হয়ে যায়। তারপর এক সময় তো সকাল হবেই! আলো হবেই। তখন সে সবকিছু পরিষ্কার দেখতে পারে। ততক্ষণ—

তার পৈতেতে বাঁধা চাবিটা খুলে নিয়ে অন্ধকারে একদিকে ছুঁড়ে ফেলল গণেশ। তারপর উবু হয়ে বসে যেদিকে ঠুং করে শব্দ হয়েছিল সেদিকে হাতড়াতে লাগল। একটু পরে জমে উঠল খেলাটা। অন্ধকারের কথা ভুলে গেল সে। থাকগে অন্ধকার, আপা তত' চাবিটা খোঁজা বেশি মজার। তারপরে তো কখনো না কখনো ভোর হবেই।

অন্ধকারে উবু হয়ে বসে ঘর মোছার ভঙ্গিতে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে চাবি খুঁজছে গণেশ। কেমন ভুলে থাকা যায় খেলাটা নিয়ে। বেশ খেলাটা। ভালো খেলাটা।

সুখের স্বাদ

দেবব্রত মল্লিক

—এই, আমাকে তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে যেতে হবে ?

সৌম্যব্রত ভারি কাঁচের চশমার ভেতর দিয়ে তাকায় অনসূয়ার দিকে। তারপর খুব ধীরে ধীরে বলে, কবে আর তোমায় তাড়াতাড়ি চলে যেতে না হয় ?

—এই না, না ইয়ার্কি নয়। বাবাকে কথা দিয়ে এসেছি, সময় মত না ফিরলে খুব রাগ করবেন।

সৌম্য অনসূয়ার কথার জের টেনে বলে, কথা যখন দিয়ে এসেছ তখন সময় মত ফিরে যাওয়া একান্তই উচিত।

—কি হল, অমনি রেগে গেলে ? আসলে কি জানো, আমি চাইনা বাবা আমার জন্য দুঃখ পাক। সামান্য ওর কথাটুকু রাখতে পারলেই যখন খুশি······

—কিন্তু, ঐটাই তোমার সব।

অনসূয়া সৌম্যর আরো কাছে এগিয়ে আসে, তুমি একটুতেই ভীষণ অধৈর্য হয়ে পরো। বুঝতে চাওনা।

পুরোপুরি সন্ধ্যা হয়নি এখনো। রেডরোড ছাড়িয়ে সবুজ ঘাসের ওপর ওরা দুজন পাশাপাশি বসে আছে। এখান থেকে দূরে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল দেখা যায়। খিদিরপুর আর বেহালার ট্রামগুলো সবুজ ঘাস ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলে যাচ্ছে। এখানে শহরের ব্যস্ততা ঠিক অনুভব করা যায় না।

সৌম্য কোন কথা বলে না। চুপ করে বসে থাকে। কিছুক্ষণ দুজনেই চুপচাপ। তারপর অনসূয়া কথা বলে, কি হল, কিছু বলছ না যে ?

—কি বলব ?

—কিছুই বলার নেই ! সব কথা শেষ। —অনসূয়ার গলায় অনুযোগ মেশানো, বাববা ! তুমি পারও বাপু, একটু পান থেকে চুন খসার উপায় নেই। ঠিক আছে, তাড়াতাড়ি যাব না। তুমি যতক্ষণ বলবে তোমার সঙ্গে বসে থাকবো।

সৌম্যর গলা খানিকটা নরম হয়, আসলে তুমি ঠিক বুঝতে চাইছ না আমি কি বলতে চাই।

— কি বলতে চাও ?

—আচ্ছা আমাদের কি এখনো কিশোর-কিশোরীর মত লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়াতে হবে ? সব সময় ভয়ে সন্ত্রস্থ হয়ে থাকতে হবে—এই বুঝি কেউ দেখে ফেলল কিংবা······

আরো হয়তো অনেক কিছু বলতে চাইছিল সৌম্য। কিছুটা উত্তেজিত ও। অনসূয়া বুঝতে পারে, তাই খুব আস্তে আস্তে বলে বোঝায় সৌম্যকে।

—তা কেন ?

সৌম্য বলে চলে, আমার এসব একদম ভাল লাগে না। বয়স হয়েছে। চাকরি করি। তুমিও একবারে কাঁচ খুকি নও। মাস্টার ডিগ্রী নিতে চলেছ। এখনো কি আমরা আমাদের বুঝ বুঝতে পারি না ?

—নিশ্চয়ই পারি। অনুসূয়ার গলার স্বর দৃপ্ত। তুমি কিন্তু বুঝতে একটু ভুল করছ। আমার সে জাতীয় কোন ভয় বা ভীতি নেই।

—তা হলে ?

—তা হলে কি জান ? —হাসে অনুসূয়া। আমার বাবার জন্য ভীষণ কষ্ট হয়। জীবনে ভদ্রলোক কোনদিন সুখ কাকে বলে দেখতে পেলেন না। আমি বাবার শেষ সন্তান। আমার যখন দু বছর বয়স আমি মাকে হারাই। সেদিন থেকেই বাবা একা। পরে অবশ্য বলতেন, অনু, তোকে পেয়ে আমি তোর মা'র কথা ভুলে থাকি। এই কথা বলার পরই দেখতাম বাবার চোখদুটো প্রশান্তিতে ভরে যেত। বাবা আমাকে কাছে ডাকতেন। আমি তার আগেই বাবার বুকে মাথা রেখে বলতাম, তোমার অত ভাবনা কেন, আমি'ত আছি ? বাবা হাসতেন, আমি জানি। কিন্তু পাগলি, তোকে ধরে রাখবো সে শক্তি কি আমার আছে ? —তখন বাবার কথায় প্রতিবাদ করে বলতাম, কেন বাবা ? কোথায় যেতে হবে আমায় ? —এইটুকু বলার পর অনুসূয়া চুপ করে রইল। মুখে ওর কোন কথা নেই। সৌম্যর মুখের দিকে তাকিয়ে হাসছে।

—কি হল ? সৌম্যর প্রশ্ন।

—সেদিন কি আর জানতাম এরকম এক বীরপুরুষের মুখোমুখি হতে হবে আমায় ! আর তার প্রতাপ আমাকে কক্ষচ্যুত করে নিয়ে আসবে অন্য কোথাও অন্য কোনখানে।

সৌম্য বুঝতে পারে। অনুসূয়ার বাবার জন্য ওরও দুঃখ হয়। ও জিজ্ঞেস করে, তোমার দাদা বিয়ের পর থেকে সেই ধানবাদেই আছে ?

—হুঁ।

—এখানে আসে না ?

—আসে কখনো কখনো। অনুসূয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে।

—তাহলে, এখানে শুধু তুমি আর তোমার বাবা ?

অনুসূয়া কথা বলেনা। মাথা নেড়ে সম্মতি জানায়। তারপর প্রসঙ্গ পাল্টানোর জন্য প্রশ্ন করে, আজ বাড়ি থেকে কখন বেরিয়েছ ?

—রোজ যে সময় বেরোই। সকাল নটায়। —সৌম্য হাসে, অবশ্য একটু পরে বেরুলেও চলে ; কিন্তু এর পরেই গাড়ি ঘোড়ার যা অবস্থা দাঁড়ায়।

—তবুও তোমার সুবিধা আছে। তুমি স্ট্যাণ্ড থেকে উঠতে পারো। আমার কথা ভাবো। যেদিন আমার সকালে ক্লাস থাকে সেদিন রীতিমত কান্না পায়।

কি কষ্ট করে যে বাসে উঠি। মাঝামাঝি কোন জায়গা থেকে বাসে ওঠা একটা ভয়ংকর অবস্থা দাঁড়ায়। বিশেষ করে মেয়েদের'ত কথাই নেই। লম্বা বারো-হাত শাড়ি নিয়ে বাঙালী মেয়েদের সামলানোই দায়।
অনুসূয়ার কথা শুনে হাসতে থাকে সৌম্য। তারপর বলে, তার মানে তুমি বলতে চাও মেয়েরা শাড়ি না পরে অন্যকিছু পরলে ভাল হত?
সৌম্যর বাকি কথার সঙ্গে যোগ দিয়ে অনুসূয়া জানায়, বিশেষ করে যাদের ট্রামে বাসে চড়ে সবসময় চলা ফেরা করতে হয়।
—আর কয়েকটা দিন অপেক্ষা কর। তা হলেই সব সমস্যার সমাধান।
—কি করে? —যেন আকাশ থেকে পড়ল অনুসূয়া।
—আর শুধু কয়েকটা দিন।
—কি ভাবে হবে?
বিজ্ঞের মত উত্তর দেয় সৌম্য, পাতাল রেল চালু হয়ে যাবে।
এরপর দুজনেই হো হো করে হাসতে থাকে।
কথা বলতে বলতে সন্ধ্যা প্রায় গড়িয়ে গেল। সৌম্য অনুসূয়ার হাত ঘুরিয়ে ঘড়িটা দেখে। তারপর বলে, এই সাড়ে ছ'টা বেজে গেছে। ওঠো, যাবে না?
যেন অনুসূয়ার থেকে সৌম্যর তাড়া বেশি। বা হাতে শাড়িটা ঠিক করে উঠে দাঁড়িয়ে অনুসূয়া বলে, হ্যাঁ, চল।
রাস্তার লাইটপোস্টগুলো একসঙ্গে জ্বলে উঠল। ওরা দুজনে মনুমেন্টের দিকে মুখ করে হাঁটছে। ধর্মতলার বড় বড় বাড়িগুলোতে লাল, নীল, হলুদ বিভিন্ন রঙের আলো জ্বলছে আর নিভছে। এই রাতকে ঠিক রাতের মত মনে হয় না। চারদিকে এত আলো, শুধু আলোর ঝলমলানি। অনুসূয়ার ধর্মতলাকে দিনের চেয়ে রাতে দেখতে ভাল লাগে। সেজে গুজে যেন এক সুন্দরী রূপসী। এ কথাগুলো একদিন সৌম্যকে বলেছিল অনুসূয়া।
—তোমার এই ঝলমলানো আলো, হৈ চৈ—পছন্দ?
—না, ঠিক তা নয়। —ছোট্ট মেয়ের মত বেণী দুলিয়ে উত্তর দেয় অনুসূয়া। আসলে কি জানো, ধর্মতলার ঝলমলানো একটু অন্যধরনের। শান্ত, ছিমছাম সাজা। প্রাণপ্রাচুর্য আছে কিন্তু তেমন উগ্রতা নেই।
—বাব্বা! কি বর্ণনা! —সৌম্য রসিকতা করে বলে, আমরা মফঃস্বলের ছেলে। ওসব বুঝিও না দেখার চোখও নেই তেমন আমাদের।
সৌম্য আরো কিছু বলার আগে অনুসূয়া চেঁচিয়ে ওঠে, আহা হা তুমি একেবারে কচি খোকা। কিচ্ছু বোঝ না।
—কি করে বুঝবো বল। ছোট বেলায় কেটেছে জিয়াগঞ্জে। একটা ছোট্ট শহরে।
—সেই মুর্শিদাবাদ জেলায়?

—হ্যাঁ। ভারি সুন্দর জায়গা। তুমি জিয়াগঞ্জে গেছ কখনো?
—না। অনুসূয়া মাথা নাড়ল।
সৌম্যব্রত একা একা মনে হেসে ওঠে। তারপর বলে, ছোটবেলার সেইসব দিনের কথা মনে হলে অদ্ভুত লাগে। আমাদের বাসা ছিল একটু ভেতর দিকে। অর্থাৎ শহরের দোকানপাট সেই অর্থে ছিল না সেখানে। আমাদের বাড়ির পাশে ছিল প্রকাণ্ড এক আম বাগান। মনে আছে, আমি সময়ে অসময়ে ছুটে চলে যেতাম সেই আমবাগানে। কত বিচিত্র ধরনের পাখি উড়ে উড়ে আসতো সেখানে, তোমায় কি বলবো। কি বিচিত্র তাদের রঙ আর গলায় আওয়াজ। এখনো ভাবলেই কিরকম স্বপ্নের মত মনে হয়। —তন্ময় হয়ে এক সঙ্গে কথাগুলো বলে চলে সৌম্য।
বর্ণনা শুনতে শুনতে শ্রোতার মুখ দিয়েও বেরিয়ে আসে, সত্যি, অদ্ভুত! সৌম্য বড় করে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে। দুজনেই কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপর অনুসূয়া কথা বলে।
—তোমরা হঠাৎ জিয়াগঞ্জে এসে উঠলে কেন?
—আসলে আমার বড় মামা জিয়াগঞ্জে বাটার দোকানে চাকরি করতেন তখন। বাংলাদেশ থেকে চলে এসে কোথায় আর উঠবো। বড়মামা একা একা থাকতেন। আমাদের খবর পাঠালেন। আমরা এসে আস্তানা গাড়লাম বড়মামার ওখানে। আমরা তখন একবারেই সহায়-সম্বলহীন। বাবা অসুস্থ। বড় হওয়ার পর মা আমাদের গল্প করে বলতেন। কি ভাবে যে তখন দিন কাটাতাম তা একমাত্র ঈশ্বরই জানেন। একে একে মা'র শেষ সোনাটুকুও নষ্ট হতে যায়। তারপর অবশ্য কোনরকমে মা একটা চাকরিতে ঢুকতে পেরেছিলেন।
—উনি চাকির পেলেন? —অনুসূয়া রীতিমত অবাক!
—বাংলাদেশের লোক—এটাই চাকরি পাওয়ার প্রধান কারণ। —একটু হাসলো সৌম্য, তাই রক্ষ্যে। তা না হলে তোমার এই পুরুষ কি আর পুরুষ থাকতো? —নিজের দিকে বুড়ো আঙুল তুলে দেখায় সৌম্য।
—তোমার ছোটবেলা তাহলে খুব কষ্টে কেটেছে?
সৌম্য খুব শান্তভাবে উত্তর দেয়, খুব কষ্টে অথবা সুখে কেটেছে বলব না। তবে একটু বলতে পারি—এ সবকিছুরই হয়তো প্রয়োজন ছিল। তা না হলে আজ হয়তো পৃথিবীকে দেখার জন্য অন্য এক অনুভূতি তৈরি হ'ত।
সৌম্যর কথা বলায় এক অদ্ভুত ভঙ্গি। দৃপ্ত। ভরা গলায় যখন কথা বলতে থাকে তখন ওকে ভারি সুন্দর শোনায়। ঠিক সেই সময় অনুসূয়ার বুকের ভেতরটা অসম্ভব গর্বে ফুলে উঠে। ঠিক কি যে মনে হয় ও বোঝাতে পারবেনা কিন্তু অনুভব করতে পারে।

সৌম্যকে একদিন অনসূয়া প্রশ্ন করেছিল, তুমি এত সুন্দর করে গুছিয়ে কি করে কথা বল ?

—কেন তোমার হিংসে হয় ?

—ভীষণ !

সৌম্য বাড়ি ফিরে এসেছে অনেকক্ষণ। খুব ক্লান্ত লাগছে। আর দেড় দিন অফিস গেলে একটা ছুটি। রবিবার। পর পর টানা ছ'দিন বেরুতে একদম ইচ্ছে হয় না। সপ্তাহের মাঝখানে যদি একটা ছুটি থাকতো তাহলে বেশ হত।

এবার পুজো যেতে না যেতেই বেশ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা পড়ে গেছে। ভোরের দিকে একটা পাতলা চাদর গায়ে জড়াতে হয়। মা বলেন মাথার দিকের জানলাটা বন্ধ করে রাখিস। এখনকার হিম ভাল না। একটুতেই ঠাণ্ডা লেগে যেতে পারে। সৌম্য রোজই ভাবে একটু রাত হলে বন্ধ করে দেবে। কিছুতেই মনে থাকে না। ভুল হয়ে যায়। কখন একসময় ঘুমিয়ে পড়ে। অবশ্য তার চেয়েও অন্য একটা সত্যি আছে। সৌম্যর একদম জানলা বন্ধ করে, চারিদিক অন্ধকার করে শুতে ভাল লাগে না। কিরকম যেন দম বন্ধ হয়ে আসছে দম বন্ধ হয়ে আসছে মনে হয়।

আজ কিন্তু শোওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুম আসছে না সৌম্যর। হঠাৎ—একি হল। অথচ যেদিন শুয়ে কোন কিছু ভাবতে চায় সেদিন শোওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুম। যদিও সৌম্যর সেটাই স্বাভাবিক।

অনসূয়ার এর জন্যও সৌম্যকে হিংসে হয়। ও বলে, তুমি কি করে শোওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড় ?

যাদু জানি যে ? —মজা করে সৌম্য।

—আমাকে শিখিয়ে দেবে তোমার সেই মন্ত্রটা ?

—বৎসে, শনৈ শনৈ।

কথাগুলো মনে পড়ায় হাসি পেল সৌম্যর। জানালা দিয়ে বাইরে তাকালো অল্প অল্প চাঁদের আলোয় পৃথিবীটাকে এখন ঘসা কাঁচের মত মনে হচ্ছে। পাশের ছোট্ট বাগানে কয়েকটা ঝিঁ ঝিঁ পোকা ক্রমান্বয়ে ডেকে চলেছে। মাঝে মাঝে হঠাৎ ভেসে আসছে একটা গন্ধ। খুবই পরিচিত। ছোটবেলায় শুয়ে শুয়ে এরকমই একটা গন্ধ মাঝে মাঝে পেত সৌম্য।

একটা চিত্রকল্প চোখের সামনে ভাসতে থাকে। একটা সুন্দর পুরনো স্মৃতি। ভাবতে বেশ লাগে। এরকমই জানলার পাশে শোওয়ার জায়গা ছিল সৌম্যর। তবে এরকম লম্বালম্বি না শুয়ে আড়াআড়ি শুতে হত। লোহার শিক

বসানো জানলার ভেতর দিয়ে একটা ছয় সাত বছরের ছেলে জিয়াগঞ্জের আকাশ দেখত। ঘন নীল আকাশ। তাতে কখনো সাদার ছড়াছড়ি কিংবা কালো। নিচে বিস্তৃত আম বাগান। আর সেই আমবাগানে বিচিত্র ধরনের পাখিদের জটলা এবং তাদের গান।

বিশ বছরের পুরনো স্মৃতি। কিন্তু মনে হচ্ছে যেন সেদিন। এইসব সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে সৌম্য বেঁচে থাকার এক অদ্ভূত স্বাদ অনুভব করে। ওর হঠাৎ করেই মনে হয় এ পৃথিবীতে ও সব সবচেয়ে সুখী। ছোট্ট পরিবেশের জীবনটুকুতে যা পেয়েছে সে তার তুলনা নেই। অতুলনীয়। অবিস্মরণীয়।

আলমারি

দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়

ক্লাবের সম্বল বলতে ভাঙা দুটো আলমারি আর কিছু বই। পাল্লায় কাচ নেই। আগে ছিল। বইয়ের সংখ্যাও আর আগের মত মতো নেই। কমতে কমতে মাত্র ওই কয়েকটায় দাঁড়িয়েছে। সদস্যরা বই বাড়ি নিয়ে যেতেই ভালোবাসেন, ফেরৎ দিতে নয়।

অথচ আগে এমন ছিল না। দুটো আলমারির সব কটা তাকে তখন বই উপচে পড়ত। কে কোন বই নিয়ে যাচ্ছে খাতায় তার হিসেব থাকত। সদস্যরা খাতায় সই করে বই বাড়ি নিয়ে যেতেন। তারপর একদিন খাতাটাকেই খুঁজে পাওয়া গেল না। তারপর থেকে ক্লাবঘরে বইয়ের সংখ্যাও কমতে লাগল।

এভাবে একে একে গিয়েছে ফুটবল, ক্যারম, ব্যায়ামের মুগুর, বারবেল। মাঝখানে কিছুদিন টেবিল টেনিসের বোর্ড কেনার হুজুগ উঠেছিল। ভাগ্যিস কেনা হয়নি। না হলে হয়ত এতদিন সে বোর্ডও কেউ না কেউ বাড়ি নিয়ে চলে যেতেন!

পাড়ার ক্লাব। সেক্রেটারি, প্রেসিডেণ্ট, কর্মকর্তা, চেয়ার টেবিল কোন কিছুর অভাব নেই। অভাব শুধু উৎসাহের। এখন নিয়মিত ক্লাবঘর খোলাও হয় না।

আবার মাঝেমধ্যে কোত্থেকে ছেলেরা সবাই এসে হাজির হয়। মরচে ধরা তালা খুলে ক্লাবঘর ঝাঁট দেয়, বইপত্রগুলো সাজিয়ে রাখে। চেয়েচিন্তে বই আনার কথা ভাবে। ভাবে চাঁদা তোলার কথা। ফুটবল, ক্যারামের গুটি, কিংবা খান দশেক বই কিনতেও তো টাকা লাগবে। সদস্যরা সবই বোঝেন; কিন্তু চাঁদার কথা উঠলেই ভাবলেশহীন চোখে এ ওর দিকে তাকাতে থাকেন। ক্লাবের ছেলেছোকরার জমজমাট ভিড় এরপর আস্তে আস্তে হালকা হয়ে যায়।

রতনপুর গ্রামে এই কৃষিমঙ্গল ক্লাবের কথা আমাকে বলেছিলে বিনয়। রোগা, চিমড়ে চেহারা। পাজামা ও ঢলঢলে বুশ শার্টে যতটা না রোগা তার চেয়েও বেশি রোগা দেখায়। চোখে পুরু চশমা। বি কম পরীক্ষা দিয়ে এখন রেজাল্ট বেরোলেও অবশ্য ওর করার কিছু থাকবে না। ডাকবিভাগের আয় বাড়িয়ে এখানে ওখানে কিছু চাকরির দরখাস্ত পাঠাতে থাকবে মাত্র।

বিনয় বলেছিল, রতনপুর গ্রামের লোক বই পড়তে ভালোবাসে। কলকাতার দুটো খবরের কাগজও এখানে আসে। তবে সকালের কাগজ এসে পেঁাছায় পরের দিন সন্ধ্যায়। খবর যে বাসি হয়ে গেছে এখানের মানুষ তা বুঝতে পারে না। ট্রানজিস্টার রেডিও আছে কয়েকখানা। কিন্তু খবরের কাগজ পড়ার আনন্দটাই তো আলাদা—বলুন দাদা? বিনয় আমার দিকে তাকিয়ে বলল।

আমি খবরের কাগজের লোক। এসেছি বীরভূম খরা দেখতে। ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ সন্ধ্যেবেলা এসে পড়তে হল এই গ্রামে। নাম জানতাম না। গ্রামে ঢুকে জানলাম—রতনপুর। ছোট্ট একটা মুদির দোকানী বলেছিল। তখন টিম টিম করে জ্বলে উঠেছে লণ্ঠনের আলো। সব ঘরে অবশ্য লণ্ঠন নেই। থাকলেও হয়ত নেই কেরোসিন। জমাট অন্ধকারে ধাক্কা লেগে হুমড়ি খেয়ে পড়ার মতো অবস্থা।

বিনয়ের সঙ্গে আলাপটাও আকস্মিক। রামপুরহাটে ফেরার বাস মিস করে খেয়াল হল, রাতের আস্তানা একটা যোগাড় করে নিতে হবে। রাস্তার ধারে দু একটা যা চায়ের দোকান আছে তারও ঝাঁপ বন্ধ। রতনপুর গ্রাম আমাকে ডেকে নিল। হাটতলার পাশেই জেলেপাড়া। তারই গা ঘেঁষে চালাঘর। শুনলাম ক্লাব।

ছেলে ছোকরাদের পাবো বলে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম। হিসেবে ভুল হয়নি। দেখতে দেখতে একটি যুবক এসে হাজির। আলাপ জমে উঠতে দেরি হয় নি বিনয়ের সঙ্গে। রাতের আস্তানাও পাওয়া গিয়েছিল ওর কল্যাণে।

আমাদের ক্লাব ঘরে থেকে যান। আমাদের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে আপনাকে কষ্ট দিতে চাই না। ছোট্ট দুটো ঘরে আমরা মাথা গুনতি বারো জন মানুষ।

বিনয়কে কিছু বলতে হয় না। নিজে থেকেই ও সব বুঝতে পারে।

আমি আপনার খাবার নিয়ে আসব। হাটতলায় নলকূপ আছে। হাত মুখ ধুয়ে নিন। ক্লাবে চৌকি আছে। আমি সতরঞ্চি আর বালিশ নিয়ে আসব।

দরকার নেই। চাদর এনেছি। হাওয়া বালিশও আছে।

সতরঞ্চির ওপর বরং চাদরটা পেতে নেবেন। দাঁড়ান, ক্লাবঘরটা খুলি, তারপর কথা হবে।

বিনয় মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই চাবি এনে ঘর খুলে ফেলল। সঙ্গে একটা কুপিও এনেছে। দেশলাই জেলে কুপিটা ধরালো। পলতে বিশেষ নেই। ছোট্ট শিখা। কাজ চলে যাবে যা হোক। সঙ্গে টর্চ তো আছেই।

ঘরে সোঁদা গন্ধ। বাতাস গুমোট। দুটো জানলা কিন্তু কপাট নেই। শুধু শিক দেওয়া আছে। জানলা খোলা থাকলেও কেন এই সোঁদা গন্ধ বোঝার চেষ্টা করেও লাভ হবে না। বুঝতে বুঝতে হয়ত রাত কাবার হয়ে যাবে।

খিদের মুখে আলুর ঝোল দিয়ে মোটা চালের ভাত খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। বিনয়কে বলেছিলাম সকালে কথা হবে।

কিন্তু বিনয় এসে হাজির মাঝরাতেই। খিল লাগিয়ে শুয়েছিলাম। ওর ডাকাডাকিতে ঘুম ভাঙল। কিন্তু উঠতে গিয়ে প্রথমেই ধাক্কা লাগল আলমারির সঙ্গে। আলমারি দুটো যে পায়ের দিকে দেয়ালের ধার ঘেঁষে

ছিল ভুলে গিয়েছিলাম। টর্চ খুঁজতেও সময় লাগল। অথচ এতটা সময় লাগার কথা নয়।

বিনয়ের হাতে লণ্ঠন।

আপনার ঘুম ভাঙাতে হল। উপায় ছিল না। চলুন আমাদের বাড়িতে গিয়ে ঘুমোবেন। এখানে এখন অন্য একজনকে জায়গা দিতে হবে।

বিরক্ত হলাম। যাকে সে এখানে এনে তুলতে চাইছে তাকে কি নিজেদের বাড়িতে আশ্রয় দেওয়া যেত না? সে লোকটাও আমার মতো হঠাৎ এসে পড়েছে মাঝরাতে?

চলুন, দেরি করবেন না। আপনার জিনিসপত্র এখানেই থাক। সকালবেলা আমি নিয়ে যাব।

তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসার আগে বাধা পড়ল।

আপনি যখন আছেন একটা কাজ করিয়ে নিই। ধরুন তো এই আলমারি দুটো। এই দুটোকে ধরাধরি করে জানলার কাছে নিয়ে যেতে হবে। আলমারি দুটো পাল্লার কাজ করবে। বাইরে থেকে কেউ আর উঁকি মারতে পারবে না।

মাঝরাতে কারও ভালো লাগে এই রহস্য? কেনই বা আলমারি দুটোকে এখন ঠেলতে ঠেলতে জানলার কাছে নিয়ে যেতে হবে? বিনয় যেন হুকুম করছে। অমান্য করার ক্ষমতা আমার নেই। ঘুমের ঘোরেই ওর সঙ্গে ধরাধরি করে আলমারি দুটো সরিয়ে ফেললাম। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে হ্যাঁচকা টানে আমাকে দরজার বাইরে এনে ফেলল বিনয়। অন্ধকারে চোখে পড়ল কে যেন ছায়ার মতো চকিতে ঘরে ঢুকে গেল। তৎক্ষণে আমরা রাস্তায়।

প্রায় ক্ষিপ্ত হয়ে বললাম, ব্যাপার কী বলো তো? মাঝরাতে এই রসিকতার মানে কী?

ঠোঁটে আটকানো বিড়িতে দু'হাত আড়াল করে আগুন ধরাতে ধরাতে বিনয় বলল, আপনার কষ্ট হল। কিন্তু যে বেচারী পৃথিবীতে নতুন আসছে তাকে না হয় একটু জায়গা ছেড়েই ছিলেন।

আমি আরও রেগে কিছু বলার আগেই ঠোঁট থেকে বিড়ি নামিয়ে বিনয় বলল— দাদা, মেয়েটির কোন আশ্রয় নেই। এঃ মাঝরাতে ও কোথায় যাবে?

বাকি রাতটুকু বিনয়দের দাওয়াতে মশা তাড়াতে তাড়াতে কেটে গেল। আমাকে বসিয়ে রেখে সেই যে বিনয় উধাও হয়ে গেল, ফিরল আমার জিনিসপত্র নিয়ে একেবারে ভোরবেলা।

চলুন দাদা, বাসের সময় হয়ে গেল আপনার।

বাসস্ট্যান্ডের দিকে যাবার পথে আলমারি ঢাকা ক্লাবঘরের জানলার পাশে থমকে দাঁড়াতে হল। নবজাতকের কান্না। বেথেলহেমের আস্তাবলে বুঝি আর একটি শিশুর জন্ম হল।

ভবনদী পার

নবকুমার বসু

এ ঠাকুর আগাড়ি বুঢ্ঢিকো পার কিজিয়ে না বাবা।
আর একবার হেঁকে উঠলো পরসাদ অর্থাৎ প্রসাদ। ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে। ভোররাতে সমুদ্র স্নান সেরে মাকে নিয়ে উঠে এসেছে চরে। ভবনদী পার করাবে বাছুরের ল্যাজ ধরে, বুড়ির স্বর্গ প্রাপ্তি ঘটবে। অপেক্ষা করছে কিন্তু সুযোগ পাচ্ছে না। বাছুরওয়ালা পুরোহিতের সংখ্যা এবার কম।
—আরে এ হারামজাদা তো দেখছি মহা নেইয়াঁকুড়ে!
উদোম গা গেরুয়া হেঁটো ধুতি পরা দখ্নের পুরুতমশাই ঘন ঘন দুটো টান দিয়ে নিলেন ন্যাকড়া জড়ানো মাটির কলকেয়।—শালা মাকে বৈতরণী পার করাবে, পাপ খসাবে, তার জন্যি আবার তাড়া! চুপসে বৈঠা রহো।
কড়া ধমক দিয়ে পাশ ফিরলেন পুরুতমশাই। বিশালবপু ভোঁতামুখ নাকে নাকছাবি মাঝবয়েসী এক মাড়োয়ারী মহিলা। সাগরের নোনা জলে গা ডুবিয়ে সদ্য উঠে এসেছেন। পাতলা সবুজ শাড়ি ভিজে গায়ের ওপরে লেপটে বসেছে। ফুটে উঠেছে ময়দার তালের মতো বেঢপ উঁচু উঁচু শরীরের অংশ।
পরসাদ আর একবার বালির ওপর এলিয়ে পড়ে থাকা তার বুঢ্ঢি মাই-এর দিকে তাকালো। কুয়াশায় ঢাকা সাগরদ্বীপের ঝাপসা অন্ধকারে বোঝা গেল না বুড়ির চোখ খোলা না বন্ধ। বাতাস উঠেছে ভোরের সমুদ্র থেকে। আকাশে এখনও চাঁদের ফালি। হাতের বালি ঝেড়ে ছোট ছোট কাঁচাপাকা চুলে হাত বোলালো পরসাদ। নিজের মনেই বললো—এ বুঢ্ঢি তো আপসে আপ ভবনদী কি পার চলে যায়েগী!
—কা ভাইল, কেয়া বেলোওতানি রে পরসাদ?—বুড়ির আঁকিবুঁকি কাটা সহস্র মুখের রেখা ক্ষীণ কণ্ঠস্বরে নড়েচড়ে কেঁপে উঠলো।
—কুছ নেই, তু নিদ যা।
ধোঁয়ায় জ্বালা করা লাল চোখ রগড়ালো পরসাদ। লক্ষ লক্ষ থিকথিকে পুণ্যার্থীর মাথা ছাড়িয়ে তাকাবার চেষ্টা করলো অসীম সমুদ্রের দিকে। আকাশ আর সাগরের জল মিশে গেছে বহুদূরে। ভোর হয়ে আসছে। কালো জল আর খড়ি ওঠা আকাশের মাঝামাঝি একটি রেখা স্পষ্ট হয়ে উঠছে। কাঁচা কাঠ হোগলা খড়ের ছড়ানো ছিটানো রাতের আগুন প্রায় নিভে এসেছে। তারই ধোঁয়ায় ছেয়েছে সারা দ্বীপ। পাতলা অন্ধকারে ক্রমশঃ ফুটে উঠছে উলঙ্গ অর্ধ উলঙ্গ কিম্ভূত হাজার মানুষ আকৃতি। পাঁচমিশেলি ভাষা আর কণ্ঠস্বরের সোরগোল, গরুর ব্যা-ব্যা। জোয়ার আসা সাগরজলের ঢেউ ভাঙছে ঝপাৎ ঝপাৎ। মুহূর্তে ভিজিয়ে দিয়ে যাচ্ছে বালুচর। ব্রাহ্মমুহূর্ত সবে পেরিয়েছে।

পৌষের শেষ দিন। মকর সংক্রান্তির পুণ্যস্নান চলেছে সাগরসঙ্গমে পুরোদমে।

বাছুর থেকে আর একটু বড়, একটি হাফ গোরু। তাকে সাজানো হয়েছে। গলায় গাঁদা ফুলের মালা। শিং না গজানো কপালের মাঝামাঝি লোমের ওপর চওড়া সিঁদুরের রেখা (বিবাহিতা), দুই কানের লতির ওপর হলুদ রং। ছোট ছোট চার পায়ের চেরা ক্ষুরে আলতা। তার ল্যাজে চুলের গোছার সঙ্গে আরও কিছু রঙীন সুতো বাঁধা। খয়েরি রঙ গাটি বেশ চকচকে। পুণ্যার্থীদের ভবনদী পার করে একদিন সে স্বর্গে নিয়ে যাবে—তাই মেলায় এসেছে। লোকজনের ভিড়ে ঠেলা খেতে খেতে মাঝে মাঝে সে ব্যা-ব্যা করে ডাকছে। কিন্তু তার নিরীহ সরল ডাগর চোখে কোনো বিরক্তি নেই। শুধু যেন একটি বিস্মিত জিজ্ঞাসা—হাজার হাজার মানুষের এই মেলায় কেবল ধু ধু বালি, একবিন্দু ঘাস নেই কেন! সারারাত ঘুরে আমার খিদে পাচ্ছে, খাবো কি? সুযোগ পেলেই সে এদিক ওদিক ছড়ানো দু এক আঁটি বিচুলি মুখে টেনে নেওয়ার চেষ্টা করছে। বেশি পারছে না। ল্যাজে টান পড়ছে। বৈতরণী পার হওয়ার জন্য কেউ হয়তো তার শীর্ণ ল্যাজটি ধরে বসে আছে। পেটটা দু পাশ থেকে ঢুকে গেছে।

পুরুতমশাই বাছুরের ল্যাজে হাতে বুলিয়ে ভিজে গা বিশালদেহিনী মাড়োয়ারী মহিলার হাতে ধরিয়ে দিলেন। লিজিয়ে মাইজী। বাছুরটিকে একটু ঘুরিয়ে দিয়ে বললেন—আভি পূর্ব দিকমে মুখ করকে বৈঠিয়ে।

শিড়িঙ্গে পুরুতমশাই নিজেই ভদ্রমহিলাকে ধরে খানিকটা ঘুরিয়ে দিলেন। তারপর নির্দ্বিধায় ভদ্রমহিলার খানিকটা বেরিয়ে থাকা শরীরের অংশ নিজে হাতে ভেজা কাপড় দিয়ে পুরোপুরি ঢেকে দিলেন। পুরো ব্যাপারটাই যেন পুজোর কোনো ছোট্ট একটি ব্যবস্থা; পুরুতমশাই নিজের হাতে সেরে নিলেন। অস্বস্তি আর সংকোচ থাকলেও ভদ্রমহিলা কিছু বলতে পারলেন না। হাতে ধরা রয়েছে বাছুরের ল্যাজ।

পুরুতমশাই বললেন—ঠিক হ্যায়, আভি মন্ত্র বলিয়ে—। স্তনের কালচে শক্ত এবং স্পষ্ট বোঁটাটির দিকে তাকিয়ে হাসলেন। রাত জাগা কলকে টানা লাল চোখ, কাঁচাপাকা দাড়িওলা চোয়াড়ে গাল আর ছোপধরা নোংরা দাঁত দেখা গেল।

পরসাদ কটিহর সে আয়া। সঙ্গে তার 'হোগা চৌরাশি' 'ছিয়াশি' মাকে নিয়ে এসেছে। বুড়ি খুব পাপী। গঙ্গাসাগরে স্নান না করলে তার পাপ কাটবে না। গাইকে পুচ্ছি ধরে বৈতরণী পার না হলে স্বর্গেও যাবে না কোনোদিন। বহুত রোজ পহ্‌লে বুঢ্‌ঢি টাউনে কামিনের কাজ করতো এক কন্ট্রাক্টরের কাছে। এক সন্ধ্যায় কন্ট্রাক্টর উনকি ইজ্জত চোরা লিয়া, আপনা তাগত সে। পরসাদও তখন মাটি কাটার কাজ করতো, ছোটো লেড়কা। তখনও সে ফিনুকি বাঁশীর

(সাইরেন!) এবং বোমার আওয়াজ শোনে নি। কণ্ট্রাক্টরের ধুতির ওপর দিয়ে পাছায় কামড়ে দিয়েছিল। উন্‌কা খুন দর্শন কিয়া। ছুটতে ছুটতে গ্রামে পালিয়ে এসেছিল। মাকে বলেছিল—রো মত্‌। তুহরকে সগর লে যাইবু। তারপর অনেক দিন কেটে গেল। মওকা নহি মিলি। পরসাদ এখন রেল-এর কুলি। ছুটিও পায়। আউর বহত আদমীকে সাথ কাটিহার থেকে আওয়াজ তুলে এসেছে গঙ্গা মাই কি জয়। সগর রাজা কি জয়।

অন্যান্য লোকজন সব কোথায় হারিয়ে গেছে। সঙ্গে থাকা পুঁটলিটা কাছে টেনে নিল পরসাদ। একটা নেড়ি কুকুর ভিড়ের মধ্যে থেকে নুলো দিয়ে সেটা হাঁতড়াবার চেষ্টা করছিলো। চাপা ক্ষিদেটা সেদ্ধ ছোলার গন্ধে আর একবার চাগাড় দিয়ে উঠলো পরসাদের পেটের মধ্যে। কিন্তু মা'র ভবনদী পার না হলে খেতে পারছে না। পুরুত-মশাইকে আর একবার তাগাদা দিতে গিয়েও সে চেপে গেল। অবাক চোখে দেখলো, সেই মহিলার কোমরের কাছে হাত ঢুকিয়ে দিয়েছেন পুরুতমশাই। মন্ত্রও বলে চলেছেন সেই সঙ্গে। বাছুরটা বোধ হয় সত্যি ক্ষেপেছে এতোক্ষণে। তার ল্যাজটা মোটা তারের মতন টান হয়ে রয়েছে। পিছন থেকে ওটা উপড়ে ছিড়ে গেলেও সে যেন এখন পালাতে চায়। বালির মধ্যে তার আলতা রাঙানো ক্ষুর ডুবে গেছে।

পুব আকাশ আর একটু ফিকে হয়েছে। মনে হচ্ছে খড়ির সঙ্গে মিশেছে গেরিমাটি। ভিড় উপচে পড়ছে। তার মধ্যেই যেখানে গোরুর ব্যা-ব্যা আর গোদান গোদান চিৎকার সেখানে চলছে ধস্তাধস্তি বাচ্চার কান্না। কাঁচা বিষ্ঠার গন্ধ। ধোঁয়া কুয়াশা আর ভিড় জটলার মধ্যে থেকে বিক্ষিপ্ত আওয়াজ উঠছে থেকে থেকে, গঙ্গা মাই কি—তথ্যকেন্দ্রের মাইকের চিৎকার বেড়েছে—শিউচরণ, আপ বড়া বাজার সে আয়ে হ্যায়, আপকা ইন্দ্র রমলা দেবী…। ঘোষণা চলেছে বাংলাতেও—মায়া দেবী, আপনি সোনাগাছি থেকে এসেছেন। আপনার জন্য সীতা দেবী—। জোয়ারের জল বাড়ছে। হুড়োহুড়ি বাড়ছে। গাঁদাফুলের

মালা ভেসে আসছে ঢেউ-এ।

পরসাদের ঠিক গায়ের কাছেই ঠেলাঠেলিতে কার ঝোলা থেকে গোটা চারেক গুড় মাখানো গোলারুটি ঝপাস করে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গেই এক ভিখারি সেগুলো তুলে নিয়ে তার ওপর থেকে ধুলোবালি ঝাড়তে লাগলো। আশ্চর্য সাগরদ্বীপে একটাও কাক নেই! পুরুত-মশাই মন্ত্র বলতে বলতেই কাকে গালাগালি করে উঠলেন—এ হারামি, দেখতা কেয়া? ভাগ না হিঁয়াসে। বুড়বক কাঁহিকা। পরসাদ এই সুযোগটা ব্যবহার করলো। বললো—এ ঠাকুর, আভি লাগা দিজিয়ে না বুচুটিকো। উনীক হালত তো দেখিয়ে!

বুড়ির কি হাল ঠিক বোঝা গেল না। কিন্তু পুরুতমশাই তাঁর কলকে থেকে মুখ সরিয়ে আড়চোখে একবার দেখলেন। লাল চোখ আর ঝোলা ঠোঁটে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে রইলেন বুড়ির দিকে। চরের ওপর ঠেলাঠেলি ধস্তাধস্তি আর

চিৎকার বেড়েছে। ঠাসা ভিড়ের মধ্যে মুহূর্তে নিজের লোক হারিয়ে যাচ্ছে। জনা পনেরোর একটি দেহাতী দল স্নান সেরে উঠে আসছিল। তারা কচুবেড়িয়ার বাস ধরার জন্য এখনই লাইন দেবে। তবে যদি দুপুর নাগাদ উঠতে পারে। পাছে ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে যায়, সেই ভয়ে তাদের দলের প্রথম এবং শেষ লোকের হাতে ধরা ছিল একটি গোরুর দড়ি। বাকীরা সবাই একহাতে সেই দড়ি আঁকড়ে কোনোমতে সারি দিয়ে চলেছিল। কোথা থেকে এইসময় গলায় শিকল বাঁধা একটি কালামুখ হনুমান লাফিয়ে পড়লো। মুহূর্তের মধ্যে লুটোপাটি লেগে জট পাকিয়ে গেল। ঠেলাঠেলি ভয়ংকর বেড়ে গেল। আর টানাটানির মধ্যে চাপে দেহাতী দলের সেই দাঁড়টি গেল ছিঁড়ে। হুড়মুড় করে বেশ কিছু পুরুষ এবং মহিলা টাল সামলাতে না পেরে চিৎপটাং হয়ে পড়লো এর ওর ঘাড়ের পিঠে।

পরসাদ তার বুঢ্ঢি মাইকে বাঁচাবার জন্য তাড়তাড়ি ঝুঁকে পড়লো। মার শরীরের দুপাশে তার হাত আর পা খাটিয়ার মতো রেখে উঁচু হয়ে রইলো। দু একজন তার ঘাড়ে পিঠে পড়লো। আর এই চাপের মধ্যেই একটি শিশু ছনছন করে হিসি করে ফেললো পরসাদের পিঠের ওপর। কিছু করার নেই। তার বুড়ি মা চুপচাপ পড়েছিলো বালির ওপর যেমন ছিল। পুরুতমশাই ইতিমধ্যে সেই বিশালদেহিনী মহিলাকে বাঁচাবার জন্য জাপটে চেপে ধরেছেন। আর সেই ফাঁকে ল্যাজ এবং দাঁড়তে ঢিলে পড়ায় বাছুরটি উধাও। হৈ হল্লা গোমলালের মধ্যে শোনা যাচ্ছিল সেই মাড়োয়ারী মহিলার গলা—আরে কেয়া কর রহে হো, কেয়া কর রহো হো!

ধস্তাধস্তি একটু কমলেই পুরুতমশাই এদিক ওদিক তাকালেন। বাছুরটিকে ত্রিসীমানার মধ্যে দেখতে পেলেন না। কিন্তু পরসাদের বুঢ্ঢি মাই-এর দিকে তাকাতেই তার খোলা চোখদুটি স্থির হল। ওপর থেকে নিচে চোখ বোলালেন।

বুড়ির ফোকলা মুখ সামান্য ফাঁক। শুকনো ঠোঁটের ওপর কয়েকটা মাছি। ঢিলে দু'খানা গাল চুপসে ভিতরে ঢুকে গেছে। ফ্যাকাশে দুইচোখ আধবোজা। পিচুটি কেটেছে। দুপাশে কখন গড়িয়ে পড়েছে জলের রেখা। কণ্ঠার হাড় উঁচু। সমতল বুকের ওপর এক চিলতে কাপড়ের ফালি। পেট উন্মুক্ত স্থির, কোঁচকানো চামড়া একদিকে হেলে পড়েছে। কাপড়ের নিচে বেরিয়ে থাকা দুটি পা গোড়ালি পর্যন্ত ফোলা এবং গোল। বোঝা যায় টিপলে বসে যাবে। আঙুলের ফাঁকে হাজা। রস কাটছে। তার ওপর লেগে রয়েছে বালি। সমুদ্রে স্নান করার পর জল শুকিয়েছে পায়ে। নুন ফুটে উঠেছে এখানে সেখানে।

পুরুতমশায়ের দৃষ্টি অনুসরণ করে পরসাদও তাকিয়েছিল তার বুঢ্ঢি মাইর দিকে, এবার সে বিস্মিত ভয়ার্ত গলায় চিৎকার করে উঠলো—কেয়া হো গিয়া, এ ঠাকুর?

তার কথার কোনো জবাব না দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন পুরুতমশাই। আর হেঁড়ে গলায় হঠাৎ শূন্যে দুহাত তুলে চিৎকার করে উঠলেন—গংগা মাই কি জয়।

একটু থেমেই আবার চিৎকার—আদমী লোগ সব দেখ যাও গঙ্গা মাই কি কিরপা, বুড়ি মাই ভবনদীর পার চলা গিয়া।

চিৎকার করতে করতেই শিঙিঙ্গে বুড়ো পুরুত যেন এক উন্মাদ নৃত্য শুরু করে দিলেন। বালি ছিটকে পড়লো চারপাশে। ঠেলেঠুলে সরিয়ে দিলেন দু'একজনকে জায়গা ফাঁকা করার জন্য। এ্যাই সব হঠ যা। দেখ যাও ভাই, আদমী লোগ সব দেখো আউর পুন্য করো—গঙ্গা মাই কি কৃপা ভবনদী কি পার—।

মুহূর্তের মধ্যে ভিড়ের ভিতরেই জমাট বেঁধে গেল আর একটি ভিড়। চিৎকার চলেছে, নৃত্য চলছে। ভিড় বাড়তে লাগলো। পড়তে লাগল পয়সা। মুখে মুখে যতো খবর ছুটছে, মুঠো মুঠো পয়সাও ততো পড়ছে। পুরুতমশাই নিচু হয়ে পয়সা কুড়োচ্ছেন আবার হাত তুলে চিৎকার করতে করতে লোক ডাকছেন। যেন মাদারিকা খেল, আ যা আ যা।

দিশেহারা পরসাদ তার ভাঙা গলায় এ ঠাকুর, বলে পুরুতমশাইএর হাত ধরে কিছু চাইলো। একঝাঁক খুচরো পয়সা তখনই তার চোখে মুখে এসে পড়লো। সে আর কিছু বলতে পারলো না। গলা শোনা গেল পুরুত-মশায়ের।

—আরে উল্লুক, পয়সা উঠা লে। তোর মাইজী পটল তুলেছে। দেখ যাও ভাই গঙ্গা মাই কি…। সময় নেই পুরুতমশায়ের, পরসাদের হাত ছাড়িয়ে চিৎকার শুরু করলেন আবার।

ধস্তাধস্তি চলেছে জোর। চিৎকার বেড়েছে। সাগরদ্বীপে এমনদিনে মৃত্যু মানে মোক্ষলাভ, সোজা স্বর্গ। দেখলেও পুণ্যি। ধুলো উড়তে আরম্ভ করছে! কাপিল মুনির মন্দিরে না গিয়ে লোক ভিড় করছে সেখানে। পরসাদের দো-আঁশলা ভাঙা গলা শোনা যাচ্ছে। কান্নায় ডুবে যাচ্ছে। আবার নিষ্ফল আক্রোশে সে থুতু ফেলছে বালির ওপর।

হে মাইজী তু কিধর চলি গই। তু তো গাই কি পুছি নহি পাকড়ি। আভি মেরা কেয়া হোগা। ইয়ে সাগরদ্বীপ খতরনক হই। তু ক্যায়াসে ভবনদী কি পার যায়েগী…

সূর্য ওঠার কথা এতোক্ষণে, কিন্তু ওঠে নি। ময়লা মেঘে আকাশ ঢাকা। চাপ চাপ কুয়াশা ঘিরে রেখেছে দ্বীপটাকে। কাতারে কাতারে মানুষ এখন চলেছে উজানে। সাগর থেকে ফেরার পথে। তিন-চার জন কন্স্টেবল ভিড় ঠেলে ঢুকছে। একটা স্ট্রেচারে পরসাদের বাটুটি মাইকে তুলে নিয়ে চলে গেছে। যাওয়ার সময় তারা পুঁটলিটাও তুলে নিয়েছে।

পুরুতমশাই কোঁচড় ভর্তি খুচরো পয়সা নিয়ে ভিড়ে মিশে গেছেন এক ফাঁকে। পরসাদ ক্ষীণ গলায় কেঁদে চলেছে তখনও। তার হাতে মায়ের লাঠিটাই এখন একমাত্র সম্পত্তি। গোটা আষ্টেক ভিখারী তার আশেপাশে বসে গেছে। তারা মুঠো মুঠো বালি তুলে আঁতিপাতি করে পয়সা খুঁজছে। মাঝে মধ্যে পাচ্ছেও দু একটা।

পরসাদ উঠে পড়লো। তার চোখ লাল। সারা গায়ে বালি, উসকো খুসকো চুল। হাতে মায়ের লাঠি। সেদিকে চোখ পড়তে কান্নার দমক এলো আর একবার।

চোখ ভিজে গেল। জোয়ার শেষ হয়ে আসছে। জলের দিকে চললো পরসাদ। বুক ফাঁকা হয়ে গেছে। বালি আর লোমে জট পড়া সেই বুকটায় হাত বোলালো সে। সব লোক উঠে আসছে জল থেকে। তখনই পয়সাদ আর একবার জলে নামলো। হাঁটু পর্যন্ত জলে ঢেউ কমে এসেছে। অনুভব করলো তার পায়ের তলা থেকে সুরসুর করে বালি সরে যাচ্ছে। ভেবে পাচ্ছিল না সে এখন কি করবে! প্রচণ্ড ক্ষোভ আর রাগ পাক খেয়ে উঠলো তার মধ্যে। এই সাগরদ্বীপ এই ভবনদী পার এই ধর্ম এ তীর্থ সব কিছু তার মনে হল, তার মাকে ছিনিয়ে নিয়েছে। সে তার মার লাঠি দিয়ে একটি উন্মত্ত পাগলের মতো সপাং সপাং করে মারতে লাগলো জলের উপর। তারপর একটানে ছুঁড়ে ফেলে দিল জলে যতোদূর পারে। ফোঁপাতে ফোঁপাতে নিজের মনে বললো—ই সব ঝুট তামাসা…এহি গঙ্গাসাগর কি পানি ভি গন্ধা!

দুপায়ে সাগরের নোনাজল ঠেলতে ঠেলতে পরসাদ উঁচু চরের দিকে উঠতে লাগলো।

জীবন যাপন

নিখিলেশ বিশ্বাস

সম্ভবত ভদ্রলোক একজন শিল্পী, বিগত একুশ বছর ধরে আঁকা জোকার কাজে লেগে আছেন, কিন্তু তাতে তার চলেনা ; অর্থাৎ আঁকা জোকার কাজের মাধ্যমে যে তার খাওয়া পরা চলবেনা তা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন তরুণ বয়সে। কারন অনেক জায়গায় ছবি জমা দিয়েছেন, অর্ডারি ছবি করেছেন কিন্তু তাতে কেউ টাকা পয়সা দিয়েছে কেউ দেব দিচ্ছি করে ঘুরিয়েছে, প্রায় প্রত্যেকেই গরম গরম প্রশংসা করেছেন তার ছবি। অতএব প্রশংসা জুটেছে, কানা কড়ি জোটেনি একটিও। বাধ্য হয়েই তিনি চেষ্টা করেছেন চাকরির, চেষ্টা করতে করতে জুটেও গেছে একটা স্কুলে আঁকার মাষ্টারের কাজ, বেশ বড় এবং নাম করা মেয়েদের স্কুলে। বড় বড় ঘরের মেয়েরা সেখানে পড়ে, লেখে, গান করে, ছবি আঁকে এবং সমাজদর্শন সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করে। ছাত্রীদের পোষাক চালচলন, গায়ের রঙ, দৈহিক উর্বরতা, গলার স্বর সবই বেশ চটকদার (সাদা বাংলা কথায় সবাইকে বেশ চকচকে এবং পেটভরে খেতে পাওয়ার মত দেখতে)। কেউ কেউ আধো আধো গলায় আহ্লাদি করে বলে, মাষ্টার মশাই আমার একটা ছবি স্কেচ করে দিননা। তিনি শোনেন এবং অল্প হেসে বলেন 'দেব'।

এখানে সেই ভদ্রলোকটির নাম 'ব্রজ' ; পুরো নাম ব্রজ চট্টোপাধ্যায় ; বাবার নাম, মোহিনী চট্টোপাধ্যায় ; ছোট ভাই-এর নাম নীলু চট্টোপাধ্যায় ; বোনের নাম অতসী চট্টোপাধ্যায় ; বৌ-এর নাম মালতী চট্টোপাধ্যায় ; ছেলের নাম পিকু চট্টোপাধ্যায় এবং মায়ের নাম ?…নাহয় নাইবা জানলেন, বড় দুঃখীনি তিনি, সারাদিন কাজ আর কাজ, দুপুরে একটু বিশ্রাম, তাও প্রতিবেশীদের জ্বালাতন, এটা দেখিয়ে দিন ওটা বলে দিন ইত্যাদি ইত্যাদি। রোগাটে গড়ন, গায়ের রঙ কালো, মুখশ্রী যাই হোক না কেন, মা মায়ের মতই দেখতে। বয়স প্রায় পঞ্চাশের কোঠায় ; মায়ের জন্য তাঁর দুঃখ হয় খুউবই, তবুও কিছু করতে পারেন না তিনি, অসুখে বিসুখে হাসপাতাল, তার বেশি হলে বড় জোর পাড়ার ডাক্তার পর্যন্ত তার দৌড়। মাঝে মাঝে বিরক্ত হয়ে ওঠেন তিনি, এভাবে হয়না, এভাবে কিছুতেই বাঁচা যায়না। কিন্তু না বেঁচে যাবেনটাইবা কোথায়…কাজেই ইদানিং চিন্তা তাকে চেপে ধরেছে, ঘুম চলে গেছে একদম এবং ক্রমশঃ রুক্ষ হয়ে উঠছে শরীর। মায়ের একটা ছবি তিনি নিজের হাতে আঁকবেন বলে ঠিক করেছিলেন কিন্তু আজও হয়ে ওঠেনি।

ব্রজর পরিবারের প্রত্যেকেরই নাম বলা হয়েছে বাকি আছে পরিচয়। সেটা প্রয়োজনে অবশ্যই বলা হবে। ব্রজর স্ত্রী মালতী এবং ওর বাড়ির শ্রদ্ধেয়

লোকজনেরা প্রায়ই ব্রজকে বলে, বাসা করে অন্য জায়গায় চলে যেতে, তারা বলতে চান "এইতো বয়স একটু সুখে থাকো" বাড়ি পাল্টাবার সমস্ত ব্যবস্থা তারাই করে দেবেন। কিন্তু উত্তরে ব্রজ কিছু বলতে পারেন না। শুধু বলেন 'যাব'। ব্রজর বাবা বারমাসই অসুখে ভোগেন, মাও তাই, আসলে মানুষ পুরোন হয়ে গেলে অসুখেরাও সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে...ব্রজ ভাববার চেষ্টা করেন অনেক, কিন্তু পারেন না। নিয়মিত স্কুলে যান, ছেলেকে আদর করেন, টুকিটাকি অর্ডারের কাজ করে তাঁর সময় কেটে যায়। তাঁর বাড়ি বলতে দেওয়ালের প্লাস্টার ঘসা দেড়খানা ঘর, বারান্দায় রান্না আর বাড়িতে ঢোকার মুখে একটি বসার চাতাল, এই টুকুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ তিনি এবং তাঁর পরিবার।

ব্রজর বন্ধুদের অবস্থাও প্রায় সকলেরই এক রকম। কারো একটু ভালো, কারো মোটামুটি। ওরা সবাই ব্রজকে কাজের ছেলে বলে, কারন এক সময় ব্রজ প্রচুর খেটেছেন, প্রদর্শনী করেছেন, নিজের সাথে সাথে বন্ধুদেরও তুলে ধরেছেন। ওদের আগে নিয়মিত দেখা হত, এখন মাঝে মধ্যে হয়। যে যার কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকে, প্রত্যেকেরই সংসার আছে কাজেই এখন ওরা আর আগের মত সবাই এক জায়গায় হতে পারে না। সমস্ত ছবি একপাশে জড় করে রাখা, ধুলো ময়লা মাকড়সার জালে মলিন, অথচ ওদের থেকে কিছু ছোট তরুণেরা এখনও কত প্রাণ চঞ্চল ; কাঁধে ব্যাগ, ব্যাগে বোর্ড ও কাগজের রোল, এসব নিয়ে সব সময়ই ব্যস্ত। মাঝে মাঝে ব্রজ ভাবেন তিনি এখনও থিতিয়ে যাননি, একটু বিশ্রামে আছেন এই যা ; এখনও তিনি ইচ্ছে করলে তেজী ঘোড়ায় জিন দিয়ে অনায়াসে মাইলের পর মাইল দৌড়ে আসতে পারেন। তাই তিনি ভাবেন, ভাইটার একটা কিছু হলে তিনি নিশ্চিন্ত হয়ে বেরিয়ে পড়বেন।

আজ উনি একটু টেনেছেন, পুরোন আড্ডার পাশদিয়ে আসার সময় কে যেন হাত ধরে ঢুকিয়ে দিয়েছে। একটু বেসামাল হলেও বেশ ঠিক আছেন, রাত প্রায় সাড়ে দশটা। হাঁটতে হাঁটতে বাড়ির দিকে চলেছেন ; সঙ্গে বন্ধু, পরস্পর পরস্পরের সাথে অনর্গল বলে চলেছেন সুখ দুঃখের কথা, কিন্তু কেউই কারো কথা শুনতে পাচ্ছেন না ; অবশেষে একজায়গায় এসে ওঁরা রাস্তা পাল্টে ফেললেন। এখন ব্রজ একা ; দরজার কড়ায় যখন হাত পড়ল ঘড়িতে তখন এগারোটা পাঁচ। মালতী এসে দরজা খুলে দিলো, ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করতে করতে কথা বলতে গিয়ে নিজেকে সামলে নিলো। খেতে বসে বুঝতে পারলো অন্যরা নিজের নিজের জায়গায় স্থির। টানলে উনি রাত্রে কিছু খেতে পারেন না, এটা ওঁর একটা স্বভাব, তবুও বসে একটু আধটু মুখে পুরে উঠে পড়লেন। বিছানায় সারা ঘর অন্ধকার করে শুয়ে শুয়ে সিগারেট টানছিলেন, মালতী এসে শুতে শুতে বলল, 'তুমি আবার ওসব খেয়েছ ?' সিগারেটে সুখটান দিয়ে ব্রজ দার্শনিকের মত বললেন, 'খাওয়া আর হল কই,

একটু টেনেছি মাত্র।' ঐ ও'র একটা দোষ, মাল খেয়ে উনি কোন দিন তৃপ্তি পান না, আসলে কতখানি খেলে তৃপ্তি আসবে সেটাও নিজেই জানেন না, নাকি মদ কোন দিনই কাউকে পরিতৃপ্তি দেয়না।
মাঝরাতে ব্রজর ঘুম ভেঙ্গে গেল, ভ্যাপসা গরম থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য একটু বাইরে আসার কথা ভাবতেই, শুনতে পেলেন "বলহরি হরিবোল"। দরজা খুলে বাইরে এসে মনেমনে একটা প্রশ্ন ছুঁড়ে দেন, কে মারা গেল ? কিছুদূরে বড় রাস্তা দিয়ে কোরাস পায়ের শব্দ ক্রমশঃ দূরের দিকে মিলিয়ে গেল। মাথায় হাত বুলিয়ে রাস্তার পাশের চাতালে বসলেন, চাতাল এখন একদম ফাঁকা যেখানে পাড়ার (লোক চোখে) বেকার ও বকাটে ছেলেগুলো দিনরাত আড্ডা মারে। মৃদু হাওয়া এসে ও'র শরীর ছুঁয়ে বয়ে যাচ্ছিল। সামনের লাইট পোষ্টের তারের সাথে একটা ঘুড়ি ঝুলে আছে, কার বা কোথা থেকে এসেছে ব্রজ তা জানেননা বা জানার চেষ্টাও করলেননা, শুধু এক দৃষ্টে রঙ্গীন ঘুড়িটার দিকে তাকিয়ে মনে মনে ভাবলেন···আমাদেরই বুদ্ধিবলে ঘুড়ি আকাশে ওড়ে, কাজেই ঘুড়ি আকাশ দেখে আর আমরা দেখি ঘুড়িকে এবং ঘুড়ি দেখতে দেখতে, কখনও কখনও আমার নীচের পথের কথা ভুলে যাই, নিজের কথা ভুলে যাই, ভুলে যাই পারিপার্শ্বিক সব কিছু, তবু ঘুড়িতো মানুষকে ওপরের দিকে তাকাতে শেখায়, তাই বাতাসে একটা ঘুড়ির ছবি আঁকলে কেমন হয়···। রাস্তা থেকে একটা কুচো কয়লা কুড়িয়ে নিয়ে উনি বাতাসে ঘুড়ি আঁকতে শুরু করলেন। আঁকতে আঁকতে আঁকা প্রায় শেষ, ছবি দেখে তিনি নিজেই অবাক হয়ে গেলেন। ঘুড়ি আঁকতে গিয়ে নিজের অজান্তে তিনি এ'কে ফেলেছেন একটি মুখ ; শুকনো মেঝের ওপর মোটা মোটা কালো দাগে উজ্জ্বল হয়ে আছে একটি মুখ, মানুষেরই···, এবার স্বভাবতই প্রশ্ন উঠতে পারে মুখটি কার ? ব্রজও সংশয়ে প্রশ্ন করলেন তুমি কে ? কালো মুখ এবার উত্তর দিতে শুরু করল, চিনতে পারছেন না, আমি দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে এখানে এসেছি ; তারপর নিজের নিজের প্রাণ হাতে করে এক কাপড়ে এদেশে পালিয়ে এলো আমার বাবা, আমার মা ভাই, বোন সবাই। সকলকে সাথে নিয়ে শিয়ালদার প্লাটফর্মে না খেয়ে রাত কাটিয়েছি বহুদিন, স্বদেশী করতে গিয়ে বেত খেয়েছি, কিন্তু কাউকে বলতে পারিনি কোনদিন ; কারণ প্রমাণ তো নেই, তাছাড়া বেতের দাগ আর কতদিনইবা থাকে, আস্তে আস্তে চামড়ার সাথে মিলিয়ে গেছে ; তারপর সেকি ভয়াবহ দিন, রাস্তায় রাস্তায় ফেরিওয়ালা হয়ে ঘুরে বেড়িয়েছি, চোখের সামনে ভাইএর মৃত্যু, বোন নিরুদ্দেশ, এভাবে বয়স বাড়তে বাড়তে আমি আজ আমি হয়েছি ; তুই আমায় চিনতে পারছিস না ব্রজ ? আমার নাম মোহিনী চট্টোপাধ্যায়, আমি তোর বাবা ; এই দেখ, আমার বয়স হয়েছে বলে, অসুখ আমাকে কিভাবে মাথা ঝুঁকিয়ে দিয়েছে ; আমি কোন দিন মাথা নামাই নিরে ব্রজ। আমার হাত কোন দিনই এত দুর্বল

ছিলনা। আচমকা ব্রজর গালে যেন একটা থাপ্পড় এসে পড়লো যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দুই হাতে তিনি ছবি মুছে ফেললেন। আবার আঁকতে চেষ্টা করলেন কিন্তু না ; এভাবে যত বারই ছবি আঁকার চেষ্টা করলেন তত বারই কারো না কারো মুখ···মা, ভাই, বোন সবশেষে বৌও এসে হাজির হল তাঁর ছবিতে ; ওরা প্রত্যেকেই নিজের নিজের কথা বলল। মা নীরব চোখে হাত তুলে আশীর্বাদ করলেন ; ভাইএর চোখে আগুন জ্বলল ; বোন বলল, দাদা আজকাল মেয়েরা সবাইই তো চাকরি করছে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান গুলিতে······ ; বৌ বলল, আমাকে একটা মাঠে নিয়ে যেতে পার, যেখানে ঝলমলে আকাশ, ভোরের পাখির গান, প্রভাত সূর্যের আলো এসে ভরিয়ে দেবে আমাদের সংসার, আমরা স্বপ্ন দেখব, আর চিৎকার করে বলব, বেঁচে আছি, বেঁচে আছি, দেখ একেই বেঁচে থাকা বলে। হাজার চেষ্টা করেও ব্রজ কিছুতেই একটা ঘুড়ির ছবি আঁকতে পারলেন না।

এরপর ঘুম আসা অসম্ভব তাই ব্রজ বড় রাস্তা ধরে হাঁটতে হাঁটতে রাস্তার পাশে প্রচুর মানুষকে ঘুমোতে দেখলেন, মায়ের কোলে শিশুর ঘুমোন দেখলেন নারী দেহের ওপর পুরুষের হাত রাখলে কেমন দেখায় তাও দেখলেন। নেংটো ছেলেরা বিভিন্ন ভঙ্গিমায় ঘুমিয়ে আছে ফুটপাতে ; মনে মনে আশ্চর্য হলেন ব্রজ, এদের কারোরই ঘর নেই, চৌকি নেই, বিছানা নেই এবং মাথার বালিশতো নেইই, তবুও এরা কিভাবে ঘুমোচ্ছে। যে কাপড়টা পড়ে আছে তা জীর্ণ ও মলিন হয়ত রাত্রে পেট ভরে খায়ও নি, ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়েছে···এরা কী সুখী মানুষ···না চিন্তাহীন দুঃখী মানুষ···, পেটে ভাত না থাকলে তো ঘুম আসেনা···তবে এরা কি জীবাস্মৃত···এদের থেকে তো তিনি নিজে অনেক সুখে আছেন···মনে শক্তি এলো ব্রজর। প্রায় তাঁর ঘাড়ের ওপর দিয়ে চলে গেল একটি দুধের ট্রাক ; ভোর হয়ে এসেছে, ফুটপাতের লোকজনেরা কেউ কেউ জেগে উঠেছে, ওদের বেডটিও লাগেনা ব্রেকফাস্টতো চেনেই না। নেংটো ছেলেগুলো খেলার ছলে ছুটোছুটি শুরু করেছে ওদের সীমানার মধ্যে। ব্রজ ঠিক করলেন আবার ছবি আঁকা শুরু করবেন, এরাই হবে ওঁর ছবির বিষয়বস্তু, ছবিতে ওদের সবাইকে উপহার দেবেন, একটি করে ঘর, পেট ভরে খাওয়া ও প্রচুর জামা কাপড়। আঁকবেন যেমন (১) একটি নেংটো ছেলে, সারা গায়ে ময়লা ফুটপাতে দাঁড়িয়ে আছে। তার পাশে ঐ ছেলেটিই পরেছে একটি শৌখিন পোশাক, দাঁড়িয়ে আছে একটি শৌখিন বাড়ির সামনে, সাদা দেয়ালের আলোয় ওর সমস্ত মুখ উজ্জ্বল। (২) ফুটপাতে শুয়ে আছে একটি মা ও শিশু জামাহীন বুকের সমস্ত হাড় বেরিয়ে আছে, রুগ্ন মুখে আবিষ্কারের আনন্দে সে তাকিয়ে আছে রাস্তার পাশে তাদেরই জন্য রাখা কয়েক বস্তা চাল এবং দুই পিপে ভর্তি সাদা দুধের দিকে। (৩) একজন অসুরের মত ঝাঁকড়া চুলওয়ালা মিশ মিশে কালো মানুষকে ফুটপাত থেকে তুলে বুকে জড়িয়ে ধরেছেন রাষ্ট্রপতির মত

পোশাক পরা লোক, পাশে রাখা লম্বাটে সাদা গাড়ির বনেটে, মাডগার্ডে, ছাদে ও ইঞ্জিনের ওপর বসে আছে প্রচুর নেংটো ছেলেরা ; ওখানেই ছুটোছুটি ও দুষ্টুমি করার চেষ্টা করছে এবং রাষ্ট্রপতির পোষাক পরা ভদ্রলোক তাকিয়ে আছেন রাস্তার অপর পারে মাংসের দোকানে ঝুলিয়ে রাখা একটি চামড়া ছাড়ানো খাসির দিকে। এরকম হাজার হাজার ছবি ব্রজর মাথায় পাক খেতে লাগলো।

'দাদা কটা বাজে বলতে পারেন' ? একটা জগত থেকে আর একটা জগতে ফিরে এলেন ব্রজ, দেখলেন হাতে ঘড়ি নেই তাই কিছু বললেন না দ্বিতীয় ব্যক্তিকে। লোক জনের চলাফেরা শুরু হয়ে গেছে। এক জায়গায় বেশ ভীড় দেখে এগিয়ে গেলেন, দেখলেন ভীড়ের মাঝে একটি লোক, চোখে পুরু লেন্সের চশমা, সারামুখ না কাটা দাড়িতে ভরতি, পোশাক বেশ ময়লা ; চক দিয়ে রাস্তার ওপর হিজিবিজি কিযেন আঁকছে। চলমান লোকেদের মধ্যে থেকে অনেকেই প্রশ্ন করছে, কোন উত্তর না পেয়ে যেমন এসেছিল তেমনই চলে যাচ্ছে। হঠাৎ গাড়ি থামিয়ে চকচকে ধুতি পাঞ্জাবি পরা একজন লোক ওর কাছে ছুটে এলো, এসেই হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, দেখতো ভাই আগামী পাঁচ বছর আমি থাকছিতো ? লোকটার গম্ভীর মুখ আরো শক্ত হল। ধুতি পাঞ্জাবি আবার বলল, বুঝতে পারছেন না আগামী ইলেকশনে আমি জিতছিতো ? এবার লোকটা কথা বলল, কি কাজ করেছ ? ধুতি পাঞ্জাবি গৌরাঙ্গ হাসি হেসে বলল, তার মানে ! আমিতো বলে দিয়েছি যে পাল্টে দেব, একে বারে পাল্টে দেব দেশটাকে, ইস্, কি দুঃখইনা এখানকার মানুষগুলোর, ভয় কি আমিতো আছি ; আজকের যে সমাজ ব্যাবস্থা দেখছেন আগামী দিনে তা থাকবে না। লোকটা মাথা নামিয়ে নিজের কাজে মন দিলো। এভাবে ও অনেকগুলি হিজিবিজি জাতীয় ছবি এঁকে ফেলেছে : এত সামনে থেকেও ব্রজ ওর আঁকা ছবির একটাও বুঝতে পারছেন না, অথচ রেখাগুলি বেশ জোরালো, কি হতে পারে এর মানে···জিজ্ঞাসা করবেন নাকি···ভেবেও এগোতে পারলেন না।

ধুতি পাঞ্জাবি উত্তর না পেয়ে চলে গেছেন অনেকক্ষন। একজন ভদ্রমহিলা যেন উড়েই এলেন, পোশাক দামী ও শৌখিন, সারা পিঠময় এলোমেলো রেশমী চুল, ব্লাউজের শেষ প্রান্ত থেকে কোমর পর্যন্ত অনেকটা খোলা অংশে চক্‌চক্ করছে, সারা শরীরে যেন সকালের ঢেউ উঠেছে, একটা হিজিবিজির ওপর দাঁড়িয়ে বললেন, এই যে শুনছেন, আপনাকে যে এভাবে এখানে পেয়ে যাব ভাবতেই পারিনি, অমোদের বাড়ীতে একবার চলুননা, সঙ্গে গাড়ি আছে, আমার স্বামী এবার···। মুখ তুলে তার দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিলো লোকটা, তারপর হাত দেখিয়ে যে হিজিবিজিটার ওপর ভদ্রমহিলা দাঁড়িয়ে ছিলেন সেটা থেকে সরে যেতে বলল। একরকম লজ্জিত হয়েই ভদ্রমহিলা সরে দাঁড়ালেন, লোকটা আবার হিজিবিজি আঁকায় মন দিলো। ব্রজর মত দাঁড়িয়ে থাকা অনেক লোকের

মনেই কৌতূহল দেখা দিয়েছে কিন্তু কেউই কিছু বলতে সাহস পাচ্ছে না ঐ দাড়িওয়ালা লোকটাকে।

কারো হাতে ঝুড়ি, কারো শাবল, কেউ কাঁধে নিয়েছে বেলচা, একদল খালিগা মানুষ রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে ঝুকে পড়ল ভীড়ের ওপর। ওদের মধ্যে থেকে একজন তরুন চিৎকার করে উঠলো, বাবু আপনি! এখানে কি করছেন? গম্ভীর মুখ আবার সোজা হল, কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর পুরুলেন্স ও দাড়িগোঁফের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো হাসি মুখ। লোকটা এত সুন্দর হাসতে পারে! ব্রজ অবাক হলেন। এবার কথা বলল লোকটা, তোরা ঐ খানেই আছিস নাকি? প্রগতি ভেঙ্গে দেয়নি তোদের বস্তি? তরুন এগিয়ে এসে বলল, তা দিয়ে ছিলো একবার, আবার বানিয়ে নিয়েছি; আপনি বাবু সেইযে কতদিন আগে আমাদের সাথে খেয়ে বেরোলেন, আর এলেন না কেন? লোকটা বলল, অনেকদিন যাইনি বুঝি, তবে চল আজই যাই। জামা কাপড় ঝেড়ে লোকটা ওদের সাথে হাঁটা দিল।

আশ্চর্য যতসব উদ্ভট কাণ্ড! বলতে বলতে ব্রজ চিরুনি হাতে আয়নার সামনে দাঁড়ালেন, একটু পরেই স্কুলে বেরুতে হবে, কিন্তু নিজের প্রতিবিম্বর দিকে তাকিয়েই চমকে উঠলেন, একি! ঐ লোকটা এখানে কি করে এলো! ব্রজ নিজের গালে হাত দিলেন, চোখ রগড়ালেন, ঘরের সমস্ত আসবাব একবার ভালো করে দেখে নিলেন, আশ্চর্য সবই ঠিক আছে শুধু আয়নাটাই…'কিগো স্কুল যাবেনা, ভাত বেড়ে দিয়েছি' বলতে বলতে মালতী এসে ঘরে ঢুকতেই আয়নার লোকটা কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে গেল। 'চলো, বলে ব্রজ এগিয়ে চললেন পাশের ঘরে পরিপাটি করে রাখা গরম ভাতের থালার দিকে।

পান বরোজ ও বেরজো জামাই

নীরদ ভট্টাচার্য

এক বাণ্ডিল শুকনো প্যাকাটি বরোজের গলিতে দাঁড় করালো ভোলা। কলাগাছের আঁশে লতা বাঁধতে বাঁধতে ব্রজ মণ্ডল ওরফে বেরজো, পাঁচলা গ্রামের ছোট-বড় সকলের বেরজো জামাই ছেলের দিকে না তাকিয়েই জিজ্ঞেস করলো—বড়ডা কোথায় ?

তেরো বছরের ভোলা উত্তর করে—বাজার পানে মিটিংয়ে গেছে দাদা। রাগে এবং উত্তেজনায় মুখদিয়ে খিস্তিকথা প্রায় বেরিয়ে গিয়েছিলো। অতিকষ্টে নিজেকে সামলে নিলো বোরজো। বললো—নিজের খাওয়ার ঠিক নেই তায় দেশ উদ্ধার করছে। যত্তোসব⋯ ⋯।

শীত যাই যাই রোদ্দুরে এখনো সেরকম তেজ আসে নি। কিছুক্ষণ আগে সকাল হয়েছে। বরোজের মধ্যে ছায়া ছায়া ঠাণ্ডা। নগ্ন পায়ে শীতের কামড়। বেড়ে যাওয়া পানলতা মাটিতে শুইয়ে অগ্রভাগ বাঁশের চটার সঙ্গে বেঁধে দিচ্ছে বেরজো। লতার নিচের অংশের পাতাগুলোয় হলুদ রঙ ধরতে শুরু করেছে। তা হবে না কেন ? গত চার দিন একটা পানও তোলা হয় নি। ছেলে বলে এসময় বেশি পাতা ভাঙ্গলে গাছের ক্ষেতি হবে। কথাটা মনে পড়ায় দাঁতে দাঁত ঘষলো বেরজো—শুয়োরের বাচ্চা আমারে পান চাষ শিখাতে আসে ? এরপর বরোজে ঢুকতে দেবো না, তখন মজা টের পাবি।

বরোজটা তিনপুরুষের। রেরজো মণ্ডল বেঁচে থাকতে অন্য কাউকেই এর ওপর খবরদারী করতে দেবে না। বাপের একমাত্র ছেলে ব্রজমণ্ডল। ছেলে বয়স থেকে হাতে কলমে পান চাষ শিখেছে। হাট, বাজার, এখানে-সেখানে যখন যেখানেই গেছে নন্দকিশোর ছেলেকে সঙ্গে নিয়েছে। নন্দকিশোরের ধারণা এর ফলে ছেলের বুদ্ধি বাড়ে। আখেরে ভালো হয়। তা সেইমত এতদিন বেশ তো চালিয়ে এলো বেরজো। কখনো কোন অশান্তি হয় নি। বরোজ থেকে ঝুড়ি ঝুড়ি পান তুলে পাইকারী-খুচরা বিক্রী করেছে। টাকায় টাকা। গ্রামের মানুষ একডাকে “বেরজো জামাইকে” চিনে নিতো। বাঁশের বেড়ার ঘর ভেঙ্গে ইটের দেয়াল দিয়েছিলো। সন্ধ্যের পর গ্রামের বামুন-কায়েতরা পর্যন্ত ব্রজ মণ্ডলের বারান্দায় জড়ো হতো। হুকো ঘুরেছে হাতে হাতে। কল্কের আগুন কখনো নেভে নি। বেরজো জামাই যা বলে তাতেই ওরা সায় দেয়। সে একদিন ছিল বটে। আর আজ অর্জুন ভোলা সেয়ানা হয়ে বাপের ওপর টেক্কা মারছে।

কাঁধ থেকে নতুন কেনা তুষের চাদর খসে পড়লো। বেশি মাড় থাকায় পিছলে যাচ্ছে। চাদরের একদিকটা গলায় পেঁচিয়ে বরোজ থেকে বেরিয়ে এলো বেরজো।

বাইরে নারকেল গাছের তলায় বসে বিড়ি ধরালো। নারকেল গাছের ছায়া লম্বা হয়ে পশ্চিম দিকের পুকুরের জলে তলিয়ে গেছে। পুকুরের উত্তর দিকে বোসেদের বাগান। আম, সফেদা, নোয়াল, কামরাঙা, ক্যাপলের গাছ। বিশ পঁচিশ বছর আগে অজস্র ফল হতো। কে কত খাবে? এখন মাথা কুটলেও সেদিন আসবে না। এখন গাছে সার দেও, খৈল দেও, যত্ন করো—তবে যদি কিছু পাওয়া যায়। এখন সবই কেমন যেন উল্টো উল্টো। ভাল্লাগে না। বেলা তেমন বেশি না হলেও বাইরের রোদে বেশিক্ষণ বসা যায় না। শরীর তেতে ওঠে। গলা থেকে চাদর খুলে ফেললো ব্রজ। বরোজের দিকে তাকালো। বরোজের মাথায় লাউডগা প্যাকাটিতে জড়িয়ে জড়িয়ে বেড়ে চলেছে। ডগাগুলো বেশি তেজি। প্রায়ই ডগা কেটে বাজারে বিক্রি করে। আবার বেড়ে ওঠে। এ ভারি মজার ব্যাপার।

বিড়িতে সুখ টান দিয়ে আবার বরোজে ঢুকলো বেরজো। খুপরী হাতে ভোলা একমনে কাজ করছে। পুবের দুটো লাইন ঝকঝকে তকতকে। কাজে এসেই ওরা ওইদিক দিয়ে শুরু করে। কারণ জিজ্ঞেস করলে বলে—সুয্যি পুব দিক দিয়ে ওঠে। তাই যখন যে কাজ করো না কেন পুবের থেকে শুরু করবে। ভালো হবে।

—ভালো যে কী হবে তা তো দেখতেই পাচ্ছি। ওতে কী একটাও পান বেশী হয়েছে?

অর্জুন উত্তর করেছিলে—বেশি হবে কেমন করে? সময় মত সার-খৈল দিতে পারলাম না। সে সময় যদি কিছু টাকা দিতে তাহলে গাছের চেহারাই আজ অন্যরকম হতো।

কপাল টান করে ভুরু নাচিয়ে খোটা দিয়ে বেরজো বলেছিলো—তোরা তো এখন লায়েক হয়েছিস, বাজারে মিটিং করে লোকেদের ভালোমন্দ বোঝাচ্ছিস। বাপ খারাপ তোরা ভালো। তা টাকার দরকারে বাপের কাছে হাত পাতিস্ কেন?

—হাত পাতবো কেন? তুমি তো আর ভিক্ষে দিচ্ছ না। বরোজের টাকা বরোজের জন্যেই চাইছি। দিতে বাধ্য।

ফুঁসে উঠেছিলো বেরজো—না বাধ্য নই। আমার বাপ ঠাকুর্দার বরোজ। এর এক পয়সা আমি কাউকেও দেবো না। ভালো না লাগে বাড়ি ছেড়ে চলে যা। এক রত্তি মুরোদ নেই তার বড় বড় কথা।

এই সমস্ত কথা মনে হলে রাগে সমস্ত শরীর কাঁপতে থাকে। তিরিশ-পঁয়ত্রিশ বছর ধরে বরোজ নিয়ে পড়ে আছে বেরজো। প্রথম প্রথম ব্যবসাটা ছিলো রমরমা। পাঁচলা গ্রামে বরোজ বলতে এই একটিই। বাজারে যেতে না যেতেই ঝাঁকাশুদ্ধ উধাও। আর আজ? ব্যাঙের ছাতার মত হুটহাট দশ-বারটি বরোজ গজিয়ে উঠলো। বিক্রীবাটা যা হয় তাতে কোন মতে সংসার

চলে যাচ্ছে। ওদিকে ঘাড়ের ওপর যমুনা। এই বোশেখে পনেরোয় পা দেবে। ওর বিয়ে কী ভাবে, কেমন করে হবে বেরজো জানে না। ভাগ্যিস পাঁচলা গ্রামে আগেকার সেই সমাজ নেই তাই রক্ষে। নচেৎ কী যে হতো ভাবা যায় না।

বরোজের লাইনে ঘুরতে ঘুরতে আপন মনে মাথা ঝাঁকালো বেরজো—নাঃ, এই একটা জিনিষ ছোড়াগুলো ভালোই করেছে। মোড়লদের অত্যাচার আর নেই। সেয়ানা মেয়ের বিয়ে না দিলে এখন আর কারো ধোপা-নাপিত বন্ধ হয় না।

বেলা বেড়ে যাচ্ছে। এখনো অর্জুন এলো না। কাকের বাসার মত এলোমেলো একমাথা চুল, পায়জামা, পাঞ্জাবী পরে রাত দিন টো টো করে। পাঁচলা গ্রামে বারুজীবি সমিতি ; রিক্সা সমিতি, ব্যবসায়ী সমিতি ওরাই তৈরী করেছে। এবার নাকি কালীতলার মোড়ে সরকারী বাজার হবে। তাহলে আর দেখতে হবে না। জিনিস পত্রের দাম হুহুবেগে বেড়ে যাবে। কথায় বলে 'একে মা মনসা, তায় ধুপের ধুনে।' এমনিতেই সবকিছুর গলাকাটা দাম। তারপর সরকারী বাজার হলে ওদের পোয়া বারো। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বেরজো—যাক তোরা তোদের পার্টি নিয়ে। বরোজ বেচে দিয়ে যে দিকে দু-চোখ যায় এবার চলে যাবো। সংসারের মুখে মারি ঝ্যাটা। বউ ছেলে মেয়ে কেউ যখন চায় না তখন আমার কী ?

দক্ষিণায়নের সূর্য এখনো নাকবরাবর আসেনি। এইবার চটপট পানগুলো তুলতে হবে। বিকেলের হাটে না গেলে তেল-নুন আসবে না। ভোলাকে বললো—বাড়ি গিয়ে ঝাঁকা নিয়ে আয়। পান ভাঙবো।

ভোলা অবাক হলো—আর একটুক্ষন দেখি না। দাদা কী বলে না বলে শুনে তারপর ভাঙলেই হবে।

—ও আবার কী বলবে ? বলি, তোরা আমায় কী ভেবেছিস্ অ্যা ? মরে গেলেও ফড়েদের হাতে একটা পানও দেবো না। ওরা না পারে হেন কাজ নেই।

বাপকে বোঝাতে চেষ্টা করে ভোলা—ওরা ফড়ে নয়। পঞ্চায়েতের লোক। আর তা ছাড়া ওরা তোমার কী করেছে কওতো ?

বেরজো বলতে লাগলো—কাজী পাড়ার সিরাজউদ্দিনকে চিনিস্ তো ? ওই যে, বাজারে তরকারী বিক্রী করে। আমার থেকে অনেক বড় এবং ভালো বরোজ ওর ছিলো। একটা না দুটো। পাশাপাশি। বরোজে লোক খাটতো। এতল্লাটে একমাত্র ওর বরোজেই মিঠাপাতি পান ছিলো। তা ওই ফড়েরা দাদন দিয়ে দিয়ে সিরাজের মাথার চুল পর্যন্ত কিনে নিয়েছিলো। ওই ভাবে পান বরোজ টেঁকে না। শেষে যা হবার তাই হলো। বরোজ গেলো উঠে। এখন তো দেখতেই পাচ্ছিস ? কোনদিন খায়, কোনদিন বা খায়ই

না ।···তোর দাদার কথায় তুই বিশ্বাস করিস্ নে, বুঝলি ? পঞ্চায়েতের তিনু মাস্টার ওর মাথাটা খেয়েছে ।···যা এই বেলা বাড়ি থেকে ঝাঁকা নিয়ে আয় । বাপ বেটা হাত লাগিয়ে ঝটপট তুলে ফেলি—যা ।

গুম মেরে ভোলা দাঁড়িয়ে রইলো—দাদারে না শুধোয়ে এ কাজ আমি করতে পারবো না ।

আর কোন কথা না বলে বাড়ির পথে পা বাড়ালো বেরজো । মাথার মধ্যে অন্য পরিকল্পনা । সন্ধ্যের সময় বোস পাড়ার প্রকাশ বোসের সঙ্গে দেখা করলো । বোসেদের শিবমন্দিরের চাতালে বসে দুজনে কথা হলো । প্রথমে বেরজো রাজী হতে পারেনি । তার নিজের হাতে গড়া বরোজ এভাবে নষ্ট করে দেবে ? না ছোটবাবু না, তা হয় না । মরে গেলেও এ কাজ আমি পারবো না ।

—কিন্তু এছাড়া ওদের টিট্ করার আর কোন পথ নেই । তা জামাই, কথাটা আর একবার ভেবে দেখো । পুরনো গাছে ফলনও কমে গেছে । নতুন কোঁড় বসালে দু-চার মাসের মধ্যেই ধাই ধাই করে লতাগুলো বেড়ে উঠবে ।

শিবমন্দিরের দক্ষিণে গভীর জলের পুকুর । পুবের দিকে রাস্তা । গ্রাম্য রাস্তা এঁকে বেঁকে বাজারে মিশেছে । ভয়ে ভয়ে চারদিক তাকালো বেরজো—ওরা জানতে পারলে পাড়ায় বাস করবো কী করে ? তা ছাড়া নতুন করে বরোজ তৈরী করতে টাকারও দরকার ।

—আমার কাছে গোপনে যে টাকা রেখেছিস্ তার থেকে কিছু নিয়ে নে ।

ব্রজকে চুপ করে থাকতে দেখে এতক্ষণে মোক্ষম কথাটা বললো প্রকাশ—যাকগে যাক্ । ভেবে চিন্তে ওটা তুই ঠিক করিস । এরমধ্যে আমাকে আর জড়াস নে । তবে একটা খবর তোকে দেবো বলে অনেকদিন ধরে ভাবছি । এখন থেকে সাবধান না হলে পরে সর্বনাশ হয়ে যাবে ।

শিবমন্দিরের পুজারী গোবিন্দ ঠাকুরের মেয়ে শুকনো ফুল, বিল্বপত্র জলে ভাসিয়ে পুকুরের সিঁড়ি থেকে উঠে আসছে । ওরদিকে চোখ রেখে বেরজো বললো—ব্যাপারটা কী হয়েছে বলতো ?

—আমার বড়দার মেয়ে পুটিকে চিনিস্ তো ? ওদের দলের যেখানে যত মিটিং, ফাংশন হয় তাতে ও গান গায় । ও মেয়ে সব সময় তোর অর্জুনের গায় গায় লেগে আছে । আমি নিজের চোখে দেখেছি গত মাসে স্টেশনের মাঠে মিটিংয়ে গান গেয়ে ফেরার সময় দুজনে জড়াজড়ি হয়ে একই চাদরের তলায় বাড়ি ফিরছিলো ।

—অর্জুন ? তুমি ঠিক দেখেছ ছোটবাবু ?

—তবে আর বলছি কী জামাই ? ও মেয়ে তোর অর্জুনকে একেবারে শেষ করে দেবে ।

বেরজো জামাইয়ের মনে পড়লো । মাস কয়েক আগে তিন বাপ-বেটা বরোজে কাজ করছিলো । অর্জুনকে ডাকতে পুটি বরোজে ঢুকবেই । বলে কিনা—

মেয়েছেলে কেন বরোজে ঢুকবে না? মেয়ে বলে আমরা কি মানুষ নই? আপনাদের ওসব কথা এখন আমরা মানি না।

বড়বাবুর মেয়ে বলে সেদিন ওকে ছেড়ে দিয়েছিলো বেরজো। অন্য কেউ হলে পিটিয়ে ওর ঠ্যাং খোঁড়া করে দিতো। এ সব ব্যাপারে মেয়েছেলে বলে বেরজোর কাছে কোন খাতির নেই। অর্জুনও দিন দিন কেমন ভেঁড়ুয়া হয়ে যাচ্ছে। বোকা মুখ্যু ভোলাকেও সঙ্গে নিয়েছে।

—তাহলে আমি এখন উঠি ছোটবাবু।

—তা কী ঠিক করলি?

—এবার ওদের পেটে মারবো। দেখি, ওদের পার্টি কী করে?

বাড়িতে এসে হঠাৎ কেমন গম্ভীর হয়ে গেছে বেরজো। মনের মধ্যে একই সঙ্গে জোয়ার ভাটার ঠোকাঠুকি। এতদিনকার বরোজ শেষপর্যন্ত ওদের জন্যে নষ্ট করবে? প্রকাশ বোস বলেছে, পুবের ওই দুটো গলি বাদ দিলে আরো বিশ কুড়িটা থাকবে। চিন্তা করিস কেন? তারপর ওই দুটো গলিতে মিঠাপাতির ফোঁড় বসাবি, ভালো হবে।

কিন্তু ওরা যদি ওগুলো দখল করে নেয়?

ওদিককার জমি সামান্য উঁচু বলে জল দাঁড়ায় না। তাছাড়া মাটিও কেমন শুকনো শুকনো। মাটিতে অত সহজ কেঁচো উঠবে না।

খেয়েদের নিজের চালাঘরে শুয়ে পড়লো বেরজো। অমাবস্যার রাত, বেজায় ঠাণ্ডা। কাজী পাড়ায় মোরগের ডাক। কুকুরগুলো দল বেধে চিৎকার করছে। কোথাও কিছু দেখে থাকবে। গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে পাহারা দিতে এখনো ওরা বেরোয় নি। এসময় কাজ হাসিল করলে কেমন হয়? বিছানা থেকে উঠতে যাবে, বাইরে তিনু মাষ্টারের গলা—অর্জুন কী ঘুমিয়ে পড়েছিস?

উঠোনের কোনে বাতাবী লেবুতলার অন্ধকারে দাঁড়িয়ে দুজনে কী যেন ফুসফাস করে। তিনুমাষ্টার চলে যেতেই অর্জুন এসে শুয়ে পড়লো। তারও অনেক পরে পাঁচলা গ্রাম নিঝুম হলে বেরজো জামাই গুটি গুটি চালা থেকে বেরিয়ে উঠোনে নামলো। বেরজোর একহাতে কাটারী দা, অন্যহাতে লাঠি। চতুর্দিক ভালোকরে দেখে নিয়ে আস্তে আস্তে বরোজের পথে পা বাড়ালো। কাজী-পাড়ার ওইদিকে কুকুরগুলো ডাকছে তো ডাকছে। বিরামহীন। বেরজোর মনে এখন ভাটার টান, তাকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। কুকুরের ডাক লক্ষ্য করে ছোড়াগুলো ওইদিকেই ঘুরছে। তবু সাবধানের মার নেই। ওদের সামনে যাতে না পড়ে তার জন্যেই বেরজো বাঁড়ুজ্যেদের কলাবাগানের মধ্যদিয়ে হাঁটা লাগলো। শুকনো কলার বাস্‌নায় খস্‌খস্‌ আওয়াজ হতেই থমকে দাঁড়ালো বেরজো। সাপ নয় তো? কলাক্ষেতে জাত সাপের আস্তানা। ওর একটা ছোবল খেলেই ভবলীলা শেষ। লাঠি ঠুকে সাবধানে এগোতে লাগলো বেরজো।

এইটুকু পার হতে পারলেই পুকুর। পুকুরের পুবের পারে পানবরোজ। ওদিকে কোনকালেও ওরা পাহারা দেয় না।

বাঁশের হুড়কো ঠেলে বরোজে ঢুকলো বেরজো। দ্রুতপায়ে পুবের গলির দিকে এগিয়ে কাটারী দা দিয়ে যেইমাত্র পানগাছে কোপ বাসাতে যাবে তীব্র টর্চের আলো ওর চোখে পড়লো—খবরদার বলছি। একটা গাছে হাত দিয়েছ কী তোমাকে আমরা শেষ করে দেবো।

একদিকে অর্জুন, অন্যদিকে তিনু মাষ্টার। পেছনে পঞ্চায়েতের পাহারাদার সেই ছোড়াগুলো। ওদের মধ্যে কোমরে কাপড় জড়ানো হাঁড়িগলে পুটি। পুটিকে দেখে বুকের মধ্যিকার ভাটার টান বাড়লো। হুংকার ছাড়লো চৌষট্টি বছরের বেরজো জামাই—আমার বাপ-ঠাকুর্দার বরোজ। আমি যা খুশি তাই করবো—সরে যা।

চোখের নিমেষে বৃদ্ধের হাত থেকে লাঠি-দা কেড়ে নিয়ে তিনুমাষ্টার বললো—আপনার বাপ-ঠাকুর্দার বরোজ হলেও এ আপনি নষ্ট করতে পারেন না একে বাঁচাবার অধিকার আমাদের সকলেরই। এ আমাদের পাঁচলা গ্রামের সম্পদ।

সবাই মিলে ওকে টেনে টেনে বরোজ থেকে বের করে আনলো। বাইরে বেরিয়ে বেরজো জামাই দেখলো প্রকাশ বোস তাদের বাগানের কামরাঙা গাছের আড়ালে গা ঢাকা দিয়েছে। এতদিনে ছোটবাবুকে চিনতে পেরে দাঁতে দাঁত ঘসলো বেরজো—আমায় গাছে চড়িয়ে মই কেড়ে নিয়েছ? জান্ থাকতে তোমায় আমি ছাড়বো না। আমার নাম বেরজো মণ্ডল, মরেছি তো এখনো পচি নি। দেখি তোমাকে কে বাঁচায়?

রূপসীর মন

প্রফুল্ল রায়

সেই রূপসী কুল মজাল। নন্দ ঢালীর ঘরে এসে জাতি-মান সব দিল।

সেই রূপসী।

গ্রামের নাম সোনা—রঙ, নদীর নাম উজানিয়া, আর নারীর নাম রূপসী।

গোরা গোরা বর্ণ, টানা চোখে বিজুরি খেলে, উছল দুই বুক। অঙ্গের দুটি কূল ছাপাছাপি করে বান ডেকেছে। নারী নয়, ভাদ্রের ভরা নদী।

রসিক সুজনেরা বলে, 'লয়ন মালীর মেয়ের রূপ বটে একখান। বাহারে রূপ।'

রূপ থেকেই রূপসী। আসল একটা নাম তার ছিল। সে নাম আজ আর কেউ জানে না।

উজানিয়া নদীর তীরে সোনারঙ গ্রামে মালীদের বাস। মালীদের কুলকর্ম হল ফুলের কাজ, শোলার কাজ। তাদের নিজেদের কথায়, সাজের কাজ। এককালে সাজের কাজের কদর ছিল। রাজার ঘরে আদর ছিল, বাদশার ঘরে মান ছিল মালীদের।

সেই এককাল আর চিরকাল থাকে না। সেই রাজাও নেই, সেই বাদশাও নেই, সেই কালও নেই। কিন্তু মালীরা আছে।

একালের মালীদের মান নেই, আদর নেই। মালীপাড়ায় অনেকেই সাজের কাজ ছেড়ে অন্য পেশা ধরেছে। কেউ ধরেছে লাঙল জোয়াল, কেউ হয়েছে মাঝি, আবার কেউ উজানিয়া গ্রাম পাড়ি দিয়ে শহরে বন্দরে চলে গিয়েছে। কুলকর্ম ছেড়ে নানান পেশায় অনেকেই জাতি দিয়েছে।

মালীদের সেই সুদিন নেই, মান নেই। কিন্তু অভিমান আছে।

মালিপাড়ার সবচেয়ে পুরানো মানুষ নয়ন মালি। বুড়ো নয়ন বলে, 'সে কালই নাই। রাজা বাদশা নাই। এখন দুর্দিন। তবু আমাগো জাতিই ভিন্ন। আমরা শিল্পীর জাতি। ছ্যাঁচড়া মানুষ আমাগো মম্ম কি বুঝব! বুঝত রাজা বাদশারা, বুঝত বড় বড় সদাগররা। দুই হাত ভইরা যারা মোহর দিত। কিন্তুক সেই সুদিন আর নাই।'

বুড়ো নয়ন আক্ষেপ করে।

রোদে হাত পা সেঁকতে সেঁকতে মাঝে মাঝে অভিসম্পাত দেয় নয়নমালী, 'কুলকম্ম যারা ছাড়ছে, তারা বিজাত কুজাত। তাগোর (তাদের) ধম্ম নাই, পরকাল নাই। সাজের কাজের জন্য আমাগো পিথিমিতে আসা। সেই কাজ না করলে অপরাধ লাগে। অপরাধের ভোগ ভুগব ধরমনাশারা।'

আজও সাজের কাজ ছাড়ে নি নয়নমালী। গঞ্জ বন্দরে সাজের কাজ বিকোয়

না। তবু অভ্যাসবশে ফুল দিয়ে কেয়ূর কঙ্কন বানায়। অঙ্গদ কুণ্ডল বানায়। শোলা কেটে কেটে মুকুট চাঁদমালা সাজায়।

নয়নমালীর মেয়ে রূপসী।

সেই রূপসী, যে কূল মজিয়েছে। নন্দ ঢালীর ঘরে এসে যে জাতি মান দিয়েছে।

রূপসীর রূপের ব্যাখ্যান মালী পাড়া পেরিয়ে উজানিয়া নদী পাড়ি দিয়ে কোথায় কোথায় চলে গিয়েছে। এমন রূপ নাকি রাজার ঘরে নেই, এমন রূপ বাদশার ঘরে মেলে না।

সেই রূপসী কাঁখে মাটির কলস নিয়ে নদীর ঘাটে চলেছে। সুঠাম চিকন মাজায় রাঙা বাহারে শাড়ি কি বশই না মেনেছে! মাজা দুলিয়ে দুলিয়ে দুই চোখে ঠমক হেনে হেনে রূপসী চলেছে।

উজানিয়া নদীর কিনারে আরেক সারির মান্দার গাছ। তার একপাশে বউ ঝিদের ঘাট, আরেক পাশে মাঝি ঘাট।

মান্দার গাছের তলে সুজনের সঙ্গে দেখা। চন্দ্রমালীর পুত সুজনমালী। কুলকর্ম ছেড়ে সুজন মাঝিগিরি করে। উজানিয়া নদীর এপার ওপার সওয়ারি নৌকা বায়।

সুজনকে দেখে দুই ভুরু বাঁকল রূপসীর। চোখের তারা স্থির হল। মাজা খানা বাঁকিয়ে বলল, 'তোমারে পেত্যহ বলি। এ হয় না সুজন! তবু তুমি আশায় থাক।'

সুজন বলে, 'ক্যান হয় না! আমি তোমার স্বজাতি, মালীর ঝি রূপসী, তোমার মন দিয়েছি। ফিরাইয়া দিও না।'

রূপসী হাসে। হাসিতে যত বাহার, তত ধার। হাসির বাহার বড় মনে ধরে সুজনের, কিন্তু ধারটুকু বড় দুর্বোধ্য।

রূপসী বলে, 'তুমি বাপের কাছে যাও। বাপের কাছে মনের কথা কও।'

মুখখান বড় করুন দেখায় সুজনের। সে বলে, 'তোমার বাপ! আ আমার কপাল! আমি হইলাম জাতিনাশা, ধরমনাশা। সাজের কাজ ছেড়ে মাঝির কাজ ধরেছি। আমারে কি তোমার বাপ মেয়ে দেবে!'

রূপসী আর কিছু কয় না। মিটিমিটি হাসে। তারপর সুঠাম মাজা দুলিয়ে দুলিয়ে নদীর ঘাটে যায়। পিছন ঘুরে আর তাকায় না।

রসিক সুজনেরা বলে, 'রূপসীর রূপের বাহারই আছে, মন নাই।'

মান্দার গাছের তলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সুজন ভাবে, কথাটা বড় খাঁটি। আবার ভাবে, মন যদি থাকেই রূপসীর, সেই মনে কি আছে, একমাত্র রূপসীই জানে।

উজানিয়া নদীর পারে একটি একটি করে দিন যায়, মাস যায়, ঋতুচক্রের সময় পাক খায়। নদীতে জোয়ার-ভাটির লহর খেলে।

নদীতে জোয়ারের পর ভাঁটি। ভাঁটির পর জোয়ার। কিন্তু কিশোরী রূপসী যুবতী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই যে রূপের বান ডাকল; সেই বানে আর টান ধরল না। রূপ তার দিনে দিনে কলায় কলায় বাড়ে।

রসিক সুজনেরা বলে, 'এমন রূপ যে না দেখে, তার জনম বৃথা। এমন রূপ যে বা দেখে, তার বুকে বড় জ্বালা।'

সেই রূপসীর রূপ দেখে জনম যেমন সফল হল মুকুন্দর, বুকে তেমন জ্বালা ধরল।

বছর তিনেক আগে মালী পাড়া ছেড়ে উজানিয়া নদী পাড়ি দিয়ে শহরে বন্দরে চলে গিয়েছিল মুকুন্দ। এতদিনে সেই মুকুন্দ ফিরে এল।

তিন বছর আগে রূপসী ছিল কিশোরী। সে সব দিনে চিকন মাজায় তিন বেড় দিয়েও ভুরে শাড়ি বশ মানত না। বুকও এমন উছল ছিল না, বুক তখন ফুটিফুটি। চোখেও এমন বিজুরি খেলত না।

তিন বছর শহরে বন্দরে ঘুরে ঘুরে কত দেখেছে মুকুন্দ, কত জেনেছে, কত শুনেছে। তার পোশাকে অচেনা বাহার; তার কথায় অজানা ধ্বনি। শিষ দিয়ে দিয়ে সে ঘুরে বেড়ায়। তিন বছর শহরে বন্দরে ঘোরার গৌরবেই বুঝিবা মালী পাড়ার ঘরে ঘরে খাতির পায় মুকুন্দ, মান পায়। তার সাজের বাহারে, কথার বাহারে মালীরা বিস্ময় মানে।

তিনবছর শহরে বন্দরে ঘুরে ঘুরে কোনকিছুতেই আর বিস্ময় মানে না মুকুন্দ। সে যে অনেক শুনেছে, অনেক দেখেছে।

আশ্চর্য। সেই মুকুন্দ উজানিয়া নদীর পারে নগন্য মালীদের গ্রামে এসে বিস্ময় মানল।

শিষ দিতে দিতে নয়ন মালীর ঘরে এসেছিল মুকুন্দ।

একটা শোলা চেঁচেছুলে মুকুট বানাবার জন্য তৈরী করছিল নয়ন মালী।

মুকুন্দ বলল, 'এলাম গো নয়ন জেঠা, কেমন আছ?'

'কে রে, মুকুন্দা না? বস্ বস্।' একখান জলচৌকী সামনে এগিয়ে দিয়ে নয়ন মালী বলে, 'শোনলাম, তিনবছর শহরে বন্দরে কাটাইয়া আসলি! শহরে বন্দরে কি কাম-কাজ করিস?'

'আমার মনিহারী দোকান।' জলচৌকিতে জাঁকিয়ে বসে মুকুন্দ। জুত করে মনিহারী দোকানের ব্যাখ্যান শুরু করে, 'আমার দোকানে শখের জিনিস, বাহারের জিনিস, সব মেলে। গন্ধ তেল, গুলাব সেণ্ট্, পাউডার, স্নো,'—।

কত নাম যে বলে যায় মুকুন্দ!

কিছু তার বোঝে নয়ন মালী; বেশির ভাগই তার অজানা।

নিজের খুশিতেই বলে যায় মুকুন্দ। হঠাৎ খেয়াল হয়, তার কথায় নয়ন-মালীর কান নেই। মুকুন্দ থামে।

নয়নমালীর মুখখানা বেজার দেখায়। ক্ষুব্ধ স্বরে সে বলে, 'শেষতক

কুলকম্ম ছাড়লি! শহরে বন্দরে গিয়া জাতি-মান সগল দিলি। আমরা শিল্পীর জাতি, গুণী। সব তোরা ভুললি!'

নয়নমালীর বুকখান কাঁপিয়ে দীর্ঘশ্বাস পড়ে।

সিধা হয়ে বসে মনিহারী দোকানের গুণের ব্যাখ্যান শুরু করতে যাবে মুকুন্দ, এমন সময় রূপসী এল। ঠমকে ঠমকে তার চিকন মাজা দোলে। দেখে দেখে তো চোখ ফেরে না মুকুন্দর। চোখের তারা স্থির হয়ে যায়। এত শহর বন্দর ঘুরে জীবনের সেরা বিস্ময়টা দেখার জন্য উজানিয়া নদীর পারে মালীদের গ্রামেই যে আসতে হবে, এমন কথা কি তার কোন কালে মনে হয়েছে!

রসিক সুজনেরা বলে, 'রূপসীর রূপে ঝাঁপ দিলে দুই পাখা পোড়ে। পুড়লে বড় জ্বালা। আবার না পোড়াইয়া সুখ যে নাই!'

রূপসীর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কথাটার সত্যটা বড় বেশি করে মানে মুকুন্দ।

একসময় মুগ্ধ গলায় মুকুন্দ বলে, 'রূপসী না?'

রূপসী হাসে। বলে 'হ'।

বলেই আর দাঁড়ায় না রূপসী। সামনেই জলটুঙ্গি ছাঁদের ছয় চালা ঘর। ঘরের মধ্যে চলে যায় সে।

সেই শুরু। পরের দিন আসে মুকুন্দ। তারপরের দিন। তারও পর দিনের পর দিন নিয়মিত।

খালি কি নয়নমালীর জলটুঙ্গি ঘরেই আসে মুকুন্দ! রূপসীর পেছন পেছন উজানিয়া ঘাটে যায়, রবিফসলের চকে যায়, মালি পাড়ার এমাথায় ওমাথায় ঘোরে। নানান কথা কয়। শহর বন্দরের কথা। পরবাসের কথা। মনিহারী দোকানের কথা। কত যে কথা, তার লেখাজোখা নেই।

উজানিয়া নদী থেকে একটা খাল বেরিয়ে এসেছে। মালি পাড়াটাকে বেড় দিয়ে পশ্চিম মুখে সেটা চলে গিয়েছে। খালের নাম মাতানিয়া।

পশ্চিম আকাশটাকে নানান রঙে মাতিয়ে দিন চলেছে।

সাঁকোর মুখে রূপসীর সঙ্গে দেখা। মুকুন্দ শুধায়, 'গেছিলা কোথায় রূপসী।' রূপসী খালের ওপারে এক অনির্দেশ্য দিকে আঙুল বাড়ায়, মুখে বলে, 'হুই ওদিকে।'

মনে হয়, ওইদিকটা সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র চিন্তিত নয় মুকুন্দ। বলে, 'বুঝলা রূপসী, আমার মনিহারী দোকানের কত নাম! বাবু ভুঁইয়াদের মুখে মুখে আমার দোকানের নাম ঘোরে। আমার দোকানের পাউডার ইসেন্স না হইলে বিবিদের বদন ভার; দিনই চলে না।'

একসঙ্গে হাজার কথা কয় মুকুন্দ।

রূপসী অতল কালো চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মিটিমিটি হাসে। সেই হাসি, যে হাসিতে গ্রামের মানুষ সুজন মাঝি দিশা হারায়, আবার শহর বন্দরের মুকুন্দর ধন্দ লাগে।

মুকুন্দ বলে, 'হাস যে রূপসী ?'

'মন হয়।'

শহর বন্দরের মুকুন্দ এবার কথাখান সহজ করে বলে, এতদিন আমার মন বোঝ নাই মালীর ঝি ?'

রূপসী কথা কয় না। দুই ঠোঁটের ফাঁকে সেই হাসিখান নিঃশব্দে বেঁকে যায়। সুজনের মত মুকুন্দরও মনে হয়, রূপসীর হাসিতে যত বাহার, তত জ্বালা। খালের নাম মাতানিয়া নদীর নাম উজানিয়া, আর নারীর নাম রূপসী। মুকুন্দ ভাবে, মাতানিয়া খালে তল মেলে, বুঝিবা উজানিয়া নদীরও তল পাওয়া যায়। কিন্তু নদীর পারের নারীর তল মেলে না, কূল মেলে না। তিনবছর সোনারঙ গ্রাম ছেড়ে শহর বন্দরে রয়েছে মুকুন্দ। আর এই তিনবছরে কিশোরী রূপসী যুবতী এখন অগাধ অতল হয়ে যাবে, কোন কালে কি তার মনে হয়েছে ?

মুকুন্দ একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। রূপসীর মনখান বোঝার চেষ্টা করে। রূপসীর মন বোঝা কি সহজ কথা!

মুকুন্দ আবার বলে, 'মনের কথা কইলা না রূপসী ?'

'মনের কথা এখনও যে বুঝি নাই।'

হঠাৎ বড় রাগ হয় মুকুন্দর। রাগখান মাত্রা ছাড়ায়। মুকুন্দ বলে, 'মনের কথা তুমি ঠিকই বোঝ রূপসী। আসলে তোমার রূপের যত দেমাক, তত ঠেমাক, এই দেমাক তোমার ঘুচব।'

রূপসী কথা কয় না। মুকুন্দকে সাঁকোর মুখে রেখে চিকন মাজা নাচিয়ে নাচিয়ে মালী পাড়ার পথে নামে।

সেই কাল আর নেই। সেই রাজা বাদশারাই নেই ; সেই সুদিনই বা থাকে কেমন করে ?

হিজল আর মান্দার ফুলের সাজ বানাতে বানাতে বুড়ো নয়ন মালী পুরোনো দিনের কথা ভাবে। সেই দিনে এই দিনে কোন মিল নেই। বাপের মুখে শুনেছে, সাজের কাজে খুশী হয়ে রাজা বাদশারা সোনার মোহর দিত। জলের দেশ থেকে, বিলান দেশ থেকে সাজের কাজ শেখার জন্য কত মানুষ উজানিয়া নদীর পারে মালীদের এই গ্রামে আসত। হাতে রাঙা সুতা বেঁধে সাজের গুণী কারিগরকে গুরু মানত। সাধে কি আর নয়নমালী বলে আমরা শিল্পীর জাতি, গুণীর জাতি।

এখন দুপুর। রোদ জ্বলে। চরাচর জ্বলে। জলটুঙ্গি ঘরের পিছে মান্দার গাছের লাল ফুলগুলি জ্বলে। এমন সময় নন্দঢালী এল। অসংকোচে বলল, 'আমি আসলাম।'

ভুরুর ওপর একখান হাত তুলে রোদ ঠেকায় নয়ন মালী। বলে, 'কে বাপু তুমি ? তোমারে চিনি বলে তো মনে হয় না।'

'না, আমারে আপনি চিনেন না। নদীর ওইপারে আমাগোর বাস। আমার নাম নন্দ—নন্দঢালী।'

'আমার কাছে কি মনে কইরা আসছ; তাতো বুঝি না।'

এদিক সেদিক তাকিয়ে কিছুক্ষণ কি যেন ভাবে নন্দ। তারপর বলে, 'আপনি যদি ভরসা দেন, একখান কথা কই।'

'কথা না শুনলে ভরসা দেই কেমনে?'

'আপনের নাম আমি অনেক শুনছি। এই কালে আপনের মত সাজের কাজের কারিগর নাই।'

নন্দ ঢালীর কথার বাহারে নয়নমালীর মন খানা ভিজে, নরম গলায় সে বলে, 'সগলই বুঝলাম, কিন্তু আসল কথাখান তো কইলা না?'

'এইবার কই, আপনেরে আমি গুরু মানতে চাই। ছোট বয়স থিকা আমার সাজের কাজের গুনী হওয়ার সাধ। সাধখান আপনি মেটান।'

'কিন্তুক—' কেমন বিচলিত দেখায় নয়ন মালীকে। সে বলে,' কিন্তুক, তুমি যে ঢালী। নীচা জাতি—'

'গুনের আবার জাতি আছে নাকি? আপনি আমার হাতের কাজ দ্যাখেন। গুন না পাইলে খেদাইয়া দিবেন।'

'ঠিক ঠিক, আমারই ভুল হইছিল। কিন্তুক—'

'আবার কি?'

'তুমি ঢালীর পুত। কুলকম্ম ছাইড়া সাজের কাজ ধরলে তোমার স্বজাতিরা কইব কি?'

'ঢালীর ঘরে জন্মাইছি বইলা কি গুনী হওয়ার মানা আছে। যা দিনকাল, কে আর কুলকম্ম করে! কুলকম্মে ভাত নাই। আমরা ঢালী, ঢাকবাদ্য—বাজাইয়া পয়সা পাই না। পেটের ধান্দায় একেক মানুষ একেক পেশা ধরছে। নেশার দিকে কারো মন নেই, মনের সাধ মনেই মরে। সাধের দাম কানাকড়িও নাই। আমার সাধটা যদি মিটাতেই চাই দোষখান কোথায়?

'তুমি বড় খাসা কথা কও; খাঁটি কথা; বাহারের কথা। তোমারে আমি শিষ্য নিমু। আমার সব গুন তোমারে দিমু।'

'নয়নমালীর দুই চোখ আহলাদে ঝিকিমিকি খেলে। মনে মনে ভাবে, যে কাল পড়েছে, মালী পাড়ায় সাজের কাজের একটি মানুষও মিলবে না। মনের মত একটি শিষ্য জুটবে না। অথচ সাজের কাজের কাজীদের বিধি আছে, নিজের গুণ অন্যের মধ্যে রেখে যাওয়া। কিন্তু একালে গুনের উত্তরাধিকারী মেলা কি সহজ কথা।

হক বিজাত, নন্দ ঢালীকেই শিষ্য মানল নয়নমালী।

পরের দিন হাতে রাঙা সুতো বেঁধে, নতুন কাপড় পরে নয়নমালীর হাতের গুণ নেবার পালা শুরু করল নন্দ ঢালী।

'নয়নমালীর একখান মাত্র জলটুঙ্গি ছাদের ঘর। সেই ঘরের পাশে একখান দোচালা ঘর উঠল। ক্যাচা বাঁশের বেড়া। ছ্যাঁচা বাঁশের চাল। নন্দ ঢালী থাকবে।

মালী পাড়ার এমাথায় সেমাথায় কথাটা ছড়িয়ে পড়ল। এতদিন পর নয়নমালী মনের মত এক বিজাতি শিষ্য পেয়েছে।

মালী পাড়ার বুড়োরা এল সকালে। সকলে এক বাক্যে বলল, 'এই কি করলা বুড়ামালীর পুত। স্বজাতির মধ্যে শিষ্য জুটল না। বিজাতিরে শিষ্য নিয়া জাতি দিতে চাও।'

নয়নমালী বলে, 'গুনের আবার জাতি কিরে? বিজাতি শিষ্য নিয়ে আমি জাতি দিলাম। আর কুলকম্ম ছাইড়া তোরা জাতি দিস নাই?

মালী পাড়ার যুবারা এল বিকালে।

জলটুঙ্গি ছাদের ঘরের পাশে একসারি মান্দার গাছ। ঝিরি ঝিরি মান্দার পাতার ফাঁক দিয়ে বিকালের রাঙা রোদ এসেছে। উঠানে বসে শোলা দিয়ে পানমুকুট, হিমমুকুট, রানীমুকুট—নানান ঢঙের মুকুট বানান শেখাচ্ছিল নয়নমালী। বুড়া বয়সে মনের মত শিষ্য পেয়ে উৎসাহ আর ধরে না। নিজের সব গুণ নন্দকে দিতে দিতে মনে কি আহলাদই না হয় নয়নের। এককালের মানুষের গুণ এমন করেই তো পরের কালের মানুষ পায়।

গ্রামের যুবারা এসেছে। সুজন মালী এসেছে; শহর বন্দরের মুকুন্দ এসেছে। সকলে একদৃষ্টে চেয়ে চেয়ে দেখছে।

কালো কুরূপ নন্দ ঢালী; খাড়া খাড়া চুল; দীর্ঘ শীর্ণ দুই হাত, শুকনা কর্কশ মুখ। এমন কুরূপ যে চোখকে দুঃখ দেয় যা। কিছুক্ষণ তাকাবার পর পরে চোখ বুজে আসে।

যুবারা বলে, 'তোমার নয়া শিষ্য দেখতে আসলাম গো লয়ন জেঠা।'

'দ্যাক্ দ্যাক্ লয়ন ভইরা দেখ—' একটু থামে নয়নমালী। দুই চোখ তার চকমক করে। তারপর বলে, 'নিজের গুণ অন্যেরে না দিতে পারলে মরেও সুখ নাই। নন্দ আমারে বাঁচাইল। ও আমার মরা গাঙে বান আনল।'

শহর বন্দরের মুকুন্দ বল্লে' "এইটা তুমি ভাল করলানা লয়ন জঠো। আমাগোর মধ্য থিকা শিষ্য নিলে ভাল করতা।"

দুই চোখে যেন আগুন জ্বলে নয়ন মালীর। সে বলে, 'কিসে ভাল হয় কিসে মন্দ হয়, তোর কাছে শিখতে হইব না কি রে মুকুন্দা। যা যা, আমার ঘর ছাড়। তোদের কারো সঙ্গে আমার সম্পক্ক নাই। ধরমনাশা, জাতিনাশার দল—'

মুকুন্দ, সুজন মালী—মালীপাড়ার যুবারা চলে যায়।

কোন দিকে দৃষ্টি নেই নন্দ ঢালীর। মন পরান একাকার করে ফুল আর শোলা দিয়ে জরলী মুকুট বানায়, অঙ্গদকুণ্ডল বানায়। সাজের কাজের যত গুণ, সব সে উজাড় করে নেয় নয়ন মালীর কাছ থেকে।

বড় বাহারের নেশায় পেয়েছে নন্দ ঢালীকে।

রসিক সুজনেরা বলে, 'রূপসীর রূপে পরান ঝলসায়; তবু পরান না পুড়াইয়া সুখ নাই।'

আশ্চর্য! যে রূপের ধ্যানে মালীপাড়া বিভোর, যে রূপের ব্যাখ্যান উজানিয়া নদী পাড়ি দিয়ে কোথায় কোথায় ছড়িয়ে পড়েছে, রূপসীর সেই রূপের দিকে একবারও তাকায় না নন্দ ঢালী।

প্রথম প্রথম খেয়াল করেনি রূপসী। খেয়াল যখন করল, অবজ্ঞা শুরু করল। রূপের দেমাকে দুই ঠোঁট তীব্র ভাবে বেঁকে গেল। তবু মানুষটার বিকার নেই, কোনদিকে দৃকপাত নেই।

অবজ্ঞাই তো মনের শেষ কথা নয়। অবজ্ঞার পর মনে জ্বালা ধরল রূপসীর, বড় বিষম জ্বালা। এমন পুরুষ কোন কালে দেখেনি রূপসী। চিরকাল রূপের ধ্যানের কথাই সে শুনেছে। মুগ্ধ যুবার স্তুতি শুনতে শুনতে দিনে দিনে তার দেমাক বেড়েছে। এতদিনে সেই দেমাকে আঘাত লেগেছে রূপসীর।

রূপসী ভেবেই পায় না, কালো কুরূপ নন্দ ঢালী কিসের অহংকারে তার রূপের দিকে তাকায় না পর্যন্ত?

প্রথমে ছিল অবজ্ঞা, তারপর জ্বালা। শেষ পর্যন্ত আকুল, অস্থির হয়ে উঠল রূপসী।

সিধা একদিন নন্দ ঢালীর কাছে এসে বসল রূপসী। বলল, 'মানুষজন দ্যাখ না পরবাসী কালাচাঁদ!'

কালো কদাকার নন্দ; উজানিয়া নদীর ওপার থেকে এসেছে। তাই বুঝি রূপসী রঙ্গ করে বলল, 'পরবাসী কালাচাঁদ!'

বাঁশের সরু মালায় কাঞ্চন ফুল গেঁথে মুরলী বানাতে বানাতে তন্ময় হয়ে গিয়েছিল নন্দ ঢালী। চমকে উঠল। বলল, 'আমারে কিছু কইলা?'

'না। কইলাম ঐ আকাশেরে।'

'ও।'

বাঁশের সরু মালায় আবার ফুল গাঁথতে শুরু করে নন্দ ঢালী। কোনদিকে তার দৃষ্টি নেই। মন নেই।

এতকাল মনের মধ্যে জ্বালা ছিল রূপসীর। এবার সেই জ্বালা সর্বঅঙ্গে ছড়িয়ে পড়ল। বিষম আক্রোশে অঙ্গ মন জরজর হয়ে উঠল।

কালো কুরূপের অহংকার রূপসী ঘুচিয়ে দেবে।

রূপসী লাফিয়ে উঠে পড়ল। আশ্চর্য! তবু খেয়াল নেই নন্দ ঢালীর।

সেই রূপসীকে এখন আর দেখা যায় না। সেই রূপসী। সে দুই চোখে বিজুরী খেলিয়ে, চিকন সুঠাম মাজা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে, গোর রূপের ঝিলিক হেনে হেনে মালী পাড়াটাকে মাতিয়ে তুলত, জলটুঙ্গি ঘর আর উঠান ছাড়া এখন আর সে কোথাও যায় না।

রসিক সুজনেরা বলে, 'কালো রূপেই মজলো বুঝি রূপসী। রূপসীর পছন্দে বলিহারি যাই।'

রূপসী সম্পর্কে মালীপাড়ায় সবচেয়ে বেশি উৎসাহ সুজন মালী আর শহর বন্দরের মুকুন্দর।

একদিন দুপুরে রোদ যখন জলটুঙ্গি ঘরের চালে ঝকমক করে, তখন মালী পাড়ার বুড়া যুবাদের সঙ্গে নিয়ে সুজন আর মুকুন্দ আবার এল।

মুকুন্দ বলল, 'আমরা না হয় কুলকম্ম ছাইড়া জাতি দিয়েছি। কিন্তুক তুমি কি করতে আছ লয়ন জেঠা—'

বিমূঢ় মুখে কিছুক্ষন তাকিয়ে রইল নয়ন মালী। বলল, 'কী কও তোমরা।'

'যা কইতে চাই, তা তুমি বোঝ লয়ন জেঠা।'

'কী বুঝি ?'

এবার একজন বুড়া বলল, 'লয়নভাই, বিজাতিরে শিষ্য মানছ। আমাগোর আপত্ত (আপত্তি) নাই। কিন্তুক মেয়ে তারে দিলে যে জাতি যায়, কুল মজে। স্বজাতির ঘরে যুগ্য (যোগ্য) ছেলে ছিল না ?

অসহায়, করুন স্বরে নয়নমালী বলে, 'তোমরা কি কও, কিছুই যে বুঝি না, জলটুঙ্গি ঘরের কপাট ধরে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে রূপসী। সব শুনছে। কী এক কৌতুকে মিটিমিটি হাসে রূপসী। চিরদিনের দুর্বোধ্য রূপসীর মনে কী আছে কে জানে ?

সুজন চেঁচায়, 'এর বিহিত চাই।'

মুকুন্দ গর্জে, 'এমন অধম্ম মালী পাড়ায় চলব না।'

জলটুঙ্গি ঘরের পাশেই নন্দ ঢালীর ক্যাঁচা বাঁশের চালের, ছ্যাঁচা বাঁশের বেড়ার ঘর। সেই ঘরের বারান্দায় থরথর কাঁপে নন্দ ঢালী, সেই কাঁপ আর থামে না। সহসাই ঘটনাটা ঘটে যায়।

মালীপাড়ার মানুষ গুলিকে হতবাক করে, এতজোড়া চোখ নিষ্পলক করে দিয়ে জলটুঙ্গি ঘরের কপাট ছেড়ে সিধা নন্দ ঢালীর ঘরে আসে রূপসী। কালো কুরূপের অহংকার ঘুচাবার এমন সুদিন কোনকালে আর বুঝি আসবে না। ভাবে, আর মিটি মিটি হাসে রূপসী।

রূপসী বলে, 'দেখ তোমরা, সগলে দেখ। কুলমান সব খোয়াইলাম, জাতি দিলাম। দ্যাখ দ্যাখ, লয়ন ভইরা দ্যাখ।'

রূপসী বলে। আর মালীপাড়ার সকলে অবাক হয়ে শোনে।

গ্রামের নাম সোনারঙ, নদীর নাম উজানিয়া, নারীর নাম রূপসী। এইটুকুই সবাই জানে। কিন্তু রূপসীর মনে কি আছে, মালীপাড়ার কেউ জানে না। শুধু চরাচর জানল ; সেই রূপসী কুল মজাল। নন্দ ঢালীর ঘরে এসে জাতি মান—সব দিল।

সেই রূপসী।

এক নাম

প্রিয়তোষ মুখোপাধ্যায়

রমাকে এনে বৃন্দাবন কালিঘাটে সিঁদুর পরিয়ে তারপর গ্রামে ওর মার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিল। বলেছিল ও নিজে গিয়ে সময় মত নিয়ে আসবে ওর হাসপাতালের কোয়াটারে। চিন্তার কোন কারণ নেই। কিন্তু রমার শরীরের অবস্থা যা হচ্ছিল তাতে ওর চিন্তা বাড়ছিল। গ্রামের লোক কানাঘুসো বাড়িয়েছে তাই ও আর পুকুরে চান করতে আসতে পারে না আজকাল। মাসী পিসী খুঁড়িমারা টীকা টিপ্পুনি কেটে রমার মাকে প্রশ্ন করে 'হ্যাঁরা গয়লা বৌ, তোর উড়ো জামাইকে ধরলে আমাদের বাপু একটু দেকাস কিন্তুক। দেখাবে কাকে। সেই গাড়িতে চড়িয়ে দিয়ে বালিগঞ্জ স্টেশন থেকে বৃন্দাবন আট মাস আগে যে চলে গেল তারপর আর কোন খবর নেই। রমা ভাবছিল কি করে কি উপায় করবে। দশমাস পেরিয়ে গেল আর কোন ভরসায় অপেক্ষা করবে। বৃন্দাবনের কি সময়ের কথা খেয়াল নেই? গয়লা বৌয়ের সুনাম নেই তাই লোকে 'মেয়ের ব্যাপারটা' হেসে হেসে আলোচনা করে যেন ওটা ওদের ঘরের স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু রমা জানে ওর বাবা বেঁচে থাকলে ওর অনেক ছোট বেলায় বিয়ে হত, এমন হত না। রমা ঠিক করল ও কলকাতায় যাবে। মা সঙ্গে আসতে চাইল, রমা মানা করল কারণ বুড়ো মানুষ এতটা পথ হেঁটে তারপর ট্রেন ধরা সহ্য হবে না। তাছাড়া রমা যদি ওখানে রয়ে যায় তাহলে ফিরবে কার সঙ্গে। জামাই খুব ব্যস্ত, পেঁছে দিতে পারবে না।

দুপুর বেলা রমা বালিগঞ্জ স্টেশনে নামল। এটা ওর পরিচিত স্টেশন। আগে এইখানে নেমে ও কসবায় বোসপুকুরে ব্যাগের কারখানায় কাজ করতে যেত। বালিগঞ্জ স্টেশনেই দেখা হত বৃন্দাবনের সঙ্গে।

বৃন্দাবনের সঙ্গে দেখা হল না। আন্দাজে অনেক খুঁজে ও টালিগঞ্জের হাসপাতালে গিয়েছিল যেখানে বৃন্দাবন বলেছিল কাজ করে। সেখানে জিগ্যেস করে করে কোয়ার্টারে গিয়ে পেঁছাল। বলেছিল ডেলিভারির সময় এমন কেবিনে ভর্তি করে দেব যে আচ্ছা আচ্ছা বন্ধুরা সেখানে ঢুকতে পায় না। রমা শুধু কয়েকটা মাস গ্রামে গিয়ে ওর মার কাছে থাকুক। বৃন্দাবন অনেক বুঝিয়ে রমাকে বালিগঞ্জ স্টেশন থেকে সেদিন লক্ষ্মীকান্তপুরের গাড়ীতে ভীড়ের মধ্যে ঠেলে তুলে দিয়েছিল। পেটে একটা চিন্‌চিন ব্যথা ঘুরপাক খাচ্ছে। রমা হাসপাতালের ফোর্থ ক্লাস স্টাফ কোয়ার্টারে গিয়ে পেঁছল। এক জায়গায় গেলাসে করে কিছু লোক জল খাচ্ছে। ওদের তাকান এবং উগ্র গন্ধ নাকে আসতে রমা বুঝল জল নয়। পেটের ব্যথাটা বাড়ছে। জায়গাটা কি নোংরা। গ্রামের খোলা জায়গার তুলনায় ভীষণ বন্ধ—এইখানে

বৃন্দাবন থাকে। একটা নালা পেরিয়ে এগিয়ে খোঁজ করতে, এক মেয়েছেলে কি যেন করছিল, তাকিয়ে দেখল। কাকে খুঁজছ? বিন্দাবন! মেয়ে লোকটি ভ্রূকুঁচকে রমার আপাদমস্তক জেনে নিয়ে হেসে উঠল। বিন্দা? কি কাম?

—দরকার আছে।

—দরকার আছে বললে চলবে না—আমি বিন্দার শাদি করা বৌ আমাকে বলতে হবে তোর ধামা কে বাঁধিয়েছে? বিন্দা? মেয়ে লোকটি কটমট করে তাকাল। রমা মেয়েলোকটিকে সব কথা বলে কাঁপতে লাগল। মেয়েলোকটি বলল, বিন্দা এখন এখানে থাকে না, ও রামু আহিরের বৌকে নিয়ে বাইরে থাকে। চুরির জন্যে সাসপিন হয়ে আছে। রমা আবার বালিগঞ্জ স্টেশনে ফিরে এল। পা কাঁপছিল ওভার ব্রিজের সিঁড়ি দিয়ে ওঠবার সময়। পেটের ব্যথাটা বাড়ছে ক্রমশ। সামনের দৃষ্টি সব ঘোলাটে হয়ে যাচ্ছে। বসে পড়ল রমা। বিন্দু-বিন্দু ঘাম বিজ বিজ করে সারা শরীরে ফুটে উঠল। গলাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল। ঠোঁটে জিভ ঠেকাল—থুতু আঠা হয়ে গেছে। গাড়ির শব্দ শুনতে শুনতে আর শুনতে পেল না। আবার শুনতে পেল বহু কণ্ঠ এক সঙ্গে বলছে। সরে যান হাওয়া আসতে দিন, মাথা ঘুরে গেছে। মাথা ঘুরে গিয়েছিল সত্যি। রমা চোখ মেলতে দেখতে পেল অনেক লোক ঘিরে ওর দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। রমার চুলে, মুখে জল। কেউ জল দিয়েছে। মুখে জলের ছিটে দিয়েছে। মুখে জলের ছিটে দিয়েছে পাড়ার একটি মেয়ে, কারণ মেয়েটির হাতে এখনও একটা গেলাস রয়েছে। বলল, কি সাহস! এই অবস্থায় একা কেউ রাস্তায় বের হয়। অ্যামবুলেন্স পাওয়া যাবে না—কেউ একটা ট্যাক্সি ডেকে দিন—এক্ষুনি হাসপাতালে ভর্ত্তি করতে হবে।

—না-না আমায় লক্ষ্মীকান্তপুরের গাড়িতে···। বলতে বলতে রমা যন্ত্রণায় আর কথা বলতে পারল না, মেয়েটির হাত চেপে ধরল। মেয়েটির নাম অনিতা। বছর কুড়ি বয়স, রমার চেয়ে বয়সে বড়ই। অনিতা আগে থেকেই রমাকে লক্ষ্য করছিল, ওর বৌদির ডেলিভারির দিন ঠিক এমনই অবস্থা হয়েছিল। ভাবছিল বৌটা কচি; সঙ্গে কোন পুরুষ মানুষ মানুষ নেই, এই অবস্থায় রাস্তায় না কিছু হয়। জোর ট্যাকসি চালাতে বলল অনিতা। যতক্ষনে ট্যাকসি ডেকে আনল একটি ছেলে, ততক্ষনে যারা রমাকে সাহায্য করবার জন্যে জড়ো হয়েছিল একে একে যে যার কাজে চলে গেল। রমা ধীরে ধীরে বৃন্দাবনের সব কথা অনিতাকে বলল শুধু বৃন্দাবনের নামটা বলল না। ট্যাকসিতে অসাড় হয়ে রমা শুয়ে রইল। অনিতা ভেবেছিল অন্য লোকেদের মত ও মেয়েটিকে ট্যাকসিতে তুলে দিয়ে দুএকজনের সঙ্গে হাসপাতালে পাঠিয়ে দিয়ে নিজে বাড়ি চলে যাবে কিন্তু রমার দীর্ঘ ঘটনা শুনে যা ভেবেছিল তা করতে পারল না। রমা একা কেন সাহস করে এই অবস্থায় দেশ থেকে কলকাতায় ছুটে এসেছিল ভাবতে ভাবতে অনিতা একটা চিঠি বার করে ছিড়ে

বাইরে ফেলে দিল। হাওয়ায় টুকরোগুলো রাস্তায় ছড়িয়ে পড়ল। চিঠিটা অনিতাকে দিয়েছিল ওর গানের মাস্টারমশাই পীযূষ চক্রবর্তী। অনিতা মাস্টার মশাইয়ের মিউজিক কলেজে গান গায় এবং মাস্টার মশাই প্রাথমিক ছাত্রীদের গানের ক্লাস মাঝে মধ্যে অনিতাকে নিতে দেন। আজ সকালে অনিতা মাস্টার মশাইকে হাওড়া স্টেশনে সিঅফ করতে গিয়েছিল। মাস্টার মশাই বম্বেতে কি কাজে যাচ্ছেন। ছবির কাজ হয়ত। একটা মিউজিক কনফারেন্সও পুনাতে আছে। মাস্টার মশাই অনিতাকে বলেছিলেন তুমি আর আমি চল বম্বে যাই—সুবিধে থাকলে আর ফিরব না। এই নিয়ে অনিতার বাড়িতে অশান্তি। অনিতা বলেছিল মাস্টার মশাই এর সঙ্গে মিউজিক কনফারেন্সে যাব তাতে দোষ কি! কিন্তু মনটা বড় দোটানায় ছিল। ব্যাগে অনেক টাকা ছিল। মাস্টার মশাই যদি বেশী অনুরোধ করেন তাহলে হয়ত বম্বের ট্রেনে উঠে পড়বে এমন একটা দুর্বলতা নিয়ে হাওড়া স্টেশনে গিয়েছিল অনিতা। মাস্টার মশাই শ্রীলেখা দিদিকে নিয়ে বম্বের গাড়িতে উঠলেন। মিউজিক কনফারেন্সে নিজের একজন ছাত্রী নিয়ে ত যেতেই হয়। আমি ফিরে আসব। অনিতাকে গাড়ি ছাড়ার সময় মাস্টার মশাই বলেছিলেন।

অনিতা জানত মাস্টারমশাই বিপত্নীক এবং বয়স চল্লিশের নীচে। অনিতার কথা শুনে রমাদি খিলখিল করে হেসেছিল। রমাদি হল ওই স্কুলের পুরানো ছাত্রী। —চল্লিশের নীচে। পঞ্চাশের ওপরে, নীচে নয়। বুঝেছ? বলে রমাদি হেসেছিল।

মাস্টার মশাই এর সঙ্গে শ্রীলেখাদির বম্বে যাওয়াটা কোন মতেই অস্বাভাবিক নয়। একজন ছাত্রীও কনফারেন্স অ্যাটেন্ড করবে না! রমাদি বলেছিল, শ্রীলেখার যাওয়াটাই ত স্বাভাবিক। হি-হি-হি। আমি কি বলেছি অস্বাভাবিক। হি-হি-হি। এবার কিছু হলে আমি ঝক্কি নেব না। হি-হি-হি।

অনিতা রাগ করেছিল। লোকে সাধে তোমায় মাথা খারাপ বলে, অত হাসির কি আছে।

হি-হি-হি মাস্টার মশাইয়ের বাড়ির ঠিকানা জানিস? আমি জানি ঘুরে আয় এই বেলা। মাস্টার মশাই ও'র বাড়িতে কারুকে কোনদিন নিয়ে যায় না।—মানে ও'র প্রিয় ছাত্রীদের। —আহা রে। এরপর মাস্টারমশাই আগামী বছর নিশ্চয় তোকে বড় সংগীত সম্মেলনে নিয়ে যাবে। আমার যদি বিয়ে হয় কোন দিন, তাহলে আমার নাতনীকেও ভবিষ্যতে মাস্টার মশাই নিয়ে যাবেন। হি হি-হি…।

মাস্টার মশাইয়ের বাড়িটা কেন ঘুরে আসতে রমাদি অনিতাকে বলছে অনিতা বুঝল না। বাড়িতে কি মাস্টার মশাইয়ের গোপনে বিবাহিত বৌ আছে—বা অন্য কিছু গোপনীয়! ঠিকানা নিয়ে অনেক ঘুরে অনেকের কাছে জিগ্যেস করে অনিতা মাস্টার মশাইয়ের বাড়ি খুঁজে পেল। বাইরে নাম রয়েছে সঙ্গীতজ্ঞ

পীযূষ চক্রবর্তী। ট্যাকসি জোরে ছুটছিল তাই বার বার হাওয়ায় চুল উড়ে কপালের নীচে পড়ছিল অনিতার। আজকের সারাদিনের ঘটনার চিত্র কে যেন পরপর মনের ওপর ফেলে চলেছে। মাস্টার মশাইয়ের দরজায় বেল টিপতে একটি মেয়ে দরজা খুলে দিল। অনিতা ভেবেছিল বৌ, কিন্তু না, বৌ না। এক দৃষ্টিতেই ধরা পড়ল বৌ নয়। আর একটি মেয়ে মুখে ডট্ পেন ঠেকাতে ঠেকাতে এসে পেছনে দাঁড়িয়ে অনিতার দিকে তাকিয়ে দেখল। এ অনিতার চেয়ে কিছু ছোটই হবে। দুজনের দৃষ্টিতেই কেমন সন্দেহের আতঙ্ক। বলল, না বাবা বম্বে গেছেন কবে ফিরবেন জানি না। বসতে বলল না, বাড়তি কথা বলল না মাস্টার মশাইয়ের মেয়ে দুটো। ছোট মেয়েটা পড়া শোনা করে। অনিতা বুঝতে পারল। মাস্টার মশাই এর এত বড় বড় মেয়ে! মাস্টার মশাইয়ের কালো পাট পাট চুল, সরু গোঁফ রিমলেশ চশমা সিল্কের পাঞ্জাবি—কাঁচি পেড়ে কোঁচান ধুতি দেখলে ত চল্লিশ উত্তীর্ণ হয়েছে বলে মনে হয় না! কোন দিন ঘুনাক্ষরে জানতে দেন নি যে ও'র বিবাহযোগ্য মেয়ে আছে তার মধ্যে একজনের বয়স অনিতার চেয়ে বেশী। বরং মাস্টার মশাই এমন ভান করেন যেন বছর চার পাঁচ আগে তার স্ত্রী মারা যায় আর ক'বছর আগেই তাঁর বিয়ে হয়েছিল। অদ্ভুত! ওই মেয়ে দুটোর মুখ ভেসে উঠল অনিতার চোখের সামনে। ওরা অনিতার দিকে যে ভাবে তাকাচ্ছিল যেন অনিতা ওদের কিছু অনিষ্ট করতে এসেছে। অনিতা অন্যমনস্ক হয়ে গেল। সরু দড়ির ওপর এতদিন ব্যালেন্স করে হাঁটছিল, আজ পড়ে গেল। বালিগঞ্জ স্টেশনে সারাদিনের অবসাদ নিয়ে কালিঘাটের গাড়ি ধরবে বলে এসে রমা এই মেয়েটির বিপদের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ল। না পড়লেই ছিল ভাল। রমাদির মাথা খারাপ নয়, মাথা খারাপ আমাদের। এই রমা নামে গ্রামের মেয়েটিরও। মাস্টার মশাই অনিতাকে অনার্স পরীক্ষা দিতে দিলেন না বলেছিলেন সঙ্গীত হল সাধনা। একটা ঠিক কর। তোমার মধ্যে আমি দেখতে পাচ্ছি প্রচুর সম্ভাবনা যা হেলায় হারানো হায় না। আমি হারাতে পারব না। কথাগুলো মনে পড়ল অনিতার। অনেক কথা মনে পড়ল।—একটা হাসপাতাল রমাকে ভর্ত্তি করল না। কোন উপায় নেই। অনিতা ট্যাকসির টাকা দিল। দ্বিতীয় একটি হাসপাতালে মেটারনিটি ওয়ার্ডে একটা ভিআইপি বেড ঠিক করে দিল একজন ক্লার্ক। অবশ্য তার জন্যে খরচা লাগল। উপায় ছিল না অনিতার। ওকে ভর্ত্তি করে ও বাড়ি চলে যাবে। ক্লার্ক জিগ্যেস করল ওর ঠিকানা বলুন। ঠিকানা যেমন শুনেছিল অনিতা বলল। ক্লার্ক খাতা খুলে লিখে নিল। ছেলের বাপের নাম কি?

অনিতা থতমত খেয়ে গেলো। রমাকে অজ্ঞান অবস্থায় স্টেচারে নিয়ে গেছে। ওর কাছে বাপের নাম ত জিগ্যেস করা হয় নি। —বাপের নাম! অনিতার মুখ লাল হয়ে উঠল তারপর বলল, লিখুন, পীযূষ চক্রবর্তী।

প্রীতিশের স্বপ্ন

বলরাম বসাক

জারুল বনের রূপ কখনো স্বচক্ষে দেখেনি প্রীতীশ। শুনেছিল মাসতুতো ভাই রঙ্গনের কাছে। সুন্দরবনে হাঁস মারতে গিয়েছিল ও আর ওর বড়লোক বন্ধু দীপন, যে কিনা ডনবসকো থেকে সিনিয়র কেম্ব্রিজ পাশ করে সেন্ট জেভিয়াস্ কলেজে ভর্তি হয়েছে। আকাশে সন্ধ্যেবেলা এক ঝাঁক হাঁস উড়ে যায়। সাদা ঝলমলে হাঁসের মেলা, স্তিমিত লাল রোদে কোন কোনটির ডানা যেন সোনার মনে হয়। সন্ধ্যেবেলার ছাদে দাঁড়িয়ে ওপাশের বাড়ি থেকে ঋতা এবাড়ির প্রেমাকে ডাকে, 'পমা, দেখবি আয়।—সাদা হাঁসের মালা দেখবি আয়। তাড়াতাড়ি আয়—'

ঋতা যেভাবে চেঁচিয়ে প্রেমাকে ডাকে, প্রেমার ছোড়দা প্রীতিশ ছটফট করে ছাদে উঠবার জন্যে। ছাদে উঠে দেখতে ইচ্ছে করে সেই হাঁসগুলো কী ভাবে সার বেঁধে উড়ে যাচ্ছে কলকাতার পাশ দিয়ে, সুন্দরবনের দিকে। ড্রেসিং টেবিলের আয়নায় তখন প্রেমার মিষ্টি চেহারাটা অল্প স্বল্প বাঁদিক ডানদিক হেলে পড়ছিল। ঠোঁটে হালকা মেরুন—লাল রঙ লাগছিল। আচমকা সব নড়ে উঠল ঋতার ডাকে, সব কেঁপে উঠল, চমকে উঠল, ঝলকে উঠল, খলখল কলকল ঝরনার শব্দ করে, প্রেমা ছুটল ছাদের দিকে। প্রীতিশের ইচ্ছে করে ছাদে ছুটে যেতে। দেখবার জন্যে।—সাদা হাঁস আর তার সাথে আড় চোখে ঋতাকে। কিন্তু যাওয়া যায় না কি ওভাবে? হ্যাংলার মত।

প্রীতীশের ছাদে প্রীতীশ যাবে, ঋতাদের ছাদে ঋতা যাবে, এতে কি বলার থাকতে পারে। ঋতাদের ছাদে ঋতা যেতে পারলে প্রীতিশদের ছাদে প্রীতীশের যাবার বাধা থাকবে কেন? তবু কোথায় যেন একটা বাধা রয়েছে প্রীতীশের। যাওয়া যায় না। ঋতা তো ছাদে প্রেমাকে ডেকেছে। ঠিক সেই মুহূর্তে প্রীতীশের ছুটে যাওয়াটা অশোভন। ঋতা তো আর প্রীতীশকে ডাকে নি। প্রীতীশের ছোট বোনকে ডেকেছে। সেখানে সে সময় প্রীতীশ ছুটে গেলে, এমনি এমনি অন্য অজুহাতে ছুটে গেলে নানা ধরনের হাবিজাবি কথা হবে। তবে সাদা হাঁসগুলো দেখতে ইচ্ছে করছিল প্রীতীশের।

হায় হাঁস, হাঁসের মালা। পায়ের ওপর পা রেখে বসে বসে প্রীতীশ ইকনমিক্সের পাতা ওলটায়। সামনে কলেজের বাৎসরিক পরীক্ষা। এক সময় টেবিলে বই ফেলে রাখল। পা নামিয়ে রাখল। তারপর উঠে বিছানার ওপর নিজেকে ধপাস্ করে ছুড়ে দিল। হায় হাঁস, সোনালি হাঁস। হায়রে সোনালি হাঁসের মালা। প্রেমা ছাদে উঠে দেখছে নীল আকাশে, আপেলের মত গোল গোল গুচ্ছে গুচ্ছে

মেঘের নীচে দিয়ে, থোকা থোকা সাদা ধবধবে ফিরেনথেমাম—। দেখতে দিল না।

ঋতা যদি এই সময় প্রেমাকে না ডাকত প্রীতীশ দিব্যি উঠে যেত ছাদে। দেখতে পারত নিশ্চিন্তে, অবাধে আকাশের দিকে তাকিয়ে সোনার মুকুটের মত মেঘগুলোর তলায়, কোথায় যায় ঐ হাঁসগুলো—। কলকাতার ওপর দিয়ে নাকি যায় না। পাশ দিয়ে যায়। সুন্দরবনের দিকে যায়। সুন্দরবনের কোথায় যেন এক বিশাল জারুলবন। বেগুনী ফুলে আস্ত বনটা বেগুনী হয়ে থাকে। কোন খানে বনটা নীলাভ বেগুনী। যখন বেগুনী ফুল ফোটে তখন নাকি একটাও সবুজ পাতা থাকে না।

ঐরকম একটা জারুল বনের ভেতরে রঙ্গন আর দীপন দাঁড়িয়ে ছিল বন্দুক হাতে। সাদা হাঁস নাকি জারুল বনের অনেক নীচ দিয়ে যায়। এত সুন্দর দেখতে লেগেছিল যে রঙ্গন আর দীপন বন্দুক হাতে নিয়েই দাঁড়িয়ে ছিল। একটা হাঁসও মারতে পারেনি। হাঁস মারতে ভুলে গিয়েছিল।

পায়ের কাছে একটা কপাট ভেজানো জানালা দিয়ে সন্ধ্যেবেলার অন্ধকার যেন বিন্দু বিন্দু মশার ঝাঁকের মত এগিয়ে আসছে। ঘরের ভেতর আলো জ্বালালে হয়ত এই অন্ধকার নিষ্প্রভ হয়ে যাবে। সিলিং-এর চতুষ্কোন যখন চোখে পড়ে না, তখন নিশ্ছিদ্র রাত যেন নিঃশব্দে চোখের সামনে দাঁড়ায়। পায়ের কাছে জানালাটার অল্পবিস্তর ফাঁকে শুধু চোখে পড়ে ঋতাদের অন্ধকার বারান্দা। বারান্দায় কতগুলো উজ্জ্বল হাস্যমুখর ডালিয়া ফুল যেন এখন মুখ ফিরিয়ে রেখেছে। ঐ জানালার আধভেজানো কপাটের অল্প বিস্তর ফাঁকে মাঝে মধ্যে ঋতার মুখশ্রী চোখে পড়ে। চোখে চমক লাগানোর মত। বেশ কয়েকটি ডালিয়া ফুলের ভেতর আনাগোনা করে সেই মুখ, কিংবা ধনুকের মত বাঁকানো ভুরুর নীচে টানাটানা দুটো চোখ, কিংবা, কোমল পুরুষ্টু ঠোঁট দুটো—। সেই ঠোঁট দুটো, সেই চোখ দুটো, ফুলের চারধারে মৌমাছি কিংবা প্রজাপতির মত উড়ে বেড়ালে, প্রীতীশের বুকটা সিরসির করে উঠত। হাত দুটো মুঠো হয়ে যেত। ঠোঁট দুটো আর চোয়াল শক্ত হয়ে যেত। দমবন্ধ হয়ে যেতে থাকত। নিশ্বাস পড়ত না। পাশ ফিরে শুয়ে পড়ে প্রীতীশ ভরসন্ধ্যেবেলা। নিঃশব্দে মনে মনে চুমু খেতে থাকে প্রীতীশ ঋতার ঠোঁটে, তার চোখে, তার গালে। চুমু খেতে খেতে বুক দিয়ে শুয়ে পড়ে প্রীতীশ, অন্ধকারে ডুবে, অস্পষ্ট ড্রেসিং টেবিলের আয়নায় তার অস্পষ্ট আলতো ছায়া, কোথায় হারিয়ে গেছে ক্যালেন-ডার, যেখানে টিক মারা রয়েছে একটা তারিখের গায়ে। বাৎসরিক পরীক্ষার তারিখ।

ঘরের আলো কে জ্বালবে। বৌদি এখনো অফিস থেকে ফেরেনি। বড়দাও অফিস থেকে ফেরেনি। মা তিনশ আটত্রিশ দিন আগে মারা গেছে। বাবা

তিন হাজার ছয়শ বাহাত্তর দিন আগে মারা গেছে। মেজদা বিয়ে করেনি। দুর্গাপুরে চাকরি করে। শনিবার রাত্রে আসবে। রবিবার সারাদিন হৈ হৈ করবে, পরদিন সক্কালবেলা কোলফীল্ড ধরতে ভোর চারটেয় উঠে চান করবে। বৌদির পিসতুতো বোন জ্যোৎস্নাদিকে মেজদার পছন্দ হয়নি। তাই বৌদি কপাল গোঁজ করে থাকে। মেজদার বিয়ের ব্যাপারে আগ্রহ দেখায় না। ঘরের আলো কে জ্বালবে। প্রেমা তো ছাদে, ঋতার সঙ্গে গল্প করছে। মেজদার তো কবে বিয়ে হবে ঠিক নেই। তাই মেজ বৌদি কবে আসবে ঠিক নেই। ঘরে আলো কে জ্বালাবে? বৌদি তো অফিস থেকে ফেরেনি। বড়দাও তো অফিস থেকে ফেরেনি। মনে হয় দুজনেই অফিস থেকে ফিরে কোন একটা জায়গায় মীট করেছে। তারপর হয়ত কোন সিনেমা হলে ঢুকেছে। কিংবা কোন বড়সড় রেস্টুরেন্টে ঢুকেছে। কিংবা হয়ত কোন পার্কে, কিংবা ময়দানের ভেতর দুজনে একসঙ্গে হাঁটছে। কিংবা লেক টাউনের পুকুরপাড়ে হয়ত কোন একটা গাছের নীচে বসে হাওয়া খাচ্ছে। হাওয়া মানে প্রেম। মানে গাছটা নিশ্চয়ই জারুল ফুলের গাছ। না, জারুল নয়। নিশ্চয় হলুদ রাধাচূড়া গাছ। কিংবা লাল টকটকে কৃষ্ণচূড়া। রাধাচূড়া যখন ফোটে তখন গাছগুলোর মাথায় সোনার ঝালর বসানো, চুমকি বসানো মুকুট এমন ঝলমল করে। কৃষ্ণচূড়া গাছে তখন নানা লাল রঙের লেলিহান শিখা, স্ফুলিঙ্গ, জ্বলন্ত অঙ্গার চোখ ধাঁধানো।

একদিকে ঝলকানো হলুদের রাধাচূড়া, অন্যদিকে রাঙা আগুনের কৃষ্ণচূড়া, মাঝখানে কি কখনো একা দাঁড়ানো যায়? প্রীতীশের চোখের সামনে তখনি কেন যে ঋতার মুখখানা ভেসে ওঠে। ভেসে ওঠে ডালিয়া ফুল। ভেসে ওঠে ঝুল বারান্দা। রাধাচূড়া আর কৃষ্ণচূড়া গাছ কি পাশাপাশি কোথাও দেখতে পাওয়া যায়? যদি পাওয়া যায় তো, কোথায় পাওয়া যায়? ময়দানে কি দেখতে পাওয়া যায়?

দাদা বৌদি কি সে জন্যেই ময়দানে যায়? একদিকে রাধাচূড়া গাছ, অন্যদিকে কৃষ্ণচূড়া থাকলে তার মাঝখানে বোধহব দারুন একটা প্রেম হয়। দাদা বৌদির তো লাভ ম্যারেজ। প্রীতীশের ভীষণ ইচ্ছে তার যেন লাভ ম্যারেজ হয়। কার সঙ্গে হবে? ওপরে, ছাদে প্রেমার সঙ্গে ঋতা এখনো গল্প করছে। সন্ধ্যে কখন শেষ হয়ে গেছে। আকাশ থেকে আলোর কুয়াশায় আচ্ছন্ন হয়ে সদ্য পূর্নিমা নেমেছে—প্রীতীশ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে কিছু না থেকে অনেক দূরে ডানদিকের খোলা জানালায়। পূর্নিমার রঙটা তেমন সাদা নয়। বেগুনী আভা। সাদাটে বেগুনী জারুল ফুলের মত পূর্নিমা। এমন পূর্নিমা কি রঙ্গন আর দীপন কখনো দেখেছে। দীপন নাকি অনিন্দিতা চ্যাটার্জী নামের একটি মেয়েকে ভালবাসে, আর ফুল্লরা রাহুকে রঙ্গন। তাদের নিয়ে এক দিন নাকি ওরা আবার সুন্দরবনের সেই জারুলবনে যাবে। ভাবলে প্রীতীশের

ভীষন কষ্ট হয়। অনিন্দিতা ফুল্লরাকে নাকি ওরা দুজন বেগুনী জারুলের ফাঁকে ফাঁকে সাদা হাঁসের মালা দেখাবে। প্রীতীশ দাঁতে দাঁত শক্ত করে চেপে বালিশে মুখ গুঁজে পড়ে থাকে। চোখবুজে যতক্ষণ পড়ে থাকা যায় পড়ে থাকতে ইচ্ছে করে।

কিন্তু এভাবে পড়ে থাকলে কি চলে? আলো জ্বালিয়ে পরীক্ষার পড়া পড়তে পরে প্রীতীশ। কিংবা জামা গায়ে দিয়ে চটিতে পা লাগিয়ে মোড়ের মাথায় গিয়ে একটু হাওয়া লাগাতে পারে। ওখানে পাওয়া যাবে অতীন, রাজু আর হিন্দোলকে আড্ডা দেবার জন্যে।

হিন্দোল এম. এ. ফার্স্ট ক্লাস পাওয়া ছেলে। কিন্তু এখনো চাকরি জোটাতে পারেনি। কতদিন আর অপেক্ষা করবে অণিমাদির বোন সুষমা। তাই, হিন্দোলকে ছেড়ে চ'লে গেল এক ইঞ্জিনীয়ার বরের ডিলাক্স ফ্ল্যাটে। তাই হিন্দোল মোড়ে দাঁড়িয়ে একটার পর একটা সিগারেট খায় আর মেয়েদের দেখলে যা তা রিমার্ক পাস করে। ওরা প্রীতীশকেও দলে পেতে চায়, বলে, 'বড় বড় চুল রাখো গুরু, লম্বা লম্বা জুলপি রাখো, শালা মুখে গোঁফদাড়ির জঙ্গল সাফ করেছিস কাকে দিয়ে—? ঐ হেবো জমাদারকে দিয়ে? প্রীতীশের ওদের ভাল লাগে না। সে তাই মোড়ের মাথায় যেতে চায় না। অথচ মোড়টা কত সুন্দর। কত আলো। বড় রাস্তায় ট্রাম বাস আর লোকজনের ভিড়। দোকানে দোকানে কাচের শোকেস। শোকেসে কোথাও টিভি, কোথাও কসমেটিকসের আলো ঝলকানো বাহার। কোথাও কনফেকশনারির সুসজ্জিত কাঁচের শোকেস। তার পাশে শাড়ির দোকান। শাড়ী দুলছে লাল, নীল, সবুজ জাফরানি জরির ফুল নকশা, সাদা কালো আলপনার প্রিণ্ট। ফুলের দোকান, ওষুধের দোকান, স্টেশনারী গুডসের দোকান। নিওনের আলোয় ঝলমল করছে গাড়ি বারান্দা, রাস্তা। ফুটপাতে কত লোকজন। সুন্দরী মহিলারা কাতারে কাতারে কোথা থেকে যে আসছে ট্রামেবাসে, ট্যাক্সি চড়ে, পায়ে হেঁটে। কথা বলছে। দাঁড়াচ্ছে। হাসছে। ঠাট্টা করছে। শাড়ির ডিজাইন দেখছে। মন্তব্য ছুড়ছে। যখন হাসে প্রীতীশের বুক দুলে ওঠে। যখন দোলে তখন সে দম বন্ধ করে উন্মুখ হয়ে তাকিয়ে। যখন তাকায়, তখন চোখে চোখ রাখতে গিয়ে সে ঘাবড়ে যায়। তাড়াতাড়ি চোখ নামিয়ে কোন দোকানের দিকে কিংবা কোন নাইটপোস্টের দিকে কিংবা ট্যাক্সিস্ট্যাণ্ডের দিকে তাকায়। প্রীতীশের ভীষণ ভাল লাগে ঐ মোড় আর ঐ সুন্দরী মেয়েদের। ওদের সঙ্গে সুন্দর সুন্দর ছেলেও থাকে। সুন্দরী মেয়েরা নিশ্চয়ই সুন্দর ছেলেদের সঙ্গেই প্রেম করতে চায়। তাই জোড়ে জোড়ে মোড়ের মাথায় আসে। দোকানগুলোর সামনে ভিড় করে। প্রীতীশ যদি ঋতাকে সঙ্গে নিয়ে ঐ দোকানগুলোর সামনে দাঁড়াত। একটা টিভি সেট

যদি পছন্দ করত, কিংবা রেকর্ড প্লেয়ার। কিংবা কুকার বা শাড়ির ডিজাইন।

সুন্দর ছেলে আর সুন্দরী মেয়েদের প্রচণ্ড ভিড়। তার সাথে প্রচণ্ড প্রবাহে—ওর মধ্যে সাঁতার কাটতে কাটতে প্রীতীশ ঋতাকে নিয়ে অনেক দূরে যেতে চায়। অনেক দূর—কত দূর? কত দূর গেলে আলোর পরেও অনেক আলো, অনেক রকমের রঙ—লাল হলুদ বেগুনী···দেখতে দেখতে প্রীতীশ এক সময় অবাক হয়ে যায়। চারধারে লাল হলুদ আর বেগুনী গাছ। এক গাছ লাল। লালের পর লাল। কেবল লাল ঢেউ। তারপর হলুদ। এক গাছ হলুদ। গাছের পর গাছ। হলুদের পর হলুদ। প্রীতীশ এক গাছ লালের নীচে দুই হাত মেলে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে। দেখতে দেখতে ছুটে গিয়ে এক গাছ হলুদের নীচে দাঁড়ায়। হলুদের ঢেউ শেষ হতে না হতেই বেগুনীর ঢেউ ছুটে আসছে। ঐ যে এক গাছ বেগুনী। চারদিকে কেবল বেগুনী ফুল। এই বুঝি জারুল বন। প্রীতীশ দুই হাত মেলে ছুটতে ছুটতে জারুল বনের দিকে যায়।

কী গভীর জারুল। মাঝখানে ছুটে আসতে আসতে চমকে ওঠে। দীপন আর অনিন্দিতা, রঙ্গন আর ফুল্লরা কেমন পরস্পরের মধ্যে মগ্ন থেকে গাঢ় চুম্বনে বন্দ হয়ে আছে। আকাশে উড়ে যাচ্ছে সাদা হাঁসের মালা। ঐ যে সাদা হাঁসের মালা, প্রীতীশ একা একা ঘুরে বেড়ায় জারুল বনে। চীৎকার করে ডেকে ওঠে, 'ঋতা···ঋতা।' কোন সাড়া শব্দ পায় না। শনশন বাতাসে ওড়ে জারুল রেণু। চুমু খেতে ভীষণ ইচ্ছে করছে প্রীতীশের। ভীষণ ছটফট করছে শরীরের ভেতরে কী যেন একটা। বড্ড তেষ্টা পাচ্ছে। প্রীতীশের ভীষণ তেষ্টা পেয়েছে।

ঘরের মধ্যে আলো জ্বলছে। রাত নটা বেজেছে। দাদা বৌদি এক সঙ্গেই ফিরেছে তাহলে অফিস থেকে। পাশের ঘরে গুনগুন করে কথা বলছে। প্রেমা অনেক আগেই নেমেছে ছাদ থেকে। এখন চেয়ারে বসে টেবিলে মাথা ঝুঁকিয়ে কালকের পড়া তৈরি করছে। হঠাৎ মাথা তুলে বলল, 'আজ কি তুই রাত জেগে পড়বি?'

প্রীতীশ এতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিল। স্বপ্ন দেখছিল। স্বপ্নটা ভালই লাগছিল। কিন্তু কী উত্তর দেবে প্রীতীশ? রাত জেগে পরীক্ষার পড়া পড়বে। না কি আবার আরেকটা ঘুম দিয়ে ঐ রকম আরেকবার স্বপ্নটা দেখবে। স্বপ্ন নিয়েই কি মশগুল থাকবে প্রীতীশ, নাকি, ঐ যে পড়ে আছে টেবিলের ওপর ইকনমিক্স, আর ঐ যে ক্যালেনডারে একটা তারিখ দাগানো আছে, পরীক্ষার তারিখ—ঐগুলোর ভেতরেই আঁটোসাঁটো হয়ে বসবে নাকি প্রীতীশ, মাথাগুঁজে গুনগুন করে পরীক্ষার পড়া পড়বে।

অন্ধকার ঘরটা শুধু টেবিলল্যাম্পের ছোট্ট আলোটাকে মুঠো করে ধরবে। আর সব কিছু চোখের বাইরে রেখে দেবে। চোখের বাইরে রেখে পাশের ঘরটা, যেখানে দাদা বৌদি ঘুমিয়ে থাকে, বুকে বুকে জড়িয়ে হয়ে যায় কৃষ্ণচূড়া রাধাচূড়া লাল হলুদের মায়াজাল। তাই দিয়ে যেন তৈরী মশারিটা কেমন কাঁপে—মাঝরাতে মাঝে মাঝে দরজার ফাঁকে চোখ লাগিয়ে দেখেছে প্রীতীশ। তখন সে বইটা টেবিলের ওপর ছুড়ে নিজেকে ছুড়ে দেয় বিছানার ওপর ধপাস করে। চোখে ঘুম আসে না। চারদিকে ঘিরে আছে শুধু ঘরের চারটে দেয়াল। স্বপ্নটা যেন কোথায় মিলিয়ে গেছে।

বিড়াল

বিজনকুমার ঘোষ

সামান্য গাফিলতির জন্যে সমস্যাটা ভারী জটিল হয়ে দাঁড়াল।

সকালবেলায় টিপটিপ বৃষ্টি পড়ছিল। বাঁধা গোয়ালার সততায় বিশ্বাস রাখতে পারেননি হেমন্তবাবু। ভোর বেলাতেই ছাতি মাথায় আধ মাইল দূরের খাটালে বালতি হাতে উপস্থিত হয়েছিলেন। ঠিক তখনি লাল রঙের তাগড়া গাইটাকে দোয়ানো হচ্ছিল। জল মেশাবার একটুও সময় পায়নি। সেইজন্যে তিনটাকা বারো আনা কিলোতেও মহাদেব গোয়ালা গাইগুঁই করছিল। কিন্তু মুখ ফুটে আসল কথাটা বলতেও পারছিল না। হেমন্তবাবু দাম ফেলে দিয়ে বালতি হাতে উড়ে এলেন। বৃষ্টির মধ্যে এক মাইল হাঁটাতেও তাঁর পুরোন বাতের ব্যথাটা চাগিয়ে উঠল না।

মেয়ে জামাই ছেলে ছেলের বৌ নাতিনাতনী চসির পায়েস বলতে অজ্ঞান। আশ্চর্য। ওরা দেশবিদেশে এত ঘোরাফেরা করে, হোটেল রেস্টুরেণ্টে ভালমন্দ খায়, তবু মায়ের হাতের চসির পায়েস বলতে লালা ঝরে। ঠিক যেন বাচ্চা ছেলে। শান্তিবালা একেক সময় রেগে গিয়ে বলেন, এর মধ্যে যে কি মধু পাস বুঝি না। কিন্তু প্রতিবার পুজোর অন্তত ছয় মাস আগে থেকেই ময়দার গুলি নিয়ে বসেন। চসিগুলি মনের মত না হলে তৃপ্তি হয় না। খুব পাতলা হওয়া চাই আবার আঙুলের ঘসায় ময়লা হয়ে গেলে চলবে না। রোদে শুকোতে দিয়ে কাকের ভয়ে ঠায় কাছে বসে থাকেন। কড়া রোদে চসির ডালার ওপর কিরকম যেন ছায়া কাঁপতে থাকে। একেকবার একেক রকম মুখ ভাসতে দেখেন ওখানে। কোনবার লীলা কোনবার নীলা, কখনো অমল, কখনো বা শ্যামল।

বিকেলে চা দিতে গিয়ে জিজ্ঞাসা করেন, হ্যাগো, দেরাদুনে চিঠি লিখে দিয়েছ তো ?

—হ্যাঁ।

—জামসেদপুরে ?

—হ্যাঁ হ্যাঁ।

—জলপাইগুড়িতে ?

—আঃ, তুমি দেখছি খবরের কাগজখানা পড়তেও দেবে না !

শ্যামল এন সি ডি সি-তে চাকরী পেয়ে চলে গেছে রাঁচী। খবরের কাগজে কর্তার মনোযোগ দেখে সে কথাটা জিজ্ঞাসা করতে সাহস পান না।

ষষ্ঠীর দিনকয়েক আগে থেকে আসার পালা শুরু হয়। অল্প জায়গা। মেঝেতে ঝুল বারান্দায়, বিছানা পেতেও শোবার কষ্ট লাঘব করা যায় না। কমল

প্রতিবারই ওর খাট ছেড়ে দিয়ে বন্ধুর বাড়িতে গজগজ করতে করতে শুতে যায়। বড় মেয়ে লীলা থাকে দেরাদুনে। অনিল মিলিটারী হাসপাতালের ডাক্তার। সম্প্রতি প্রমোশন পেয়ে মেজর পেয়েছে। নীলার বর মধুসূদন ইঞ্জিনিয়ার। জামসেদপুরে সুন্দর কোয়ার্টার। প্রতিবারই বিলেত যাওয়ার চান্স অল্পের জন্যে ফসকে যাচ্ছে। বড় ছেলে অমল পাশ করার পর কলকাতাতেই মাষ্টারী করছিল। সঙ্গে দুইবেলা ট্যুইশনি। বছর কয়েক হল জলপাইগুলি কলেজের লেকচারার হয়ে চলে গেছে। ওদের ছেলেমেয়েরা, তাদের বয়েসও কম হল না। কেউ কেউ ইতিমধ্যেই শাড়ি ধরেছে, হাতা কাটা ব্লাউজ, যেমন রত্না কৃষ্ণা; কেউ কেউ চোদ্দ ইঞ্চি ঘেরের প্যান্ট—মিন্টু শংকর ইত্যাদি।

বাড়ি ভর্তি হয়ে যাওয়াতে হেমন্তবাবু একটু কেশে বললেন, আর কেন, এবার চসির পায়েস লাগিয়ে দাও—।

শান্তিবালা চোখের খুব কাছে এনে লেস বুনছিলেন। বললেন, দুধ আনালেই হয়—

সেই পুরু সরভর্তি দুধে আজ পাড়ার সবচেয়েয়ে নোংরা বিড়ালে মুখ দিয়ে ফেলেছে।

মুহূর্তে বাড়িময় হৈ-চৈ উঠল। দুপুরের মিষ্টি ঘুম টুটে গেল কারো কারো। নতুন শাড়িপরা মেয়েরা সিনেমা পত্রিকায় চিহ্ন দিয়ে ছুটে এল রান্না ঘরে।

বেলা হাফাচ্ছিল।

হেমন্তবাবু চোখ থেকে চশমাটা খুলে নিয়ে কড়া হয়ে বললেন, সত্যি বেড়ালটাকে দেখেছিলি ?

—হ্যাঁ বাবা সেই হুলো বেড়ালটা। আমার সাড়া পেয়েই ছুটে পালিয়ে গেল।

—দরজার ছিটকিনি দেওয়া ছিল না ?

—না তো। একটুখানি ফাঁক ছিল—

—দেখলে ব্যাপারখানা ? —হেমন্তবাবু জামাইদের দিকে তাকিয়ে অর্থপূর্ণ হাসির পোজ নিলেন।

যত সূক্ষ্মই হোক সেটুকু ধরবার মত বুদ্ধি আছে শান্তিবালার।

—দ্যাখো বাপু আমার নামে দোষ চাপালে ভাল হবে না বলছি—

—আহা চটছ কেন, তোমার নাম বলেছি।

প্রবাসী মেয়েরা সাধারণত মায়ের দিকেই যায়। লীলা বলল, মাকে তো ছিটকিনি দিতে দেখেছি !

বল্ সে কথাটা তোর বাবাকে বল্। —শান্তিবালা যেন কথাগুলো ছুঁড়ে মারলেন।

আজকালকার ছেলেরা, ফ্রয়েড সাহেব যাই বলুন, একটু উলটো ধরনের। তার ওপর দুধের দামটা যখন অমলই দিয়েছে। বলল, তোমার আজকাল ভুলো মন, চোখেও কম দেখ—

—এ কথা বলিস নে অমল, তোরা বছর কয়েক থেকে রান্নাঘর করছি—অসময়ে গলার মধ্যে অভিমান ঢুকে পড়ায় কথা শেষ করতে পারলেন না।

প্রসঙ্গটা ব্যক্তিগত পর্যায়ে চলে যাওয়ায় নতুন জামাই মধুসূদন অস্বস্তিবোধ করছিল। বলল, যাক গে, যা হবার হয়ে গেছে। দুধটা ফেলে দিলেই ল্যাঠা চুকে যায়।

—হ্যাঁ বিড়ালে যখন মুখই দিয়েছে তখন না খাওয়াই উচিত। —প্রতিষ্ঠিত ভগ্নীপতিরা মনে খুঁৎখুঁতি রেখে পায়েস খাবে অমল তা চায় না। আবার না হয় দুধ আনানো যাবে।

—আহা এতখানি দুধ! —শান্তি বালা চেপে রাখতে পারলেন না।

—বৃষ্টি মাথায় করে নিয়ে এসেছি। একটুও জল মেশাবার টাইম পায়নি। —হেমন্তবাবু।

—কি সুন্দর সর পড়েছে মা। —বেলা।

অনিল দুধের কড়াটার দিকে তাকিয়ে বলল, এই বাজারে ফেলে না দিয়ে কোন ভিখিরী টিখিরী ডেকে দিয়ে দিলেই হয়।

লীলা বলল, ভিখিরীকে দিতে যাব না আরো কিছু! ওদের দিয়ে কোন্ উপকারটা হয়?

—তাহলে ক্ষ্যান্তকে দুধটা দিয়ে দাও মা।—শ্যামল বলল।

—হ্যাঁ মা একটা আলপিন প্রাণে ধরে দেয় না এখন পাঁচ কিলো দুধ দেবে।—বেলার কম্বিনেশনে লজিক আছে।

—সেটা একটা কথা বটে। হঠাৎ এত দুধ দিলে সন্দেহ করবে।—হেমন্তবাবুর উকিলী বুদ্ধি চাড়া দিল।

কমল সাধারণত এ সময় বাড়ি থাকে না। ওদের কলেজের প্রগতিশীল ছাত্র ইউনিয়নের ব্যস্ততম সেক্রেটারী। আজ আছে। রেগে উঠল, খবরদার দুধ ফেলে দেবে তবু ওকে নয়। মনে নেই পুজোর কাপড়ে ছেঁড়া ছিল বলে ফেরত দিয়ে গেছে?

কথাটা ঠিক। আঁচলার কাছে একটু কাটা ছিল। ওতে কোন অসুবিধেই হয় না। তবু এর জন্যে তিনটে টাকা কম লেগেছে। কিন্তু তাই বলে ফেরত দিয়ে যাবে? আস্পর্দা তো কম নয়।

লীলা বলল, ইস, ওনাকে দুশো টাকা দামের বেনারসী দিতে হবে।

নীলা বলল, আমরাই বলে সর্বদা চল্লিশ টাকা দামের শাড়ি পরি—।

—হু, দুধ দিতে গেলে মনে করবে নিশ্চয়ই বিড়ালে মুখ দিয়েছিল। কি দরকার।—হেমন্তবাবু চশমাটা ফের চোখে পরলেন।

—গেল মাসে জ্বর হয়েছে বলে দু'দিন কামাই। ছুতো পেলেই হল।

কমল দেশের বর্তমান অর্থনীতিরও কিছু খবরাখবর রাখে। বলল, আমরা লেখাপড়া শিখেও চাকরী পাই না, অথচ ওরা এবেলা ছাড়লে ওবেলা পায়।

সেইজন্যেই—আবার মুখে মুখে তর্ক ওনার, বলে কিনা, কাপড় কাচবার কথা তো ছিল না ?

—ঠিক আছে, এবার থেকে কামাই করলে মাইনে কাটা যাবে।

বিকেল এসে পড়ায় আলোচনাটা কিছুক্ষণের জন্যে মুলতুবী রইল। বেলা ছোট মেয়ে। ঝি না আসা পর্যন্ত ফাই-ফরমাস খাটা ওর ডিউটি। খবরের কাগজ পড়তে পড়তে জামাইবাবুরা ঘন ঘন কেশে ওঠার মানে বুঝতে অসুবিধে হল না। স্টোভ জেবলে পাঁচ কিলো দুধের দিকে তাকিয়ে গরম জলে পাউডার মিল্ক গোলাতে শুরু করে দিল। চা হয়ে গেল, দিদি বৌদিদের হঠাৎ খেয়াল হল ওকে সাহায্য করা দরকার। ঝুল বারান্দায় বসে ছিল অনিল। লীলা চায়ের কাপটা এগিয়ে দিতেই চারদিক তাকিয়ে বলল, নবাবী চাল বটে মেজকর্তার। বিলেত গেলে না জানি কি হয়—

পড়ার ঘরটাতে শুয়ে শুয়ে বিলিতি ম্যাগাজিনের ছবি দেখছিল মধুসূদন। নীলা কাছে যেতেই ফিসফিস করে বলল, নজরখানা দেখলে মেজর সাহেবের ? কেন, ভিখিরীর শরীর খারাপ হতে পারে না ? তুই না ডাক্তার ?

ছোটবেলা থেকেই অমলের ফুল গাছের শখ। ছাদে ফুলের টবে কয়েকটা মরকুটে গাছ আছে। রথের মেলায় ওদের যে রকম সাইজ ছিল এখনো তা-ই আছে। তবু ছুটিতে বাড়ি এলে সারা দুপুরে গোড়া খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ওদের অতিষ্ঠ করে তোলে। করবী ওখানেই চায়ের কাপটা নিয়ে গেল। কেউ নেই। সুতরাং চোখ পাকিয়ে বলল, এবার কিন্তু দুধের দাম তুমি দিতে পারবে না। দরজা খোলা রেখে ঘুমোবে তার জন্যে তুমি দায়ী নাকি ?

ঝি এল। দেরী হওয়ার জন্যে আজ কেউ কিছু বলল না। উপরন্তু শান্তিবালা মেয়েদের উদ্দেশ্যে চেঁচিয়ে বললেন, দোকানে গেলে ক্ষান্তর কাপড়টা বদলে নিয়ে আসিস।

ক্ষান্ত কোন উচ্চবাচ্য করল না। কোমরে কাপড় জড়িয়ে গম্ভীর মুখে বাসনের পাঁজা নিয়ে কলতলায় চলে গেল। ক্ষান্ত ঠিকে ঝি। পাড়ার পাঁচটা বাড়িতে ঘড়ির কাঁটার মত কাজ করে। অনেক সদ্‌গুণ আছে। মিথ্যে কথা বলে না। চুরি করে না। এ বাড়ির গোপন কথা ও বাড়িতে বলবার জন্যে হাকুপাকু করে না। তার বদলে ডি, এ, নেই। মাইনে দশ বছর আগেও যা ছিল এখনো তাই আছে। রবিবার নেই। মাঝে মধ্যে এক আধদিন জবরজারি হয়ে কামাই করলে প্রগতিশীলরা খাপ্পা হয়ে ওঠে। বালবিধবা। হাড়ের ওপর কিছু মাংস লেগে থাকায় অন্য রকমের বিপদও আছে। সুতরাং বেশ মুখরা এবং হুঁশিয়ার। ফলে গূঢ় কথাটা সবারই মন থেকে উঠে এসে ঠোঁটের কিনারে ঘোরাফেরা করতে লাগল। কিন্তু এহেন ক্ষান্ত ঝি, যখন নিজে থেকেই বলে উঠল, দুধটা ওভাবে রেখেছ যদি বিড়ালে মুখ দেয়, আর খেতে পারবে ? তখন সবাই স্বস্তির নিশ্বাস

ফেলল। বিশেষ করে মেয়েরা। অথচ ভাব দেখানো গেল, বলেছিলাম তো, রাজী না হলে কি করব। পাঁচ কিলো দুধ ফেলে দেব নাকি ?

অতএব ফের গোলটেবিল বৈঠক বসল রান্নাঘরে। তিন বৌ গোপনে তাদের তিন স্বামীকে চিমটি কেটে দিল। যাতে বেফাঁস কথা বলার জন্যে অন্যের সমালোচনার পাত্র না হয়। হেমন্তবাবু বেশ ভারী গলায়, যেন মফঃস্বল কোর্টের মুনসেফ, জিজ্ঞাসা করলেন, হ্যারে বেলা, বেড়ালটাকে তুই ঠিক দেখেছিলি তো ?

সবাই মুখের দিকে তাকিয়ে, কি বললে খুশি হবে সবাই তা-ও জানা, সুতরাং বেলা একবার ঢোক গিলে, একবার কড়াটার দিকে তাকিয়ে বলল, দেখিনি, মানে কি যেন একটা—

সবাই চেঁচিয়ে উঠল একসঙ্গে, তাই বল যা ভয় পাইয়ে দিয়েছিলি—

—দরজাটা খোলা ছিল বলে মনে হয়েছে বুঝি বেড়াল ঢুকেছে।—হেমন্তবাবু ব্যাখ্যা জুড়ে দিলেন।

লীলা বলল, আমি তো একটু আগেই জল খেতে গিয়েছিলাম। এত তাড়াতাড়ি বেড়াল ঢুকতে পারে না।

—ঢুকবেই বা কীভাবে ? ঘর ভর্তি মানুষ।—নীলা বলল।

শ্যামল ডিটেকটিভ উপন্যাসের ভক্ত। চারপাশ পরীক্ষা করে বলল, তাহলে মেঝেতেও একটু পড়ে থাকত।

মেজর অনিল রায় বলল, আধঘণ্টা ধরে বয়েল করলে যে কোন জার্মই মারা যায়।

ফাইনাল রায় দেবার আগে হেমন্তবাবু জোর কেশে নিলেন। তারপর কোচার খুঁটে চশমার কাচ মুছতে মুছতে হেসে ফেললেন, আর কেন, এবার তোমার কেরামতি দেখিয়ে দাও—

সন্ধ্যার পর অনেকেই বেরিয়েছিল বন্ধুদের সাথে দেখাসাক্ষাৎ কেনাকাটা ইত্যাদি প্রয়োজনীয় ব্যাপার সারতে। কিন্তু চাঁসর পায়েস প্রত্যেককেই সকাল সকাল ঘরে ফিরিয়ে আনল। খাবার টেবিল জমজমাট। শান্তিবালা আগেই কাঁদুনি গেয়ে রাখলেন, পায়েস কিন্তু ভাল হবে না, যা হুজ্জুত গেল দুপুর থেকে। কেউ গ্রাহ্য করল না এ কথায়। এটা ওঁর স্বভাব। তার মানেই ভাল হয়েছে।

বড় জামাই বলল, চমৎকার।

মেজজামাই সঙ্গে সঙ্গে দান ফিরিয়ে দিল, নাইস—

বেলা বলল, বেড়ালে মুখ দিয়েছিল বলেই না এত স্বাদ।

চোখ পাকিয়ে উঠল কমল, এই না বললি বেড়াল টেড়াল কিছু দেখিনি ?

উচ্ছ্বাস পর্বটা বে-লাইনে যেতেই হঠাৎ 'ম্যাও' শব্দ শুনে চমকে উঠল সবাই। দেখা গেল সামনের বাড়ির কার্নিসে পাড়ার সর্বচাইতে নোংরা বিড়ালটা পরম দার্শনিকের ভঙ্গীতে বসে আছে। যেন এতক্ষণ ধরে যেসব আলোচনা চলছিল তা সবই শুনতে পেয়েছে।

কুরুক্ষেত্র

মৃনাল গুহঠাকুরতা

দাড়ি কাটার পর বারান্দার ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে প্রাত্যহিক বরাদ্দ প্রভাত কালীন দ্বিতীয় চায়ের কাপের আশায় বসে আছি অনেকক্ষণ। দশ-পনেরো মিনিট কেটে গেছে অপেক্ষা করে। ভাবছি গৃহিনীকে আর একবার তাগিদ দেবো নাকি।

ঠিক ন'টায় স্নানে যাই আমি। তারপর খেয়ে দেয়ে বেরিয়ে সাড়ে ন'টার ট্রেনটাও ধরি প্রত্যহ। দীর্ঘ পনেরো বছরের চাকরি জীবনে এ নিয়মের ব্যতিক্রম হয়নি কখনও।

আজ সাড়ে আটটা বেজে যেতে চলল অথচ চা আসছে না এখনও দেখে বিরক্তি অনুভব করছিলাম। এমন সময় চা এলো হঠাৎ। হলুদ মাখা ভিজে হাতে কাপটা সামনে ধরে তনিমা বলল, ডালটা একেবারে নামিয়েই চা করলাম বলে দেরি হয়ে গেল একটু।

—তা' তো হলো— কেন, একটু আগে চা-টা দিয়ে ডালটা বসালে পারতে।

—তখনতো ফেরোনি তুমি বাজার থেকে—তাছাড়া, এমনকি দেরি হয়েছে আর, এখনও অনেক সময় আছে তোমার স্নানে যাবার।

—হুং—

কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশের জন্যই বুঝি নীরবে চা পান করতে লেগে গেলাম আর কথা না বাড়িয়ে। তনিমা চলে যায়নি। পাশের চেয়ারটায় বসে ছিলো। আমাকে নীরব হয়ে যেতে দেখে সুযোগ পেয়ে কথা শুরু করলো, শুনছো—

—কি ?

—জানি, অনেক খরচ হয়ে গেছে তোমার এ মাসে—এটা পুজোর মাস। কিন্তু

—ওসব কিন্তু টিন্তু বুঝি না। আমি কিছু আনতে পারবো না এখন—এই তোমায় বলে দিচ্ছি।

উঠতে যাচ্ছিলাম। হাত ধরে বসিয়ে দিলো আমায় তনিমা, এই লক্ষ্মীটি, রাগ করোনা—এক মিনিট বসো।

—কেন, আবার কী বলবে ?

—দেখো, নিজের জন্য বলছি না—তোমার মা'র জন্যই বলছি। ওঁর খুব সাধ হয়েছে এ বয়েসে আর একবার মহাভারত পড়বেন। সেবার বাড়িতে চুরির সময় ওটাও চুরি হয়ে গিয়েছিলোতো জান। তা' বলছিলেন আমায়, বৌমা, খোকাকে বোলো যদি পারে যেন আমাকে একটা মহাভারত কিনে দেয় সামনের মাসে।

মা থাকেন ছোট ভাইয়ের কাছে সোদপুরে। এখন তাঁর বয়েস সত্তর। ভালো

চোখেও দেখেন না—এখন আবার মহাভারত কী পড়বেন? তাছাড়া, ছোট ভাইয়ের অবস্থাতো আমার চেয়ে অনেক ভালো। তাকে না বলে আমাকে বললেন কেন বুঝে উঠতে না পেরে রেগে গিয়ে বললাম, তা' মহাভারত পড়বার সাধ হয়েছে তো তোমার ঠাকুরপোকে না বলে আমাকে বললেন কেন—তুমি নিশ্চয় যেচে ভালো মানুষটি সেজে কিনে দেবো বলে এসেছো?
—এই, না। এই তোমাকে ছুঁয়ে বলছি!
—বেশ, এবার যেদিন যাবে বলে আসবে এখন আর মহাভারত পড়বার দরকার নেই। যখন ছিল তখনতো বহুবার পড়েছেন— এক বই আবার কতবার পড়তে হবে?
—না, বুড়ো মানুষ মুখ ফুটে যখন বলেই ফেলেছেন, যত কষ্টই হোক এবার-কার মতো কথাটা রাখো তাঁর।—কতদিন আর বাঁচবেন?
যুক্তিটা একেবারে ফেলে দেওয়াও যায় না। মা কোনদিন কিছু চায় না এই ছেলের কাছে মুখ ফুটে। কিন্তু এখন মাসের শেষ। বললাম তাই তনিমাকে, আচ্ছা, দেখবো পরে কী করা যায়।
ব্যাপারটা মিটে গেল তখনকার মতো, উঠে স্নান করতে গেলাম।
দৈনন্দিন কাজের চাপে আর সংসারে নুন আনতে পান্তা ফুরোনোর অবস্থায় বইটার কথা ভুলেই গেলাম। মাইনে পাবার পর মাসকাবারি পাওনাদারদের সবার পাওনা গণ্ডা মিটিয়ে সারামাসের বাজার খরচা ও হাত খরচা গুনে গুনে হাতে রেখে চার তারিখের বিকেলে অফিস থেকে ফিরলাম। সওদাগরী অফিসের কনিষ্ঠ কেরানী আমি। ফেরবার সময় ট্রাম বাসে ফেরার বিলাসিতা শোভা পায়না আমার।
হেঁটেই ফিরি প্রত্যহ। আজও ফিরেছি ওই ভাবে। অফিসে টিফিন বলতে দু' কাপ শুধু চা ছাড়া বাড়তি পয়সা খরচার সাধ্য নেই বলে গিয়েই তিনচার খানা হাতে গড়া রুটি আর একটু বাসি তরকারী যা থাকে তা' লাগে আমার। আজ খিদেটা বুঝি বেশিই পেয়েছিলো একটু। এসেই জামাকাপড় না ছেড়ে গিন্নীকে বললাম, খেতে দাও আগে—খিদেয় নাড়ি ভুড়ি ছিটকে বেরিয়ে আসবে সব এক্ষুনি।
তনিমা বলল, একটু বসো—সন্ধ্যেটা দিয়েই দিচ্ছি। হ্যাঁ, ভালো কথা—তোমার মা'র মহাভারতের কী হলো? ঠাকুরপো এসেছিলো একটু আগে—মা নাকি ওকে বলে দিয়েছেন বইটা কেনা হয়ে থাকলে একেবারে নিয়েই আসতে।
—তা' তুমি কী বললে?
—বলবো আবার কী—তোমার ভাই বলে গেলো সে কাল বিকেলে আবার আসবে। যদি পারো বইটা আজ সন্ধ্যায়ই কিনে আনো।
খাওয়া মাথায় উঠলো। মায়ের এই আবদারের জন্য একটু রাগও যে না হলো

তাঁর উপর এমন নয়। সঙ্গে সঙ্গে এ'ও আবার মনে হলো; আমি এমন অপদার্থ যে নিজের মায়ের এই এতটুক একটা চাহিদা মেটাবার জন্যও পয়সার হিসেব করছি—ছোট ভাইয়ের দোহাই পাড়ছি?
তনিমার অনুনয় অগ্রাহ্য করে তক্ষুনি বেরিয়ে পড়লাম বইটা কিনতে। পাশেই কলেজস্ট্রীটের বই পাড়া। পকেটে দশটাকার নোটও একটি আছে—চিন্তার কি? কিন্তু দোকানে এসেই চক্ষু চড়কগাছ। যা দাম বলছে বইটার তা' আঁতকে উঠলাম। না, হলো না বইটা কেনা—কোথায় পাবো অত টাকা?
হতাশ হয়ে ফিরছিলাম আবার বাড়ির দিকে। হঠাৎ নজর পড়লো বিপরীত দিকের ফুটপাতে প্রেসিডেন্সী কলেজের সামনের পুরোনো বই স্টলগুলোর দিকে। আরে, ভুলেই গিয়েছিলাম তো পুরোনোও কেনা যায় বইটা।
ক'টা দোকান ঘুরে অবশেষে একটা দোকানে চলে এলাম এই উদ্দেশ্যে। হ্যাঁ, পেয়ে গেলাম বস্তুটি চাইবা মাত্রেই। সামনেই সাজানো ছিলো। বেশ মোটা-সোটা সাইজ—বাঁধানোটাও ভালো। হাতে তুলে উল্টে-পাল্টে আগেই দেখতে চাইলাম দামটা।
না, নেই। ও জায়গাটা ছুরি দিয়ে ঘষে আগেই তুলে দেওয়া হয়েছে বোঝা যাচ্ছে। বাধ্য হয়েই দোকানদারকে প্রশ্ন করতে হলো, এটার দাম কত?
—নেবেন? বেশি নেবো না এই সন্ধ্যের সময়। নতুনের দাম তিরিশ—তা' আপনি আঠারো টাকাই দিন।
—ঠিক কত হবে বলুন?
—ঠিকই বলেছি। এ বই সব সময় মেলে না। লাইন ঘুরে আসুন, কারোর কাছেই পাবেন না একটা। এই বই স্টলে পড়তে না পড়তেই উধাও হয়ে যায়। জিনিষটি দরকার—আর তা' আজই। তাই, শুরু করলাম দর কষতে। আঠারো বলেছে যখন পাঁচ বলতেই হয়। দোকানদার ষোলোতে নামলো। শেষ পর্যন্ত বহু কষাকষি করে দশ টাকায় করা হলো।
টাকাটি দিয়ে বইটি নিয়ে ফিরে গর্বে বুক ফুলিয়ে বাড়ি ফিরলাম। তনিমা খুশি হলো। এমন খুশি হলো যে, পরদিন বিকেলে ঠাকুরপো আসা পর্যন্ত অপেক্ষা না করে আমি পরদিন অফিসে বেরোবার এক ঘন্টা পরেই রওনা হলো সোদপুরের উদ্দেশ্যে। ইচ্ছে স্বয়ং শাশুড়ির হাতে বইটা দিয়ে ভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে বাহাদুরি নিয়ে ফিরে আসা।
মাস খানেক পরে। সেদিন দুপুরে আবার সোদপুরে গিয়ে শাশুড়িকে দেখে ফিরে এসে সন্ধ্যায় অফিস ফেরত আমাকে তনিমা বলল, হ্যাগো, মা'কে যে মহাভারতখানা কিনে দিয়েছিলে তুমি ওটা দেখে দাওনি?
—মানে?
—ভিতরে কয়েকটা চ্যাপ্টারই যে নেই।

—সে কি!

—হ্যাঁ, মা বললেন এ কেমন মহাভারত বউমা? মহাভারত পড়লাম কিন্তু কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ নেই এতে—কুরুক্ষেত্র ছাড়া মহাভারত ছাপা হলো কী করে? খুলে দেখলাম তিনশো কুড়ির পরে একেবারে পাঁচশো আটান্নো পৃষ্টা।

মেজাজ বিগড়ে গেলো। বললাম রেগে গিয়ে, আঠান্ন-ঊনষাট যা-ই থাক, আমি আর কিনতে পারবো না ও বই এ তোমায় সিধে বলে দিচ্ছি।

—নাগো, আর কিনতে বলবো না তোমায়। ওটাই দোকানে নিয়ে গিয়ে বদলে এনে দাও শুধু তুমি। বইটা সঙ্গে করেই নিয়ে এসেছি আমি—এনে দেবো?

—হ্যাঁ, আমি আবার এখন যাই দোকানে—ওসব ঝামেলার মধ্যে যেতে আমি পারবো না।

তনিমা চুপ করে গেলো তখনের মতো। কিন্তু পরদিন বিকেলে আবার স্মরণ করিয়ে দিলো ব্যাপারটা। আমি মুশ্কিলে পড়লাম। ফুটপাতের দোকান একেই—তায় পুরোনো বই কিনেছি—যাই কি করে পাল্টাতে? শরীর খারাপের অজুহাতে এড়িয়ে গেলাম সব।

কয়েকটা দিন গেলো, প্রায় প্রত্যহই একবার না একবার ঘ্যান্‌ঘ্যান্ করেছে তনিমা, বইটি বদলানোর ব্যাপার নিয়ে গা' করিনি—একটা না একটা অজুহাতে মনগড়া অসুবিধে দেখিয়ে নিরস্ত করেছি ওকে।

শেষে একদিন অবস্থাটা চরমে উঠলো। এই নিয়ে এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি হলো যে আমাদের স্বামী-স্ত্রীতে প্রথমে কথা কাটাকাটি তারপর বচসা এবং সর্বসারে মনকষাকষিতে এসে দাঁড়ালো। অগত্যা একদিন যেতেই হলো বইটি বদলাতে।

দোকানদার প্রথমে অস্বীকার করলো বইটি বিক্রীর কথা। পরে যখন অনেক বুঝিয়ে বললাম আমার ভুল হয়নি, আপনি মনে করে দেখুন একটু তখন নরম হয়ে বলল, তা' হলে হতে পারে—কত বইতো আসে আমাদের কাছে, বিক্রি হয়ে যায়। সব কি মনে রাখা সম্ভব?

—না, তা' সম্ভব না। যাক, এটা বদলে দেবার ব্যবস্থা করুন একটা।

—কোথায় পাবো? তাছাড়া, আমাদের এটা পুরানো বইয়ের দোকান—বদল টদল এখানে চলে না। আপনারা দেখেই নিয়েছেন—সাপ ব্যাঙ যা আছে ওতেই আছে। ওরই দাম নিয়েছি—বাছবিচার করলে নতুনই কেনা উচিৎ।

—সবই বুঝলাম, কিন্তু কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ না থাকলে এ মহাভারত দিয়েই কী করবো?

—কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ নেই তাতে কী হয়েছে—সকালে বললেন না আপনাদের বাড়িতে স্বামী-স্ত্রীতে অনেক কিছু ঘটে গেছে এই নিয়ে, তা' ওর থেকে কম

কি ? যান, বাড়ি যান—পরে আসবেন। যদি ওই বই আবার আসে, রেখে দেবো আপনার জন্য। তবে হ্যাঁ, দাম কিন্তু বাদ যাবে না—যা দাম হয়, পুরোই লাগবে।

বৃথা বাক্যব্যয় না করে বাড়ির পথ ধরলাম। জানি বাড়ি পৌঁছলে আর এক কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সম্মুখীন হতে হবে আমাকে তনিমার সঙ্গে। কিন্তু আমি সে কথা ভাবছিনা এখন। ভাবছি ব্যাসদেবকে পেলে একবার জিজ্ঞেস করতাম আমি, আচ্ছা মহাশয়, কুরুক্ষেত্র বাদ দিয়ে মহাভারত লিখলে কী এমন মহাভারত অশুদ্ধ হতো আপনার ?

কিন্তু কোথায় পাবো আমি তাঁকে ?

লক্ষ্মীকান্তপুর লোকালে আগুন

রণজিৎ রায়চৌধুরী

লোক গিস গিস ভিড় প্লাটফর্মে। ট্রেনটা ষ্টেশনে ভাল করে না থামতেই যাতে উঠে পড়ে বসার জায়গা নেওয়া যায় সে জন্যে সবাই দারুণ সতর্ক হয়ে প্লাটফর্মের ধার বরাবর দাঁড়িয়ে। একটা আন্তর্জাতিক মানের একশ মিটার দৌড়ের প্রতিযোগীর প্রত্যয় ও উন্মুখতা নিয়ে সবাই তৈরী দৌড় শুরুর দাগে। হবার কথা ষ্টার্টের হুইসল্, কিন্তু হল···ওভার হেড তারে বিদ্যুৎ বন্ধের দরুণ আপট্রেন না আসায় ছটা বারো মিনিটের ডাউন লক্ষ্মীকান্তপুর লোকাল ছাড়তে বিলম্ব হবে। ভিড়ের নার্ভ শিথিল—শালাদের কোন কাজ নেই···

শুয়োরের বাচ্চা···

মিনিটে মিনিটে ভীড় আরো আরো জমাট হচ্ছে। ঘড়িতে ছটা সাতচল্লিশ। মাইক গমগমিয়ে উঠল—ছটা বারো মিনিটের লক্ষ্মীকান্তপুর লোকাল তের নম্বর প্লাটফর্ম থেকে ছাড়বে। দশনম্বর প্লাটফর্ম থেকে হুটপুটিয়ে তের নম্বরে যেতে যেতে ক্লান্তিতে ঘামে বিরক্তিতে ফেটে পড়ছে ভীড়···এই জন্যেই শালারা মার খায়···এই সাউথ লাইনেই যত বদমাইসি···নর্থ হলে এতক্ষণে আগুন জ্বলে যেত···কেউ শালা প্রতিবাদ করবে না তো হবে না···তের নম্বর প্লাটফর্মে গাড়ী আসতেই ওঠা নামার ধ্বস্তাধ্বস্তিতে চিৎকার করে উঠল একটা বাচ্চা। সঙ্গে সঙ্গে তার মায়ের আর্তনাদ—ছেলেটা পিষে যাবে যে, একটু মানুষের মত উঠুন। মিনিটের মধ্যেই বসার ও দাঁড়াবার জায়গা পরিপূর্ণ।

চার জনের একটা দল আট হাঁটুতে কাপড় আটকে তাস খেলার আয়োজন করছে। কেউ কেউ থিতু হয়ে বসে এবার উঠে সিটটা একটু ঝেড়ে নিচ্ছে। কেউবা সিটের ফুটো দিয়ে ছারপোকার কামড় বন্ধ করার জন্য কাগজের ছোট ছোট টুকরো মুড়িয়ে ফুটোয় দিচ্ছে। কিছু ছেলেমেয়ে এই ভিড়ের মধ্যেও নিজেদের জন্য জায়গা রেখে সিট দখল করেছে। ওরা কৌটো ঝাঁকিয়ে পার্টি তহবিলে চাঁদা তুলছিল ষ্টেশনে। বলাবলি করছিল ভালই সাড়া পেয়েছে চাঁদা তোলায়। ওভাবে বসতে পেরে অনেক পাওয়ার পরিতৃপ্তি ওদের চোখে মুখে। আরো ওপাশে একজোড়া ছেলেমেয়ে পাশাপাশি গায়ে গা লাগিয়ে মাথায় মাথা ঠেকিয়ে সামনে ঝুকে একটা চিঠি পড়ছে—আড়ষ্ট হাসিমুখে। কেউ কায়দা করে বিড়ি ধরাল একটা। কেউ বলল—দাদা, অত চাপছেন কেন? চাপছি কি আর, চাপাচ্ছে যে—তড়িৎ প্রত্যুত্তর। অন্য এক দিকে কয়েকজন নাকমুখ কুঁচকে উঃ উঃ করতে করতে হেসে হেসে বলল—কে আছেন দাদা, দয়া করে বাইরে সেরে আসুন। এরই মধ্যে 'দাদা একটু ভেতরে যাব' বলতে বলতে মাঝবয়সী লোকটি দুই সারির মাঝখানে চলে এলো। ময়লা কাপড়ে সিটে বসা ক্লান্ত মেয়েটিকে

বলল—কোথায় যাবে গো মেয়ে? নারকান্তপুর—নির্জীব উত্তর। আমরা টিকিট কেটে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যাব আর তুমি বিনা টিকিটে বসে বসে যাবে, ওঠো ওঠো। মেয়ে উঠতে চায় না—আমি একলা উঠলিই কি সবাই বসতি পাবে। —টিকিট নেই আবার জ্ঞান দেয়, ওঠো—বসেছে বসুক না আবার ওঠাচ্ছেন কেন, আপনার তো টিকিট দেখা কাজ নয়—পাশের দাড়ানো ছেলেটি বলল। এই, এই করেই ত এরা এত মাথায় উঠেছে, আমাদেরই একতা নেই—কয়েকজনের হাঁকপাক। মেয়েটি শরীরে একটা অনিচ্ছুক ভঙ্গী তুলে উঠেই নীচে বসে পড়ল। একতা—ছেলেটি তাচ্ছিল্য ঝরালো—কার সঙ্গে কার একতা? কটা মান্থলি টিকিট কাটা লোকের একতা? মনে রাখবেন এই ট্রেনের দু দশটা লোক বাদ দিয়ে আর সকলেরই ঐক্যবদ্ধ হওয়া উচিত এ অবস্থার প্রতিকারের জন্য, আসলে দু পাঁচলাখ লোক বাদে দেশের সকলেরই ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। সমস্ত জায়গাতেই যা দরকার, পাওয়া যাচ্ছে তার কয়েক লক্ষগুন কম। আর, আর সেই জন্যেই আমাদের মধ্যে কাড়াকাড়ি, মারামারি, অনৈক্য। নিজেরা ঝগড়াঝাটি করে করে একদিন মরে যাব, বংশধরদের জন্য আরও আরও অনৈক্য আর অনিশ্চয়তা রেখে যাব। আমি জোর দিয়ে বলতে পারি ট্রেন আরো বেশী হলে আপনারা ওকে তুলে দিতেন না। —হ্যাঁ তাতো ঠিকই গাড়ী বেশী হলে চোরেদের মজা—বেশী বেশী পাখা, জানলা সিট সব পাবে তারা—একজনের চালাক চালাক স্বর। বেশী বকাবেন না ওকে, নেশাটেশা করেছে হয়ত—আর একজনের সন্দেহ।

চাঁদা তোলা ছেলেমেয়েদের কথা শুনতে শুনতে সিটের কোনা ধরে দাড়িয়ে থাকা পিঠ অব্দি ভেজা খদ্দরের জামা পড়া বৃদ্ধ লোকটি বললেন—তোমরা বুঝি পার্টি করো? হ্যাঁ, দেখুন না সারাদিন চাঁদা তুলেছি—সমস্বর জবাব।

—দেখলাম তো কি ভাবে নিজেদের জন্য সিট রাখলে। সামান্য সিটের জন্যেই যদি এই হয় তবে স্কুল কলেজে ভর্ত্তি, চাকরি, পারমিট, কণ্ট্রাক্টরী, মন্ত্রীত্ব এসবের জন্যে কি করবে তাতো বোঝাই যাচ্ছে—

এভাবে তুলনাটা ঠিক নয়—বলল একজন। আরে দাদু বসতে চাইছে—আরেকজনের প্রকাশ।

বৃদ্ধ রেগে গেলেন—বসতে চাওয়ার জন্যে বলেছি? জানো গান্ধীজীর ডাকে বিয়াল্লিশের আন্দোলনে জেলে গিয়েছি। জানো চার বছর জেল খেটেও তাম্রপত্র আর স্বাধীনতা সংগ্রামী পেনশন নিই নি।

—আহা হা কেন নিলেন না?

দেশ সেবার পারিশ্রমিক চাই না বলে, দেশের মানুষের দুঃখ দুর্দশা ঘোচাতে পারিনি বলে—বৃদ্ধ হাঁপাচ্ছেন।

—ভাল ঢাকী হয়েছেন দাদু, বেশ তো ঢাক পেটাচ্ছেন—ট্রেন ছেড়ে দিল। ঘড়িতে চোখ রাখল এক গম্ভীর উদাস চোখের মেয়ে, ছটা চুয়ান্ন।

যাক ছাড়ল তাহলে, নিন কল দিন রামবাবু—তাস পার্টির বিনয় সেন বললেন।

ইলেকশনে কে জিতবে বলুন তো—তাস গোছাতে গোছাতে রামবাবুর প্রশ্ন।

ওসবে আমার ইণ্টারেস্ট নেই, যে যায় লংকায় সেই হয় রাবণ—গোকুল বাবুর রায়—নতুন শাসন দেখলাম তো পাঁচ বছর। ত্রিশ বছরের দুঃশাষণ তো আর সীমিত ক্ষমতায় দূর করা সম্ভব নয়। খেটে খাওয়া মানুষের কিছু রিলিফ তো হয়েছে—গাড়ীর দুলুনিতে ঝুকে পড়লেন রামবাবু। শিক্ষা ব্যবস্থার তো বারটা বাজতে চলল; ইংরেজি তুলে দেওয়া হচ্ছে। গ্রামের মানুষের দু একটা চাকরী যাও জুটত তাও আর হবে না। ওদিকে মন্ত্রীদের ছেলে-মেয়েরা ইংলিশ মিডিয়মেই পড়ছে—গৌরী বাবুর খেদ।

মাতৃভাষায় শিক্ষা প্রচলনে এত জ্বলুনি কেন মশাই—রামবাবুর উষ্মা।

আমার তো মনে হয় সবাই বোঝে কেউ কিছু করতে পারবে না। তাই ব্যর্থতা ঢাকতে একদল শিক্ষা সংস্কার নিয়ে পড়ল তো আর একদল সংকোচন বিরোধী আন্দোলনে নামল। লোকের অবস্থা যে তিমিরে সেই তিমিরেই রইল—গোকুল বাবুর প্রতিবেদন। আপনি মশাই সিনিক হয়ে যাচ্ছেন, হতাশা ছড়াচ্ছেন। রামবাবু সিগারেটে আগুন ধরাতে ধরাতে বললেন। নিন কচকাচি ছাড়ুন তো আপনারা। আমরা কেউ দেশোদ্ধার করতে যাচ্ছি না। আমার একটা নো ট্রাম্প—বিনয় সেন কল দিলেন।

গেটের দুপাশে কিছু কৃষক মহিলা বসে থাকায় ষ্টেশনে গাড়ী থামলেই লোকজনের ওঠানামার ব্যাঘাত হচ্ছে। প্রতি ষ্টেশনেই কেউ না কেউ খেঁকিয়ে উঠছে—জমিদারী পেয়েছে, বসে রয়েছে, উঠে দাঁড়াও বলছি।

ওরা নির্বিকার। একটা ষ্টেশনে গাড়ী ছাড়ার কিছু পর গেটে মেয়েলি সুরে কান্না উঠল—ওরে আমার কি সর্বনাশ করলো গো মনিবের পেট্রল ফেলে দিলে গো…চোখে ওলাওঠা হয়েছে গো টেমনা বেটার…। ওকে ছাপিয়ে আর একটা ধমকানি গর্জে উঠল—চুপ কর্। পথের ধারে বসেছিস কেন? হঠাৎ আগুন, আগুন, রব উঠল। কার ফেলা পোড়া বিড়িতে পেট্রলে আগুন লেগে গেছে। কামরা জুড়ে হুটোপুটি, চিৎকার, কান্নাকাটি আতঙ্ক। দাউ দাউ আগুন জ্বলে উঠল সেকেণ্ডেই।

হঠাৎ উত্তেজনায় কয়েকজন তো লাফিয়েই পড়ল বাইরে। সিট থেকে মেয়েটাকে তোলার বিপক্ষে বলা ছেলেটা একটা সিটের কোণায় কোন রকমে দাঁড়িয়ে বলল—হুটোপুটি করবেন না। গেট ছেড়ে কামরার দেয়ালের দিকে চলে যান। একা শুধু নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করলেই বিশৃঙ্খলা হবে। তাতে সবাই মরব আমরা। এ্যালার্ম কাটা। দেয়াল ভাঙ্গা ছাড়া পথ নেই। কামরার দেয়াল চোরেদের কল্যাণে দুর্বল হয়ে আছে। কয়েকজন একসঙ্গে মিলে লাথি মারি আসুন।

জেলখাটা বৃদ্ধও বললেন—হ্যাঁ, লাথি মারুন সবাই। চাঁদা তোলার ছেলেরাও এগিয়ে এলো। ক'টা লাথি পড়তেই মচমচিয়ে ভেঙ্গে গেল দেয়াল। মানুষ গলবার মত পথ হল একটা। তাদের দেখাদেখি অন্যদিকের দেয়ালও ভেঙ্গে ফেলল লোকেরা। ছেলেটির অনুরোধ—দয়া করে এক এক করে পাশের কামরায় যান। কিন্তু কয়েকজন সে কথা শুনল না। মেয়েটাকে তুলে দেয়া লোকটা আগে যাবার তাগিদে বৃদ্ধকে একটা ধাক্কা মেরে ফেলে দিল। বৃদ্ধ পড়ে গেলেন। তার বুক পকেট থেকে গান্ধীর ছবিটা ছিটকে আগুনে পড়ল। ছেলেটি বলল—দাদু আপনার কি যেন আগুনে পড়েছে। দাদু ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন—ওটা বাঁচাতে পারবো না, পুড়ে যাবেই বুঝতে পারছি। ইতিমধ্যে নতুন ষ্টেশনে গাড়ী থামতে আরম্ভ করেছে। আগুন আগুন চেঁচাতে চেঁচাতে যে যার প্লাটফর্মে নেমে পড়ছে। ভীষণ আগুন ধরে গেছে। ছেলেটিও বেরিয়ে আসতে গিয়ে দেখল বৃদ্ধ পড়ে আছে—নিথর মৃত।

বড় সাচ্চা মানুষ কিন্তু ভুল চেতনায় লালিত—ছেলেটা চলে আসতে আসতে স্বগতোক্তি করল। প্লাটফর্মে নেমেই ছেলেটি চকিতে বুকে হাত দিয়ে বুঝতে চাইল তার বিশ্বাসের ছবিটা ঠিক ঠিক আছে তো?

একান্নবর্তী

শচীন দাশ

আমার বাবা ব্রজমাধব রায়ের সাত ছেলেমেয়ে। বড়দি ও মেজদিকে বাদ দিয়ে আমরা পাঁচ ভাই ছাড়াও বাবার আর একটি ছেলে ছিল। শুনেছি, দেখতে শুনতে আর উপস্থিত বুদ্ধিতে সবাইকে অবাক করে দিয়ে আস্তে আস্তে সে বড় হচ্ছিল। কিন্তু বেশিদিন বাঁচেনি। কী এক ধরনের জ্বরে ভুগে মাত্র সাত দিনের ভেতরেই হঠাৎ সে মারা যায়। সে সব কতদিন আগেকার কথা। তখনও দাঙ্গা বাঁধে নি, দেশ বিভাগও হয়নি। আমরা সব ছোট ছোট। হাসছি-কাঁদছি ঘুরছি-বেড়াচ্ছি আর একে ওকে মেরে ধরে চুল টেনে, চিমটি কেটে, কিল ঘুষি ও চড় বসিয়ে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে সারা দিনই বাড়িটাকে মাথায় করে রাখছি। রোজই সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত কেউ না কেউ বাড়িতে এসে নালিশ করে যেতো। হয় আমাদের নামে অভিযোগ করত, না হয় আমরা পরস্পর ঝগড়াঝাঁটি আর মারামারি করে একে অপরকে দোষ দিতে দিতে মার কাছে ছুটে যেতাম, বাবাকে নালিশ করতাম।

বাবা বলতেন, 'তোরা কি চিরকালটা এমনি করে কাটাবি! ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়া আর মারামারি কেউ কখনো শুনেছে। বড় হচ্ছিস, লেখাপড়া শিখছিস, তবু এই অবস্থা। ছি-ছি-ছি—

বাবার কথায় আমরা লজ্জা পেতাম ঠিকই, কিন্তু ওই পর্যন্তই। পরের দিনই আবার যথারীতি শুরু হত আমাদের দৌরাত্ম্য।

শেষে তিতিবিরক্ত হয়ে গল্পের সেই বুড়ো লোকটার মতো বাবা একদিন আমাদের ডেকে বললেন, 'একটা করে সরু লাঠি নিয়ে আয়।' সবাই তা আনলে সেগুলোকে এক সঙ্গে বেঁধে সেই বাণ্ডিলটা দাদার হাতে দিয়ে বললেন, ওটা ভেঙে ফেলতে। দাদা পারলনা। দাদার পর আমরাও চেষ্টা করে বাণ্ডিলটা ভাঙতে না পারায় বাবা এবার বাণ্ডিল থেকে লাঠিগুলোকে খুলে আলাদা করে আমাদের হাতে দিয়ে সেগুলোকে ভাঙতে বললেন। এবার আর কষ্ট হল না। মট মট করে সবগুলো লাঠি সবার হাতেই ভেঙে গেল।

বাবা বললেন, 'এই—। এই হল কথা। সবাই এক সঙ্গে মিলেমিশে থাকলে কেউই আর কিছু করতে পারবেনা তোদের। কিন্তু একা থাকলেই বিপদ। ওই লাঠিগুলোর মতই সব মট মট করে ভেঙে পড়বি।'

বাবার কথায় কী না জানি না, তবে এর পরে পরেই আমাদের চরিত্রের অনেক পরিবর্তন ঘটল।

অবশ্য পরিস্থিতিও ততদিন বদলে গেছে অনেকটা। যুদ্ধের মাঝামাঝি নেমে এসেছে দুর্ভিক্ষ। চারদিকে হাহাকার। মানুষ মরছে পটাপট। এমন কি তার হাত থেকে আমাদের পূর্ববঙ্গের সেই গঞ্জ শহরটারও রেহাই ছিল না।

শহর বলতে আমতলি। বরিশাল থেকে বেশ কয়েকটা নদী পেরিয়ে স্টিমারে করে পটুয়াখালি। সেখান থেকে স্টিমার বদলে বরগুণা, বরগুণা থেকে উন্মত্ত পায়রা নদী পাড়ি দিয়ে আমতলি। আমাদের গঞ্জ শহর। একদিকে রেজেস্ট্রি অফিস, তহশীল অফিস, সরকারী ডাক্তারখানা, বাজারহাট, অন্যদিকে নদীর ধারে থানার একটা সুন্দর বাংলো বাড়ি। ওপরে লাল টিনের চালা। বড় বড় দরজা জানালা। ঝকঝকে ফার্নিচার। যোগাযোগ বলতে একমাত্র স্টিমারে, না হলে চারদিকেই জল, সভ্য দুনিয়া থেকে একদম বিচ্ছিন্ন।

মনে আছে একবার থানার ঘাটে ভীষণ উত্তেজনা। স্টিমার আসছে না দুদিন ধরে। ঝড় নেই, বৃষ্টি নেই, নদীর অবস্থাও ভাল, অথচ স্টিমারের দেখা নেই। কেন? কী ব্যাপার! ব্যাপারটা জানা গেল পরের দিন। সকালের স্টিমারটা জেটিতে এসে ভিড়তেই খবরটা ছড়িয়ে পড়ল। দাঙ্গা। দাঙ্গা লেগেছে চারপাশে।

দাঙ্গা কী—এটা তখনও বুঝতে পারি নি। তাই অনেককে জিজ্ঞেস করেছিলাম। পরে অবশ্য জেনেছিলাম দুই সম্প্রদায়ে মারামারি। ঝগড়া। কিন্তু ঝগড়াটা কী নিয়ে? দাদা বলেছিল, জমি নিয়ে, বাবা বুঝিয়েছিলেন, দেশ নিয়ে। ওরা আলাদা হয়ে যেতে চায়। নতুন একটা দেশ চায়!

এরই মধ্যে একদিন শুনলাম যতীন সেন আসছেন, বরিশালের বিখ্যাত নেতা। আমরা পাঁচ ভাই ইতিমধ্যে দৌড়েছি। কিছুই বুঝি না কিছুই জানি না, তবু কালিবাড়ির মাঠে টেবিল-চেয়ার পাতার খবরে আর বসে থাকতে পারি নি। ততক্ষনে মাঠের আনাচে কানাচে মানুষের ভিড়। পতাকা উড়ছে। গলায় বন্দেমাতরম ধ্বনি।

আমার খালি পা খালি গা পরনে দড়ি বাঁধা ইজের। দাদাদের সঙ্গে উৎসাহ নিয়ে মীটিং শুনছি, হঠাৎ কে একজন এসে দাদার কানে কানে বলল, মনু তোমরা বাড়িতে যাও গিয়া। তোমাগো ঠাকুরমায় মরতে আছে···

সঙ্গে সঙ্গে ছুটলাম। বাড়িতে গিয়ে দেখি বাবা হাউ হাউ করে কাঁদছেন। মার চোখেও জল। মুখে আঁচল চাপা।

সন্ধ্যের দিকে টিপ টিপ বৃষ্টি শুরু হল। শ্রাবণের আকাশ। ঝিরঝির করে পড়েই চলেছে। তারই ভেতরে পাড়ার অনেকের সঙ্গে ঠাকুমার দেহটা নিয়ে চলে গেলেন বাবা। আমিও যেতে চেয়েছিলাম। কিন্তু ছোট বলে যেতে পারলাম না। তাই কেঁদে কেঁদে এক সময় কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম খেয়াল ছিল না। খেয়াল হল পরের দিন সকালে। ঘুম ভাঙতেই তাকিয়ে দেখি বাবার পরনে কোরা ধুতি, গলায় একটা চাবি ঝুলছে। কিন্তু এত গম্ভীর কেন বাবা? উঠোনেই বা এত লোক দাঁড়িয়ে কেন? দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওরা কী বলছে? নিচে গিয়ে দাঁড়াতেই শুনলাম, ওরা পার্টিশানের কথা আলোচনা করছে। খুব শিগগির নাকি এদেশটা আলাদা হয়ে যাচ্ছে।

ঠিক এক মাস বাদে একদিন ওপাড়ার যুগীর মা মা-র কাছে এসে বলল, মা ঠাইরেন, হইয়্যা গেল···দ্যাশ ভাগ হইয়্যা গেল। অখন থিকা আমাগো আমতলিরে নাকি সগলে পাকিস্তান কইবে।

—কেডা কইল তোরে!

—কইবে আর কেডা? রাস্তায় গিয়া দ্যাখেন!

মা চুপ করে বসে রইল। ভেতরের ঘরে বসে পড়াশুনা করছিলাম আমরা দুই ভাই। সঙ্গে সঙ্গে উঠে দৌড়ালাম, গিয়ে দেখি রাস্তায় রাস্তায় ব্যাণ্ড বাজছে। দোকানের মাথায় নিশান উড়ছে পতপত করে চিনেকাগজের শেকল তৈরী করছে মকবুল আর আকবর। অর্থাৎ দেশ স্বাধীন। দেশ ও দু টুকরো। সন্ধ্যের পর বাবা এলেন। এসেই জানালেন, এখানে আর থাকা সম্ভব নয়। এবার পাড়ি দিতে হবে ওপারে। তখন দু চারজন করে আস্তে আস্তে অনেকেই চলে যাচ্ছিল ওপারে। ওপারটা কোন দিকে? এ প্রশ্ন তখন রাত দিনই মনে মনে ঘুরে বেড়াত। বাবাকে জিজ্ঞেস করতেই বাবা বললেন, কলকাতা! কলকাতায় আমাদের নিয়ে যাবেন তিনি। মা অবশ্য রাজী হল না এ প্রস্তাবে। নিজের ভিটে মাটি ছেড়ে কোথাও যাবে না। কিন্তু বাবা বোঝালেন। বললেন, এখানে আর কিছুতেই থাকা যাবে না। অবস্থা আরও খারাপের দিকে যাবে।

বাবার কথাই ঠিক হল। শেষ পর্যন্ত মাকে রাজী হতেই হল।

অবশেষে একদিন চোখের জলে বুক ভাসিয়ে এপারে চলে এলাম আমরা। প্রথমে বয়রা সীমান্ত এলাকা। সেখান থেকে বনগাঁ। বনগাঁয় এসে আমাদের অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠল। চান নেই। খাওয়া নেই। মাথার উপর শূন্য আকাশ। এক টুকরো চালাও নেই যে সেখানে গিয়ে মাথা গুঁজব। চারদিকেই থিকথিক করছে মানুষ। তারই ভেতরে ভেদবমি। কলেরায় মরছে কেউ কেউ। অগত্যা প্ল্যাটফর্মেই বসে বসে কাটিয়ে দিলাম দুটো দিন। তখন যে কীভাবে, কী ভয়ংকর অবস্থায় দিন কেটেছে সেটা ভাবলেও আজ বুক কেঁপে ওঠে। আসলে বাবা ছিলেন বলেই বেঁচে গেছি আমরা। কোথা থেকে যে কিভাবে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন আমাদের সেটা আমরা বুঝতেও পারিনি।

বাবা আসলে পুরুষকারে যতটা বিশ্বাস করতেন, ভাগ্যটাগ্য ততটা নয়। তা হলে বনগাঁয় এসে ক্যাম্পে না থেকে, দণ্ডকারণ্যে না পৌছে আমাদের নিয়ে সোজা শেয়ালদায় চলে যাবেন কেন? কেনই বা শেয়ালদায় দিন দুই থেকে হঠাৎ আবার রওনা হবেন যাদবপুরের দিকে। যাদবপুরে তখন জমি দখল চলছে। ঝাঁকে ঝাঁকে উদ্বাস্তুরা গিয়ে সেখানে উঠছে। বাবার পেছনে পেছনে আমরাও গিয়ে উঠলাম একদিন। চারদিকে জলা জমি। হোগলা বন আর কাঁটা জঙ্গল। তারই ভেতরে পেলেন এক টুকরো মাটি। কিন্তু সেটাকে ধরে রাখতে কী আপ্রান চেষ্টা। দিনে খানিকটা করে দরমার বেড়া আর খুঁটি পুঁতে বাড়ি

তৈরী হয়; রাতে সেগুলো ভেঙে দিয়ে যায় গুণ্ডারা রাত দিন হইচই। উত্তেজনা আর ভয়ে সারাদিন সারারাত দুশ্চিন্তায় কাটে আমাদের।

শেষ পর্যন্ত অবশ্য এই দুশ্চিন্তার অবসান হল। ততদিনে লড়াই করতে করতে অনেক ঘর-বাড়ি উঠেছে। নতুন নতুন লোক এসে আবার জমি দখল নিয়েছে। আস্তে আস্তে বাজার বসল। দোকানপাট বসল। কালী বস্ত্রালয়। রামকৃষ্ণ ভাণ্ডার। ইস্টবেঙ্গল সুইটস। তৈরী হল রাস্তাঘাট, স্কুল কলেজ আর হাসপাতাল।

একদিন ভোর রাতের দিকে বাবা মাকে নিয়ে হাসপাতালে গেলেন। সেখানে আমাদের এক বোন হল। বোনের নাম বুড়ি। বুড়ির জন্মের পরই যেন আমাদের অবস্থা খুলে গেল। বাবা সুপাত্র দেখে ধুমধাম করে বিয়ে দিলেন মেজদির। বড়দির আগেই বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। ছেলেমেয়ে নিয়ে তারাও পার্টিশানের সঙ্গে সঙ্গে এদেশে এসে উঠেছিল। ইতিমধ্যে দাদার একটা চাকরি হয়েছে। বাবার সঙ্গে রোজ সকালে সেও অফিসে বেরিয়ে যায়।

ঠিক ফাল্গুন মাসের মাঝামাঝি বাবা দাদার বিয়ে দিলেন। বিয়ের পর বছরই দাদার একটি ছেলে হল। ততদিনে মেজদা সেজদার ও চাকরি হয়েছে। বাবাই একে ওকে ধরেটরে চাকরি দুটো করে দিলেন। একদিন মেজদার জন্য মেয়ে দেখতে গিয়ে মাথা ঘুরে পড়ে গেলেন বাবা। অনেকে মিলে রাস্তা থেকে ধরাধরি করে ঘরে নিয়ে আসা হল বাবাকে। কিন্তু চব্বিশ ঘণ্টাও কাটল না। ডাক্তারদের হতাশ করে দিয়ে বাবা মারা গেলেন।

বাবার মৃত্যুর বছর খানেক বাদে একদিন মেজদার বিয়ে হল। মেজদার পরে সেজদা। রাঙাদা তখনও চাকরি পায়নি। সারাদিন কোথায় যে ঘোরে! ফেরে গভীর রাতে। এক একদিন ফেরেও না। যে দিন গভীর রাতে ফেরে সেদিন আর রাঙাদা প্রকৃতিস্থ থাকে না। মুখ থেকে তখন ভকভক করে গন্ধ বেরোয়। পা টলতে থাকে। কোনো রকমে দরজাটা খুলে একপাশে সরে দাঁড়াত মা। দাঁড়িয়েই সব টের পেয়ে চিৎকার চেঁচামেচি জুড়ে দিত।

রাঙাদাও অবশ্য চুপ করে থাকত না। মাকে প্রচণ্ড গালাগাল দিয়ে ভেতরে ঢুকে যেত। শেষে অস্থির হয়ে এক সময় কেঁদে ফেলত মা। মার কান্নার শব্দে বড়দা মেজদা উঠে পড়ত। সেজদা সেজবৌদিও বাইরে এসে দাঁড়াত।

অথচ আমার কিছুই করার উপায় নেই। পাশটাশ করে বসে আছি। তবুও চাকরি পাচ্ছি না কোথাও। রোজ নিয়ম করে সংসারের ফাই ফরমাশ খাটা আর গাদা গাদা অ্যাপ্লিকেশন করা এই ছিল একমাত্র ডিউটি।

হঠাৎ একটা ঘটনা ঘটল। একদিন সকালের দিকে রাঙাদা একটা মেয়েকে এনে ঘরে তুলল। মাকে জানাল, একে বিয়ে করেছে সে। এখন থেকে সে আমাদের সঙ্গেই থাকবে। চাকরি বাকরি করে না, তার ওপর একটা মেয়ের দায়িত্ব। মা প্রথমে ভয় পেলেও আপত্তি করতে পারল না। এই স্বভাবটাই মার চরিত্রে

একদম নেই। কোনো কিছুতেই না বলতে পারে না। সেজন্য কষ্টও কম পায় না।

বিকেলের দিকে ফিরে সেদিন সেজদা মেজদার মার ওপরে কি রাগারাগি। সেজদা তো বলেই ফেলল, তোমার জন্যই এটা হয়েছে। ছেলেটাকে লাই দিয়ে দিয়ে তুমি মাথায় তুলেছো। এখন কি আর কথা শোনে!

মা এবারে মৃদুস্বরে কি যেন বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই সেজদার সঙ্গে সুর মিলিয়ে মেজদা বলল, সবই তো তোমার জন্য। তুমি কেন বউ নিয়ে ওকে ঘরে ঢুকতে দিলে? এক পয়সা আনবার মুরোদ নেই, আবার বিয়ে করে বউ আনা! হুঃ—

বলতে বলতে মেজদারা চলে গেল। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে নীরবে চোখের জল ফেলে কাঁদতে লাগল মা!

বেশ খানিকটা বাদে মেজদা আমাকে ডাকল। বলল, একটা চাকরির কথা। বেলেঘাটার দিকে একটা জুট মিলে কেরানীর চাকরি। মাস মাইনে সামান্যই। তাতেই আমি লাফিয়ে উঠলাম। কিন্তু একটু পরেই আবার মন খারাপ হয়ে গেল। কেননা কলতলায় যেতে গিয়ে ততক্ষণে আমার কানে গেছে, মেজদার ওপর রাগারাগি করছে মেজ বৌদি। মেজবৌদির বক্তব্য—আমাকে না দিয়ে চাকরিটা কেন মেজবৌদির বেকার ভাইকে দিল না মেজদা। এই নিয়ে অনেক কথাকাটাকাটি। ঝগড়া। রাগ করে মেজবৌদি সেদিন কিছুই খেল না রাত্রে। আরও পরে রাত গভীর হলে আগের মতই রাঙাদা ফিরে এল। পা টলছে। মুখে গন্ধ। একটু পরে রাঙাদার ঘর থেকে চিৎকার। দৌড়ে গিয়ে দেখি নতুন বৌদিকে ধরে বেধড়ক মারছে রাঙাদা। বড়দা মেজদা ছুটে গিয়ে রাঙাদাকে ধরল। সেজদা হাতের লাঠিটা কেড়ে নিল।

পরের দিন সকালে মেজদার কথামত সেই জুট মিলে যাওয়ার জন্য পা বাড়িয়েছি ইতিমধ্যে মা এসে জানাল, সেজদা এমাসে সংসারের টাকা কমিয়ে দিয়েছে। সেজবৌদি বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে মাসখানেক বাপের বাড়িতে যাবে তাই এই অবস্থা। শুনেও না শোনার ভান করে বেরিয়ে যাচ্ছি, এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে সেজবৌদি এল। মেজবৌদির নামে মার কাছে একগুচ্ছ নালিশ করে গেল।

সন্ধের পরে ফিরে দেখি বাড়ির আশেপাশে ভিড়। ব্যাপার কি! ভেতরে ঢুকতেই বুঝলাম বড়বৌদির সঙ্গে বুড়ির প্রচণ্ড এক হাত হয়ে গেছে। কথায় কথায় রাগ চড়ে গিয়েছিল। বুড়ি ঠাস করে এক চড় বসিয়ে দিয়েছে বড়দার বড় মেয়ে পাপিয়ার গালে। ব্যাস। তাতেই বড়বৌদি বুড়িকে বঁটি নিয়ে তেড়ে গেছে। ভাগ্যিস বুড়ির চিৎকারে পাড়ার সবাই এসে বড়বৌদিকে ধরে ফেলেছিল।

অফিস থেকে ফিরে বড়দা সব শুনল। বড়বৌদি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বড়দার কাছে নালিশ করল। পাপিয়ার গালটাও তুলে ধরল। বড়দা আগেই ইনিয়েবিনিয়ে

নানারকম ভাবে মাকে বুঝিয়েছিল, এবার এসে সরাসরি বলল, মা পরশু ছুটির দিন। পরশু থেকেই আমি আলাদা হয়ে যাচ্ছি। এভাবে আর পারা যায় না। মা কোনো কথা বলল না। এবারেও তার সেই নীরবতা। আমি বাধা দিতে গেলাম। দাদা আমার দিকে কটমট করে তাকাল। সুযোগ পেয়ে মেজদা সেজদাও চলে এল। বলল, তাই ভাল মা। অশান্তির চেয়ে আমাদের সবার আলাদা আলাদা থাকাই ভাল। কাল থেকে আমরাও আলাদা হয়ে যাব।
এতক্ষণ চেপে রেখেছিল, এবার আর কান্নাটা লুকোতে পারল না মা। ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল।
পরেরদিন ছিল শনিবার। রবিবার সকালে ঘুম থেকে উঠতে না উঠতেই চোখে পড়ল, উঠোনে অনেক বাঁশ, কাঠ, দড়ি, পেরেক আর পাশাপাশি সাজানো দরমার বেড়া। বড়দা, মেজদা, সেজদা তিনজনে কিসব কথাবার্তা বলছে। রাঙাদাকেও দেখা গেল একসময়। এরপর সারাদিন চলল খুটখাট খুটখাট শব্দ। বেড়া উঠছে। বেড়া নামছে। একের পর এক ঘরের চারপাশ দিয়ে পরপর সমান মাপে দাঁড়িয়ে পড়ছে বেড়াগুলো। আর শব্দ হচ্ছে খুটখাট···খুটখাট···
আমরা এখন ভাবছি। আর ভাবতে ভাবতে ক্রমশ টুকরো টুকরো হচ্ছি।

গণেশজী

শম্ভু চক্রবর্তী

গণেশজী কি জয়।

গণেশজীকে প্রণাম জানিয়ে আজ আমরা গণেশজীর বিষয়ে দু-চার কথা বলা শুরু করছি।

কিছুদিন আগে আমার ভাইপো শ্রীমান বিষ্ণুরামের বিয়ে হ'ল। গণেশজীর কৃপায় বিষ্ণুরামের বিয়ের বরযাত্রীদলের মিছিল ছিল দেখবার মত। কলকাতার বেশ কিছু মানুষ অনেকদিন সেই মিছিলের কথা মনে রাখবে। আলো, গাড়ী, ব্যাণ্ডপার্টির লোক, পায়ে হাঁটা মিছিল, সব মিলিয়ে বিশাল সেই শোভাযাত্রায় কথা কেইবা ভুলতে পারে? তবে সেদিন সবকিছুর উপরে নজর কেড়েছিলেন আমাদের গণেশজী। মিছিলের আগে আগে চলছিল প্রায় দোতলা উঁচু এক রথ-গাড়ি। পাঁচটা সুন্দর সাদা ঘোড়া সেই রথগাড়ীটা টানছিল। গাড়ীটা টিউবলাইট, ফুল আর আর কলাগাছ দিয়ে সাজানো ছিল। আর বেদীর ওপর বসে ছিলেন গণেশজী। কি সুন্দর সেই সেই মূর্তি, কুমারটুলি থেকে তৈরী করানো সেই প্রতিমা। রথ থেকে পথের দুপাশে আতর, গোলাপজল ছিটানো হচ্ছিল, মাইশোর থেকে আনা ধূপদানীর ধূপের গন্ধে চারদিকের বাতাস মেতে উঠেছিল।

সেদিন বিষ্ণুরাম আমাকে হঠাৎ একটা প্রশ্ন করে বসে। তার প্রশ্নে আমি প্রথমে একটু ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। সে তো ছোটবেলা থেকেই গণেশজীর পুজা-আর্চা দেখে আসছে, তবু সে কেন জিজ্ঞাসা করল, "কাকা আমরা সব ব্যাপারে এমন গণেশজীর পুজা করছি কেন?" প্রথমে ভাবলাম, ওর ওই প্রশ্নটা বোকার মত করা হ'ল। আবার ভাবলাম, আমাদের মধ্যে নাস্তিক তো কম নেই। কেউ হয়ত ওকে অন্যরকম বুঝিয়েছে। পরে মনে হ'ল, ও ঠিকই করেছে। দেব-দেবতা সম্বন্ধে, ধর্মের বিষয়ে জানবার কি শেষ আছে? রামায়ণের গল্পতো সবাই জানে। তাই বলে কি কেউ নতুন করে রামায়ণ পড়ে না। আমার বাড়ীতে তো প্রতিদিন সন্ধ্যায় রামায়ণ পাঠ হয়। সেখানে কত বুড়ো-বুড়ি হাজির থাকে। আমার মনে হয় ধর্মের কথা, দেব-দেবতার কথা যত শোনা যায় ততই মঙ্গল। এতে ধর্মভাব বাড়ে। তাছাড়া জ্ঞানের কথার কি শেষ আছে? তাই ধর্মের ব্যাপারে কোন প্রশ্ন যেকোন বয়সে করা যায়। তাই বয়স্ক বিষ্ণুরাম এমন প্রশ্ন করলেও তাকে বুদ্ধু ভাবা যায় না। তাছাড়া আপনাদের আর একজনের কথা বলি, নোকুলবাবুকে আপনারা অনেকেই চেনেন। আমার কারখানাগুলোর কোন ইউনিয়নের তিনি প্রেসিডেন্ট, কোন ইউনিয়নের সেক্রেটারী। তিনিও না কি কোন সমস্যায় পড়লে, কোন বিষয়ে ভালভাবে

জানতে চাইলে তাঁর নেতাদের নানা প্রশ্ন করেন। আমরা জানি, তিনি খুব পণ্ডিত লোক। তিনিও তো সবসময় মার্কস্, লেলিন, গান্ধীজির বই পড়েন। সে তো জানা জিনিসকে আবার ঝালিয়ে নেবার জন্য। তাই গণেশজী সম্বন্ধে এমন প্রশ্ন করায় আমি বিষ্ণুরামকে বোকা ভাবতে পারি নি। আর প্রথমে সন্দেহ হ'লেও বেশ খুশি হয়েছিলাম।

সেদিন আমি খুব ব্যস্ত ছিলাম। তাই বিষ্ণুরামকে বলেছিলাম, পরে একদিন এ বিষয়ে সব বুঝিয়ে বলব। আজ তাই আপনাদের সবাইকে ডেকে এনেছি। এখন আমরা গনেশজীর সম্পর্কে কিছু বলা শুরু করব। আমি পণ্ডিত ব্যক্তি নই। তবু আপনারা আমার কথা শুনতে চান। আমাকে আপনারা দয়া করে খুবই মানেন, এটা গণেশজীর কৃপা। তাঁর কৃপাতেই আমি একজন ছোট ব্যবসায়ী থেকে বড় শিল্পপতি হ'তে পেরেছি। মহা-ধার্মিক হিসেবে আমার একটু সুনাম আছে। আমার সাধারণ বুদ্ধি, ব্যবহারিক জ্ঞান, এসবের জন্য, ধার্মিক হবার জন্য মাঝে মধ্যে আপনাদের সামনে দেবতা, ধর্ম, ইত্যাদি ব্যাপারে আমার ব্যাখ্যা দিয়ে থাকি। এতে আপনাদের কোন উপকার হয় কি না জানি না, তবে আমার বেশ উপকার হয়।

আপনারা তো জানেন, পার্বতীকে সন্তুষ্ট করবার জন্য সব কাজে প্রথমেই গণেশজীর পূজার নিয়ম হয়েছে। কিন্তু আমরা, ব্যবসায়ীরা, সব কাজে কেন ঘটা করে গণেশজীর পূজা করি? গণেশজী আমাদের প্রথম দেবতা হলেন কেন? এ ব্যাপারে গণেশজীর চেহারা, তার বাহন, এ সমস্ত বিচার করলেই বোঝা যাবে, কেন তিনি আমাদের এত প্রিয়।

আপনারাতো গণেশজীর মুখটা কেন হাতীর মুখ, তা শুনছেন, আমি কিন্তু আমার জীবনের অভিজ্ঞতায় গণেশজীর হাতির মুখ হবার অন্য কারণ খুঁজে পেয়েছি। প্রথম জীবনে আমি ছিলাম ধান-চালের কারবারী। সেবার একরাতের মধ্যে আমার কয়েক ট্রাক চাল পাচার করার কথা ছিল। ট্রাকগুলো সময়মত রওনা দিল। কিন্তু রাস্তায় গেল আটকে। একটা বিশাল বটগাছ ঝড়ে পড়ে রাস্তা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। পুলিশের ভয় তো ছিলই, সময়মত মাল পৌঁছে না দিতে পারলে লোকসানের ভয়ও ছিল। দুঃখে, ভয়ে আমি "হায় গণেশজী, হায় গণেশজী" বলে বুক চাপড়াচ্ছিলাম। সেদিন গণেশজী কৃপা করে আমার সামনে এসেছিলেন। একটা সার্কাস কোম্পানীর দলও তখন সেখান দিয়ে যাচ্ছিল। তারাই নিজেদের হাতী দিয়ে রাস্তা পরিষ্কার করে নিল। সেদিন আমি বুঝেছিলাম। হাতীর মত তাগদ না থাকলে ব্যবসা করা যায় না। শরীর আর মনে যারা দুবলা, তারা চাকরি করতে পারে, অন্য কাজ করতে পারে, কিন্তু ব্যবসা করতে পারে না। আবার দেখুন। হাতীর খুব বুদ্ধি। ব্যবসা করতে হলেও বেশ বুদ্ধি লাগে। কিন্তু শরীরের তুলনায় হাতীর চোখ দুটো খুবই ছোট। কাছের জিনিসও হাতী

ভাল দেখতে পায় না। তা কারবারীর চোখও অম... হাওয়া দরকার। না হ'লে সকলের ভালমন্দ দেখতে দেখতে কারবারীর ব্যবসা লাটে উঠবে। সেজন্যই গণেশজী কারবারীদের দেবতা হয়েছেন।

এবার আসুন গণেশজীর হাতের বিষয়ে। প্রথমে বলি তাঁর চারটে হাতের কথা। আমাদেরও চারটা হাত আছে। দুটো হাত সবাই দেখতে পায়—তা এক নম্বরী। আর দুটো হাত থাকে লুকানো। সে হাত কালোবাজারী। তাই চারহাত নিয়ে গণেশজী আমাদের কৃপা ক'রে থাকেন।

আমাকে আজ অনেকেই শিল্পপতি বলে জানেন, এও তাঁর কৃপা। তাহলে আপনাদের একটা ঘটনার কথা বলি। তখনও আমি চাল-ধানের ব্যবসা করছি। সে সময়ে আমাকে এক বন্ধু পরামর্শ দিলেন কারখানা খোলার। আমি ভেবেছিলাম, একটা ধানকল করব। বন্ধু বলল, ধানকল থেকে কিছু হবে না, বরং একটা ঢালাই ঘর করা যাক। নানারকম মেশিনারী তৈরী হবে তাতে। আমি দোমনায় ছিলাম। বন্ধুটি একদিন একজন ইঞ্জিনীয়ার ভদ্রলোক আর একতাড়া কাগজপত্র নিয়ে আমার গদিতে এলেন। নানারকম ডিজাইন, ডায়াগ্রাম, মার্কেট রিসার্চে ভর্ত্তি সেইসব কাগজের তাড়া। আমি ভাবছি তো ভাবছিই। ইঞ্জিনীয়ার ভদ্রলোক বড়ই হাত পা নাড়ছিলেন। আমাকে বোঝাতে বোঝাতে তাঁর হাতে লেগে গদীর ওপরে রাখা গণেশজীর মূর্ত্তি হঠাৎ উল্টে দেয়ালের কোণে ধাক্কা লেগে কয়েকটা টুকরো হয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ল। আমি হায় হায় করে উঠলাম। ভদ্রলোককে আমি খুব গালাগালি দিতে যাব, এমন সময় তিনি আঙুল দিয়ে আমার কোলের দিকটা দেখালেন। বললেন, "দেখুন, দেখুন, আপনি কারখানা খুলতে ভয় পাচ্ছেন। কিন্তু গণেশজী আপনাকে কৃপা করেছেন। আপনার কোলের ওপর গণেশজীর চক্র পড়েছে। আমার আনা এই ডায়াগ্রাম দেখুন। কলের চাকাগুলো ঠিক চক্রের মত লাগছে না? নেমে পড়ুন। আর ভাববেন না।

তা সেদিন থেকে আমি লেগে পড়লাম, তারপর আমি বুঝতে পারলাম, গণেশজীর হাতের গদা আমাদের হাতেও আছে। ঐ গদা দিয়ে আমরা আত্মরক্ষা করি আবার ইউনিয়নকে পিষেও মারি। তাঁর শংখের শব্দের মতই আমাদের কারখানায় ভোঁ। এককালে শংখ বাজিয়ে মানুষ যুদ্ধ শুরু করত। কারখানার ভোঁ এখন কত মানুষকে যুদ্ধে ডাকে! আর তাঁর হাতে আছে পদ্মফুল। আমার মনে হয়, নিজে ফুল হাতে নিয়ে তিনি আমাদের ভজন-পূজনে মেতে থাকতে পরামর্শ দিচ্ছেন।অবশ্য আমাদের গোকুলবাবু একদিন অন্য ধরনের কথা বলেছিলেন। সে কথা পরে হবে। তার আগে আপনাদের গণেশজীর বাহন ইঁদুরের কথা বলি।

ইঁদুর তো মহা বজ্জাত। যা কিছু পায়, দাঁতে কাটে, নষ্ট করে, চুরি করে। ইঁদুরকে কেউ পছন্দ করে না, তাহ'লে গণেশজীর বাহন ইঁদুর হ'ল কেন?

ইঁদুরের কথা মনে হ'লেই আমার যুগলের কথা মনে পড়ে, সে ছিল আমার কুলি, তাকে আমি খুব বিশ্বাস করেছিলাম, তাই তাকে আমার একটা দু নম্বরী গুদামের ভার দিয়েছিলাম। যখন বাজার চড়ল, তখন গুদাম খুলি আমি অবাক, যুগল চুরি করে গুদাম ফাঁক করে দিয়েছে। যুগল বলল, "হুজুর বিশ্বাস করুন, আমি চোর নই। গুদামের মাটি খুঁড়লে তার প্রমাণ পাবেন।" "কিন্তু যুগলের কথা কে শোনে। গুদামের মেঝে খুঁড়ে আমি গুদামটাও বরবাদ করতে চাই নি। ততক্ষণ যুগলকে আমার অন্য লোকজন একটু বেশি মারধোর করে ফেলেছিল। সে মরেই যেত। আমিই তাকে বাঁচালাম। বড়ই দুঃখের কথা, সেই থেকে যুগলের একটা হাত নুলো হয়ে গেছে। সবই গণেশজী কৃপা। আরও দুঃখের কথা, সেই গুদাম আমাকে ভাঙতেই হল, পাকা করব বলে। তখন মাটির নীচে প্রায় দশ বস্তার মত ধান পাওয়া গেল। ইঁদুর তো সব খায় নি! জমিয়ে রেখেছিল। তা আমরাও তো ইঁদুরই, শুধু জমাই। দরকার না থাকলেও আমরা জমাই। জমাতেই থাকি। তাই গণেশজী কৃপা করে আমাদের তাঁর পায়ের কাছের ইঁদুর করেছেন।

এখন আপনারা নিশ্চয় বুঝলেন, গণেশজী আমাদের সিদ্ধি ও বৃদ্ধির কারণ। তাই আমরা তাঁকে সব কাজে স্মরণ করি। গদীতে, সিন্ধুকের মাথায়, কারখানায় ঢোকবার মুখে, বাড়ীর গেটে, গণেশজী শোভা পান। এখন কথা হচ্ছে, এদেশের অনেকেই তো গণেশজীর ভজন-পূজন করেন। তবু তাঁরা আমাদের মত সিদ্ধিলাভ করেন না কেন? এর কারন, তারা আমাদের মত গণেশ-অন্ত প্রাণ নয়। তারা গনেশজীকে নিয়ে নানা ঠাট্টা-ইয়ার্কী করেন। তারা যে বলেন, "গণেশ উল্টেছে", এটা কি উচিৎ কাজ। কারুর নাম গণেশ হ'লে সবাই তাকে তাচ্ছিল্য করে 'গণশা' বলে ডাকে। মোটাসোটা, বোকাসোকা কোন লোক দেখলেই তাকে "গোবর গণেশ" বলে গালি দেয়। তা, যে দেবতা সিদ্ধিদাতা, তাঁকে এত অবজ্ঞা করলে সিদ্ধিলাভ হবে কি করে? তাই আপনাদের বলছি। গণেশজীকে সবসময় ভক্তি করবেন—কখনো অবজ্ঞা করবেন না।

এবার গোকুল বাবুর কথায় আসি। গোকুল বাবু একদিন আমাকে গণেশজী সম্বন্ধে অন্য কথা শোনালেন। তিনি বলছিলেন গণেশজী ব্যবসার দেবতা নন। গণেশজী নাকি জ্ঞান প্রচারের দেবতা। সেজন্যই গণেশজীকে দিয়ে মহাভারত লেখানো হয়েছিল। গণেশজী জনগনের দেবতা। তাই তার আর এক নাম গণপতি। তাঁর হাতের পদ্মফুল জ্ঞানের প্রতীক। তিনি মহাজ্ঞানী। জনগনের এই দেবতা তাঁর কলম আর জ্ঞান দিয়ে একদিন না একদিন মানুষকে জাগিয়ে তুলবেন। গোকুল বাবুর মতে সেই রকম ঘটলে আমাদের দিন ফুরাবে। অবশ্য গোকুলবাবুর কথায় তেমন ওজন দিই নি। গণপতি তো আজকের নন, কয়েক হাজার বছরের দেবতা। জনগনকে তিনি এতদিনের মধ্যে জাগিয়ে

তুললে আমাদের আগে হাজার বছর ধরে রাজা, জমিদার, বণিক, মহাজন, কারবারী, শিল্পপতির জন্ম হত না। আমরা আছি এবং বেশ ভাল ভাবেই আছি। তবে আমাদের পরও আমাদের মত কেউ থাকবে কিনা, তা হলফ করে বলা যায় না। কারণ গোকুল বাবুর দেখানো একটা রং।

গোকুলবাবু বলছিলেন, আমাদের শাস্ত্রে নাকি গণেশজীর শরীরের রং লাল বলে বর্ণনা করা আছে। তাই গণেশজীর শরীরের এই লাল রং আমাকে বেশ ভাবিয়ে তুলেছে। আমি বুঝতে পারছি না। এই ভাবনার সত্যিই কোন হেতু আছে কি? এখন আপনারাই এর বিচার করুন।

চারুলালের আত্মহত্যা

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

ট্রাম থেকে হিরণ দেখল প্রেসিডেন্সী কলেজের সামনে ফুটপাথ দিয়ে চারুলাল উত্তরমুখো হেঁটে যাচ্ছে। হাতে একরাশ বই, চুল উস্কোখুস্কো। এতদূর থেকেও বোঝা যায় হ্যাণ্ডলুমের গেরুয়া পাঞ্জাবী বড় ময়লা হয়ে গেছে। চারুলালের কাছে পাঁচটা টাকা পাওনা ছিল—হঠাৎ মনে পড়ায় হিরণ হাত নেড়ে 'চারু' বলে ডাকল। চারুলাল শুনতে পেল না লক্ষ্য করে হিরণ তাড়াহুড়ো করে ট্রাম থেকে নেমে পড়ল।

নেমে খেয়াল হল যে তার ট্রামের টিকিট কাটা হয়ে গিয়েছিল। এসপ্লানেডের টিকিট। এখন যদি চারুলালকে না পাওয়া যায় তবে আর একবার টিকিট কাটতে হতে পারে। কিম্বা সে দ্বিতীয়বার যদি টিকিট না কাটে এবং পরবর্তী কোনো ট্রামের কণ্ডাক্টর যদি ভদ্র ও অন্যমনস্ক হয় তবে সে একবার ভাড়া দিয়ে এসপ্লানেড না গিয়ে অন্যবার ভাড়া না দিয়ে এসপ্লানেডে পেঁছুতে পারে। একটু অন্যমনস্ক হিরণ হাত তুলে একটা ধীরগতি ফিয়াট গাড়ীকে দাঁড় করিয়ে তার সামনে দিয়েই রাস্তা পার হল এবং যথাসম্ভব দ্রুত গতিতে ভীড় ঠেলে চারুলালের পিছু নেওয়ার চেষ্টা করল। সে হ্যারিসন রোড পার হ'ল এবং কলেজ স্ট্রিট মার্কেটের ডাবপট্টি পর্যন্ত এগিয়ে গেল। হিরণ একটু বেঁটে, ভীড়ের গড়াপরতা উচ্চতাকে অতিক্রম করে চারুলালের মাথা কিংবা পাঞ্জাবীর অংশ কোথাও দেখতে পেল না। তা ছাড়া চারুলাল যে সহজ সোজা পথে যাবে তারও কোন নিশ্চয়তা ছিল না—কেননা চারুলাল কবি, অন্যমনস্ক, অমিতব্যয়ী ও বিপথগামী।

হতাশ হিরণ একটু দীর্ঘতর শ্বাস ছাড়ল। হাতের টিকিটটার দিকে চেয়ে সে আর একবার অন্যমনস্ক হয়ে গেল। এ কথা ঠিক যে তার চিন্তাভাবনা সব সময়েই অর্থনীতির ধার ঘেঁষে যায়। এখন তাকে একজন ভদ্র ও অন্যমনস্ক ট্রাম-কণ্ডাকটর খুঁজে বের করতে হবে অথচ ব্যাপারটা ঠিক আইনমাফিক হবে না। হাতের ট্রামের টিকিটটা ক্রমশঃ তার অর্থনৈতিক চিন্তাকে উজ্জীবিত করে। সে ভেবে দেখছিল এ সব ক্ষেত্রে কণ্ডাক্টরের কাছে 'জার্নি ইনকমপ্লিট' লেখা কোনো ষ্ট্যাম্প থাকলে সে ভদ্রভাবে এবং আইনমাফিক লক্ষ্যস্থলে পেঁছুতে পারত।

যে স্টপেজে নেমেছিল আবার সে স্টপেজের দিকেই ফিরে আসছিল হিরণ। পুরানো বইয়ের দোকানের ধার ঘেঁষে, ফড়ে, দোকানী, ছাত্র-ছাত্রীর ভীড়ের ভিতর দিয়ে ইঁদুরের মতো দ্রুত গর্ত খুঁড়ে এগোতে গিয়ে সে লক্ষ্য করল কলেজ স্ট্রিটে মন্থর একটি ট্রাফিকজ্যাম সৃষ্টি হচ্ছে। 'ধুত্তোর' বলে ট্রাম-বাস

থেকে নেমে পড়ছে লোক। 'শালার মিছিল' হিরণের প্রায় কান ঘেঁষে একজন চলতি মানুষ বলে গেল।

হিরণ মিছিল ভালবাসেনা, আবার বাসেও। সে লক্ষ্য করল উত্তর দিকে কলেজস্ট্রিট হয়ে মাঝারি এক মিছিল সামনে লাল সালুর উপর রুপালী লেখা ভাসিয়ে দক্ষিণমুখো আসছে। অতএব কিছুক্ষণের জন্য এসপ্লানেডের ট্রাম-বাস বন্ধ। মন্দ নয়। হিরণ ভেবে দেখল মিছিলের সঙ্গ ধরলে সে দ্বিতীয় বারের ভাড়া সঞ্চয় করতে পারে এবং এসপ্লানেড পর্যন্ত এতটা পথ গোলেমালে কাটিয়ে দিতে পারে।

কিন্তু তার আর দরকার হল না। কেননা সে দেখতে পেল চারুলাল উল্টো-দিকের ফুটপাথে দাঁড়িয়ে এইমাত্র একটা সিগারেট ধরাল। 'চারু' বলে চীৎকার করে হিরণ হাত নাড়ল এবং থেমে-থাকা গাড়ী ও ট্রামগুলি অতিক্রম করে সে দেখল মিছিলটা ধীরগতিতে চারু আর তার মাঝখান দিয়ে বয়ে চলেছে। চারু মিছিল দেখছে। 'চারু' বলে আবার ডাকল হিরণ, আর সেই মুহূর্তে মিছিলের উন্মত্ত শ্লোগান···'চাই' ধ্বনিতে শেষ হলে হিরণ দেখল 'চারু' ও 'চাই' দুটি শব্দ মিলে মিশে 'চাইরু' গোছের একটা শব্দ ধ্বনিত হল। 'চাইরু' শব্দটা বিস্মিত হিরণ আপন মনে উচ্চারণ করল। কিমিদং। এর অর্থ কি! ভাবল সে। সে চারুকে আর ডাকল না, মিছিলটাকে চলে যেতে দিল। তার চারু-লালকে নিয়ে ভাবনা হচ্ছিল। কেন না চারুলাল ইতিমধ্যে পূর্বপশ্চিম বা উত্তরদক্ষিণ যে কোনো দিকে খামোকা রওনা হয়ে পড়তে পারে। কেননা ইতিপূর্বে সে চারুলালকে উত্তর দিকে যেতে দেখেছিল, এবং এখন দেখা যাচ্ছে যে সে আবার দক্ষিণ দিকে উজিয়ে এসেছে। চারুলালের চলাফেরার মধ্যে কোনো পরিকল্পনা নেই। কোনো লক্ষ্যে পেঁছুবার একমুখীনতা নেই। এবং আশ্চর্যের বিষয় এই যে বাস্তবিক মিছিলটা শেষ হওয়ার পর দেখা গেল চারুলাল যথাস্থানে নেই। পুলিশের কালো গাড়ীটা কয়েক মুহূর্তের আড়াল তৈরী করেছিল এবং সেটুকু সময়েই অস্থিরমনস্ক চারুলাল মত পরিবর্তন করেছে।

রাস্তা পার হয়ে হিরণ হতাশ হ'ল। কেননা কয়েক মুহূর্তের চিন্তায় ঠিক করে নিয়েছিল যে চারুলালকে পেলে জিজ্ঞেস করবে বাঙলা অভিধানে 'চাইরু' বলে কোনো শব্দ পাওয়া যায় কিনা এবং পাওয়া গেলে তার অর্থ কি। কেননা শব্দ সঞ্চয় করা চারুলালের স্বভাব এবং এইসব নিয়ে আলোচনা করাও তার প্রিয়। হিরণ ঠিক করেছিল শব্দ নিয়ে আলোচনা ক্রমশঃ জমে উঠলে সে একসময়ে আকস্মিক ভাবে হঠাৎ মনে পড়ার মতো করে পাওনা টাকাটার কথাও বলে ফেলতে পারবে। কিন্তু আপাততঃ চারুলালকে একটা সমস্যার মতো মনে হচ্ছে।

হিরণ কফিহাউসের মোড় থেকে কলেজ স্ট্রীটের মোড়ের লাল ডাকবাক্সটা পর্যন্ত

এবং লাল ডাকবাক্সটা থেকে কফিহাউসের মোড় পর্যন্ত মানুষের জঙ্গল ভেদ করে চারুলালকে বারকয়েক খুঁজে দেখল। অবশেষে হতাশ হয়ে আবার ট্রাম স্টপেজে দাঁড়াল হিরণ।

মানুষের চলাফেরার মধ্যে একটা অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য থাকলে হিরণ খুশী হয়। এমন মানুষকে ধরা ছোঁয়া বোঝা সহজ। অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যসম্পন্ন কোনো মানুষের সারাদিনকার চলাফেরার একটা ম্যাপ যদি আঁকা যায় এবং চারুলালের সারাদিনকার চলাফেরার আর একটি ম্যাপ যদি আঁকা হয় তা হলে দুই রকম মানুষের উদ্দেশ্য ও উদ্দেশ্যহীনতার একটা বাস্তব তফাৎ পাওয়া যেতে পারে। মনে মনে চারুলালের সম্ভাব্য গতিবিধির একটা ম্যাপ ছকে ফেলবার চেষ্টা করে দেখল হিরণ। কিন্তু ম্যাপটা ক্রমশঃ তার মনে নানাবিধ বক্র ও অর্ধবৃত্তাকার রেখায় এমন জটিল অ্যাবস্ট্রাক্ট রূপ ধারণ করল যে সে ভয় পেয়ে হাল ছেড়ে দিল, সহজ অন্য কিছু ভেবে দেখবার চেষ্টা করতে লাগল। এ কথা ঠিক যে চারুলাল কিংবা চারুলালের মতো মানুষগুলিকে হিরণ বোঝে না। তবে চারুলাল কিংবা চারুলালের মতো মানুষগুলি কি উদ্দেশ্য নিয়ে জটিল এবং অ্যাবস্ট্রাক্ট বক্ররেখাগুলিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে? এই জটিল এবং অ্যাবস্ট্রাক্ট রেখাগুলিকে হিরণ বোঝে না। হিরণ ভাবতে ভাবতে হাতে তখনো ধরে থাকা ট্রামের টিকিটটার দিকে তাকাল। সে এসপ্লানেডে যায়নি অথচ তার হাতে এসপ্লানেডের এই টিকিটটা বাতিল হয়ে গেল। এই অব্যবহৃত-উপযোগ সরবরাহে অক্ষম টিকিটটা তার কোন কাজে লাগবে? যদিও ব্যাপারটি দুর্বোধ্য তবু অস্পষ্ট তার মনে পড়ল একদিন কফিহাউসে চারুলাল বাড়তি কাগজ খুঁজে না পেয়ে এমন একটি ব্যবহৃত টিকিটের পিছনে তার কবিতার পয়েন্ট টুকে রাখছিল।

যতদূর মনে পড়ে কবিতাটার নাম চারুলাল দিয়েছিল 'শিল্পের কারণে আত্মহত্যা'। বাস্তবিক আলাদা আলাদা ভাবে ধরলে হিরণ শিল্প, কারণ ও আত্মহত্যা এই তিনটি শব্দের অর্থ বুঝতে পারে। কিন্তু এই তিনটি শব্দের দ্বারা বাক্য গঠিত হলে সে 'চাইরু' শব্দটার যে জটিলতা তেমনি এক জটিলতার সম্মুখীন হয়। হিরণ বুঝে উঠতে পারেনা শিল্পের কারণ ও আত্মহত্যার কারণ এক কিনা, কিংবা চারুলাল কি বোঝাতে চেয়েছে যে শিল্প আত্মহত্যার এবং আত্মহত্যা শিল্পের কারণস্বরূপ!

চারুলালকে হিরণ বুঝে উঠতে পারেনা। চারুলাল অদ্ভুত। একবার তারা দু'জন 'নাইট শো' সিনেমা দেখে ফিরছিল। ফুটপাতে এক গাড়ীবারান্দার তলায় জনা দশবারো লোক টান-টান হয়ে ঘুমাচ্ছে দেখে চারুলাল বলল 'দাঁড়াও'। হিরণ ফিরে দেখল অত্যন্ত অন্যমনস্ক চারুলাল হিরণের মুখের দিকে তাকিয়ে যেন কোনো পোকা মাকড় খুঁজছে এমনি ভঙ্গীতে বলল 'তোমার কি মনে হয় না যে এই লোকগুলো এখন প্রত্যেকেই ঘুমের ভিতরে স্বপ্ন দেখছে।' 'হতে

পায়ে।' হিরণ হেসে জবাব দিল 'তাতে কি?' খানিকটা যেন লজ্জা পেয়ে চারুলাল বলল 'না, কিছু না। আমার মনে হ'ল প্রতিবার পা ফেলে আমি ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন্ন ভিন্ন স্বপ্নগুলোকে মাড়িয়ে যাচ্ছি। অদ্ভুত।' খানিকক্ষণ নিঃশব্দে হেঁটেছিল তারা। একবার শুধু হিরণের অস্পষ্টভাবে মনে হয়েছিল চারুলাল তাকে পিছন থেকে 'হিরণ' বলে ডাকল, পিছু ফিরে হিরণ দেখল চারুলাল অন্যমনস্কভাবে হাঁটছে, তার দিকে চাইছে না। অস্ফুট স্বরে কিছু বলছিল চারুলাল 'ব্যাবিলনে…শূন্যোদ্যানে…স্বপ্নে…হিরণ কতবার গিয়েছি যে… স্বপ্নোদ্যানে…শূন্যে…ব্যাবিলনে…!'

হিরণ অন্যমনস্কভাবে এইসব রহস্যের কিনারা করবার চেষ্টা করছিল, এমন সময় একজন লোক ভদ্রভাবে তার সামনে দাঁড়িয়ে গাল চুলকোতে চুলকোতে জিজ্ঞেস করল 'আজকের খেলার রেজাল্ট কি দাদা?' মুহূর্তে সম্বিৎ ফিরে পেয়ে লোকটার কথার উত্তরে অস্পষ্ট 'জানিনা' বলেই সে ঘড়ি দেখল। ছ'টা বেজে পাঁচ মিনিট। সাধারণতঃ হিরণ উদ্দেশ্যহীনভাবে কোথাও বেরিয়ে পড়ে না, কিন্তু এখন চারুলালের কথা বেশ কিছুক্ষণ ভাববার পর, তাকে এ কথা বেশ কষ্ট করে মনে করতে হ'ল যে সে কেন এসপ্ল্যানেড যাচ্ছিল। মনে পড়ল গ্লোবের ছবিটা দেখবে বলে সে এসপ্ল্যানেড যাচ্ছিল, হল-এর সামনে অমিয় তার জন্য অপেক্ষা করবে। কিন্তু এখন আর গিয়ে লাভ নেই। খেলার মাঠের ভীড়, ট্রাম বাস বোঝাই হয়ে ফিরছে। ইষ্ট বেঙ্গল এক গোলে জিতেছে—চীৎকার শুনতে পেল হিরণ। ট্র্যাফিক জ্যাম, মিছিল, খেলার ভীড়—এই সবকিছুর মধ্যে স্বপ্নাবিষ্ট চারুলাল কোথায় থাকতে পারে ভেবে না পেয়ে হিরণ ধীরে অনেকদিন পর গোলদীঘির দিকে চলল।

চারুলাল সম্পর্কে কি একটা শেষ কথা জানবার ছিল হিরণের। এখনো জানা হয়নি। কিংবা কে জানে, হয়ত চারুলালকে জানবার ও বুঝবার মতো শক্তি হিরণের কোনদিন ছিলনা। তার আজ হঠাৎ মনে হ'ল অনেকদিন থেকেই সে চারুলালকে একটু অবহেলা করে এসেছে। দুঃখ হচ্ছিল চারুলালের জন্য। সে ট্রাম থেকেও দেখতে পেয়েছিল যে চারুলালের পাঞ্জাবীটা বড় ময়লা হয়ে গেছে; মনে পড়ল, চারুলাল বড় আস্তে আস্তে হাঁটছিল। এক মুহূর্তের জন্য হিরণ চারুলালের প্রতি গোপন ও তীব্র একটা আকর্ষণ বোধ করল। ব্যাবিলনে …শূন্যে…স্বপ্নোদ্যানে…কোথায় যেন যেতে চায় চারুলাল, হিরণ জানে না। অমন যাওয়ার ইচ্ছে হিরণের কখনো হয়নি। তাই সে কখনো বুঝতে পারেনা চারুলালের কল্পনার মধ্যে কেন একটানা দুশ' মাইল চরে এসে একটা শকুন হাওড়ার পুলের ওপর বসে, আর অন্যদিকে ইউনিকর্ণ, লাল-ইর্মালি, লিপটনের নিয়নগুলি দপদপিয়ে ওঠে, মন্থর ট্র্যাফিক কলকাতায় ক্রমশই কঠিনতর জ্যাম্-এর দিকে অগ্রসর হয়, কোনো কিছুতেই তার প্রয়োজন নেই বলে আবার হাওয়ায় ডানা ভাসিয়ে দেয় শকুন—গোপনে সে যেন কার প্রাণহরণ করে নিয়ে যায়।

'স্বপ্নের শকুন' নামক এই কবিতা হিরণ শুনেছে চারুলালকে খানিকটা বিখ্যাত করেছে।

গোলদীঘির ভীড় আগের তুলনায় অনেক বেড়ে গেছে, হিরণ লক্ষ্য করল। সে বুঝল ফাঁকা কোনো বেঞ্চ পাওয়া অসম্ভব। সে আস্তে আস্তে লক্ষ্য রেখে এগোতে লাগল। এবং ভাগ্যক্রমে একটা বেঞ্চে দু'জন বুড়ো মানুষ এবং তাঁদের পাশে একটা খালি জায়গা দেখে অবিলম্বে ঝপ্‌ করে বসে পড়ল হিরণ। নানা অনভ্যস্ত শিল্প চিন্তায় তার মাথা ঘুরছিল। টের পেল পাশের দুই বুড়োমানুষ তার বসার ভঙ্গী ও ঘাড় হেলিয়ে দেওয়ার ঢঙ্‌ লক্ষ্য করছে। বুড়োমানুষদের সঙ্গী হিসেবে ভাল লাগে হিরণের। এঁরা অচেনা লোক পাশে এসে বসলে অসন্তুষ্ট হলেও উঠিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন না। অন্য সময় হলে হিরণ এঁদের সঙ্গে আলাপ জমানোর চেষ্টা করত। আজ করল না, কারণ, তার মন অস্থির ছিল, ঠাণ্ডা বাতাস তার চোখে মুখে লাগছিল, ঘুম পাচ্ছিল হিরণের। সে চোখ বুজল। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সে নানা এলোমেলো স্বপ্ন দেখতে শুরু করল।

আধোঘুমের ভিতর সে শুনতে পেল পাশের বুড়োমানুষ দুজন অবিশ্রাম একঘেঁয়ে গলায় পূর্ববঙ্গের গল্প করে যাচ্ছে। সেখানে রোদ ছিল আলাদা, ঋতুগুলি ছিল ভিন্নরকম। তরমুজের ক্ষেত ও কাশবন—কশাড়ের জঙ্গল, বালুচর ও ব্রতকথার সেই দেশ ছিল। কেমন সেই দেশ—উনিশশো চৌষট্টির সেপ্টেম্বরের কলকাতা থেকে আধোঘুমের ভিতরে সেই দেশকে বিদেশ বলে মনে হয়। খাঁড়ি দিয়ে বিলের জল বর্ষাশেষে নেমে যেতে থাকলে কাকামশাই চাঁদা মাছ ধরতেন, খাঁড়ির জলে ধারালো ইস্পাতের মতো ঝলসে উঠতো রুপোলী ইলিশ। যেন শরৎকাল ঘন হয়ে এসেছে, পাল খাটানো হয়েছে—দুলে দুলে নৌকো চলেছে পূর্ববাঙলার দিকে, স্মৃতি, ও বিস্মৃতিময় দুটি নৌকো পাশাপাশি অনায়াস পাল তুলে উনিশশো চৌষট্টির কলকাতা ছেড়ে গেল। হিরণ রূপ কথার মতো সেই গল্প শুনছিল।

তারপর ঘাড় কাৎ করে হিরণ অনেকক্ষণ আধোঘুমের ভিতরে স্বপ্ন দেখল······ মাটির উনুনের আঁচে ইলিশ মাছের ঝোল ফুটছে, রূপশালীর ভাত ফুটছে ফুট্‌-ফুট্‌। কাঠের উনুনের ধোঁয়ার গন্ধ······আর দেখল উজান বিল, রাজহাঁস, কালকাসুন্দের ঝোপ ও জোনাকী পোকা। দেখল চারুলালের স্বপ্নের শকুন হাওড়ার ব্রীজ ছেড়ে গেল। বুড়ীগঙ্গা, বিশালাক্ষীর ওপর কশাড়বন ও কাশফুলের ওপর তার ছায়া বিস্তার করবে বলে। স্বপ্নের নৌকো ধীরে ধীরে দুলতে থাকে। ···হঠাৎ হিরণ চারুলালকে দেখছিল ইউনিভার্সিটির নতুন অন্ধকার উঁচু বাড়ীটার ভিতর ঢুকে যাচ্ছে—তড়িৎগতিতে অন্ধকার লিফ্‌ট্‌ চালু করল চারুলাল—সশব্দ ইলেকট্রিকের তার চারুলালকে টেনে নিতে থাকে, হিরণ প্রাণপণে সিঁড়ি ভাঙতে থাকে, চীৎকার করতে থাকে 'চারু চারু' বলে।

স্তূপাকৃতি সিমেণ্ট কংক্রীটের থাম ও সিঁড়ি পেরিয়ে এই অকারণ আত্মহত্যাকে নিবারণ করতে চায় সে। কিন্তু দ্রুত ধাবমান 'এলিভেটর' চারুলালকে শকুনের মতো ছোঁ মেরে তুলে নিচ্ছে হিরণ দু হাত তুলে বলতে থাকে, উদ্দেশ্য কি? তোমার উদ্দেশ্য কি চারুলাল? তুমি কতদূর যেতে চাও? ধাবমান 'এলিভেটর' থেকে চারুলালের দূরে গলার ধীর আবৃত্তি কানে আসে 'কতবার গিয়েছি যে হিরণ······স্বপ্নে······শূন্যোদ্যানে······ব্যাবিলনে।' হিরণ অন্ধকারে বিম-কাঠের ঠেকা, কার্ণিশ, জ্যামিতিক সিঁড়ি ও লিফটের খাঁচার অরণ্যকে লক্ষ্য করে হাল ছেড়ে দেয় হঠাৎ।

কিমিদং! এর অর্থ কি! হিরণ বোকার মতো ফ্যাল ফ্যাল করে ঘুম ভেঙে চেয়ে দেখল বেঞ্চটা খালি হয়ে গেছে। সন্ধ্যা রাত্রির দিকে গড়িয়ে গেল। গোলদীঘির দক্ষিণ কোণে ভীড় জমেছে খুব। কিছু একটা হয়েছে ওখানে। হিরণ ভালভাবে জেগে উঠে এইসব স্বপ্ন কিংবা স্বপ্ন ও চিন্তার সংমিশ্রণ পরিষ্কার করে নিতে চেষ্টা করল। কেননা সে তার জীবনে কখনো শিল্পের জন্য আত্মহত্যার কথা ভাবেনি, স্বপ্নের শকুনের কথাও না। উদ্ভটের প্রতি কোনো মোহ ছিল না হিরণের তবু কেন উদ্ভটই আজ তাড়া করে ফিরছে। তার ব্যাবিলন ছিলনা, মধ্যাহ্নের ভূতের মতো জাগর-স্বপ্ন ছিলনা,—তবু মনে হচ্ছে আজ চারুলালের ব্যাবিলন পিছু নিয়েছে তার। এ কি চারুলালের প্রভাব—সে অনেকক্ষণ চারুলালের কথা ভেবেছে আজ—সেই জন্যে?

গোলদীঘির দক্ষিণ কোণে গোলমালটা বেড়ে চলেছে। হিরণ দেখে অনেক লোক ছুটে যাচ্ছে ওদিকে। দারুণ ভীড়। কী হতে পারে। হিরণ ভাবল। পরমুহূর্তেই অকারণে অন্যমনস্ক হয়ে গেল হিরণ। আলস্যের সঙ্গে সে ভেবে দেখল চারুলালের সঙ্গে তার তফাৎটা কোথায়। দারুণ অভাব আছে চারুলালের সংসারে। চাকরীও খোঁজে চারুলাল—কিন্তু তেমন উৎসাহের সঙ্গে নয়। টিউশনি করে সে নিজের খরচ চালায়, গাঁটের ট্রামভাড়া খরচ করে নানা পত্রিকার অফিসে কবিতা ফিরি করে বেড়ায়। সংসারে কিছু দেয় চারুলাল —কিন্তু সে তেমন কিছু না। আর হিরণ বারো বছর বয়সে কলকাতার রাস্তায় একদিন ধূপকাঠি ফিরি করে বেড়াত, ঐভাবে কলকাতা চেনা হয় প্রথম উনিশশো সাতচল্লিশ থেকে। ক্রমশঃ চিনতে পেরেছে সে পথ ঘাট ও চরিত্র। হিরণ এখন সংসার চালায়—সংসারের তরুণ অভিভাবক সে—তাকে আয়কর দিতে হয়। এখন লোককে ধারও দিতে পারে হিরণ। পথ ঘাট ও চরিত্র হিরণের চেনা হয়ে গেছে। তবে কেন খামোকা চারুলালের ব্যাবিলন তার পিছু নেয়, কেন স্বপ্নের শকুনের কথা ভাবতে গেল হিরণ? 'দ্যাখো হে চারুলাল,' হিরণ মনে মনে বলল, 'আমাকে আয়কর দিতে হয়। বেশীর ভাগ অফিস-বাড়ী, কারবারী ও দোকানদারদের আমার জানা হয়ে গেছে। আমি যতদূর বুঝতে পারি বুলডোজারের মুখে তৈরী হচ্ছে পৃথিবী—সাদামাটা আমার চিন্তা।

কিন্তু তুমি একি তৈরী করছ চারুলাল—যা আমাকেও তাড়া করে দেখাছ!'

বিষন্ন হিরণ বসে দেখল গোলদীঘির দক্ষিণ কোণটা লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল। কিছু একটা হয়েছে ওখানে। কি হতে পারে। ভীড় দেখলে সাধারণতঃ উৎসাহী হয় হিরণ—ভীড়ের কারণ খুঁজে দেখে। কিন্তু আজ তার উঠতে ইচ্ছে করল না। কাউকে কিছু জিজ্ঞেসও করল না হিরণ। চুপচাপ বসে রইল খানিকক্ষণ। তারপর উঠে পড়ল। ধীরে ধীরে সে ভীড়ের কাছেই এসে দাঁড়ায়। কথাবার্তা না বলেও সে বুঝতে পারে কে একজন জলে পড়েছে—এখন তাকে তোলা হচ্ছে।

জলের মধ্যে কয়েকজন মানুষকে দেখতে পেল হিরণ, জলের ধারে একজন 'বিট'-এর পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে। ক্রমশঃ হিরণ দেখল জল থেকে কয়েকটা হাত একটা দেহকে ধরে তুলল। পুলিশটার পায়ের কাছেই শুইয়ে দিল তাকে। ভীড় ক্রমশঃ বাড়ছে, হিরণের দম নিতে কষ্ট হচ্ছিল। চলে যাওয়ার জন্য উদ্যত হয়েও আবার ফিরে এল হিরণ। লোকটা চেনাও ত' হতে পারে—কত লোককেই ত' চেনে হিরণ—এই ভেবে সে ভীড় ঠেলে সামনে এগোতে লাগল। রেলিঙের কাছে সে যখন এসে পোঁছোলো তখন লোকটাকে একটা স্ট্রেচারে শুইয়ে তোলা হচ্ছে। কিন্তু যতদূর মনে হ'ল লোকটা মারা গেছে—কাছাকাছি যারা ছিল তারা হতাশার ভঙ্গীতে মাথা নাড়ছিল।

বাহকেরা হিরণের চোখের তলা দিয়ে স্ট্রেচারটা ধীরে ধীরে নিয়ে গেলে প্রথমটায় একবার চমকে উঠেই কাঠ হয়ে গেল হিরণ। চারুলালের চোখ খোলা ছিল না, তবু হিরণের মনে হ'ল চারুলাল তাকে সারাক্ষণ দেখতে দেখতে গেল। এত কাছাকাছি ছিল চারুলাল! কিন্তু মুহূর্তেই পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে সচেতন হিরণ বুঝতে পারল এখন কোনো শব্দ করলে তার মুশ্কিল হবে। সে সাক্ষী থাকতে চায় না। নিঃশব্দে ভীড় ঠেলে বেরিয়ে এল হিরণ। পুলিশ চারুলালের পরিচয় ঠিক খুঁজে বের করবে। আপাততঃ হিরণের দায়িত্ব শেষ হয়ে গেল—স্থির নিশ্চিত ভাবে সে জেনে গেল যে চারুলাল আত্মহত্যাই করেছে।

'কিন্তু এটা কেমন হ'ল! 'এটা কি হ'ল হে চারুলাল,' মনে মনে বলল হিরণ, 'এমন ত' কথা ছিল না হে!' হিরণ গভীরভাবে অন্যমনস্ক হয়ে গেল। আজ বিকেলে চারুলালকে দেখবার পর থেকে যে সব অকারণ চিন্তা হিরণকে পেয়ে বসেছিল, এখন হিরণ টের পেল এর কোনো অর্থ আছে। এই আত্মহত্যা নিশ্চিত অকারণ—এর কোনো মানে নেই। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ এতদিনের মধ্যে কোনো দুর্ঘটনায় পড়েনি হিরণ—তার হাত পা অটুট আছে, ইন্দ্রিয়গুলি সতেজ ও কর্মক্ষম আছে। এইজন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। সে শিল্পের কারণ ও আত্মহত্যার প্রয়োজন ও উপযোগ বোঝে না বলে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ।

সম্ভবতঃ এতটুকুই আসবার কথা ছিল চারুলালের, এর বেশী নয়। হাত পা ইন্দ্রিয়গুলির মতো মৃত্যুও সহজাত—হিরণের একথা অজানা নয়। বেঁচে থাকলে চারুলালেরও মৃত্যু হত। সুতরাং চারুলাল নামক যে ব্যক্তিকে সে চিনত তার জন্য দুঃখ ছিলনা হিরণের। তার পরিতাপ ছিল চারুলালের পরিকল্পনাহীনতা ও উদ্দেশ্যহীনতা লক্ষ্য করে। নিয়তিকে কে ঠেকাতে পারে ? 'কিন্ত চারুলাল,' হিরণের ঠোঁট নড়ছিল 'এ উচিত নয়। এ আইন ভঙ্গ করা। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, এই আইন ভঙ্গের কোনো আসামী নেই।

বিষন্ন হিরণ পথে পথে খানিকটা ঘুরল। ট্রামে উঠল, ট্রাম থেকে নেমে পড়ল হঠাৎ, সিগারেট ধরিয়েই ফেলে দিল। তার চোখের উপর দিয়ে ভেসে গেল নিওনের সাইন—বিনাকা-র বাচ্চা মেয়েটা হাসছে…লিপটনের কেটলি থেকে পতনশীল আলো…লুফৎহানসার উড়ন্ত অ্যাবস্ট্রাক্ট হাঁসের চিহ্ন…হ্যাণ্ডলুম ফ্যাব্রিক্স্…ক্রয় করুন…সেল্ সেল্। হিরণ ভেবে দেখল…আলো ও অন্ধকারময় এই যা আছে, পাপপুণ্যময়, ধর্মকর্মময় এই যা আছে সবকিছুকেই বড় গোপনে ও নিঃশব্দে অবহেলা করে গেল চারুলাল, এইখানেই কি তার জিৎ ? না কি এখানেও নয় ! আরো দূরে বহুদূরে কোনো জায়গায় চারুলাল জিৎ রেখে গেছে, যেখানে অন্য কেউ কখনো নাগাল পাবে না ! সেইখানে যা যা চেয়েছিল চারুলাল সবকিছু দু হাত ভরে পেয়েছিল। আর প্রয়োজন ছিলনা বলেই কি চারুলাল অবশেষে সাঁতার না শেখার প্রয়োজন হিরণকে—একমাত্র হিরণকেই বুঝিয়ে দিয়ে গেল ?

আরো খানিকক্ষণ পরিকল্পনাহীন ও উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরল হিরণ। একটু রাত করে বাড়ী ফিরল এবং খুব তাড়াতাড়ি ঢাকা দেওয়া খাবারের সামান্য কিছু খেয়ে নিয়ে বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়ল। তড়িৎগতিতে অন্ধকার তাকে কামড়ে ধরল। বুঝতে পারছিল আজ রাতে তাকে অনিদ্রা-রোগ আক্রমণ করবে। মশারির সাদা আবছা চালের দিকে চেয়ে হিরণের হঠাৎ মনে পড়ল অনেকদিন আগে হিরণ একটা লোককে চিনত—তার ছিল যক্ষ্মারোগ। কিন্তু সে কখনো রুগীর মতো থাকেনি—কয়েকবার বিভিন্ন জায়গার হাসপাতাল থেকে সে পালিয়ে এসেছিল। রোগগ্রস্ত সেই লোকটাকে হিরণ কখনো কখনো সাহায্য করেছে—কিন্তু খুশীমনে নয়। হিরণ জানত এই সাহায্য নানা লোকের কাছ থেকে পাওয়া যায় বলেই লোকটা বারবার হাসপাতাল থেকে পালিয়ে আসে—নিরাময়কে বড় ভয় ছিল সেই লোকটার কেননা দীর্ঘকাল ধরে রোগে ভুগে ভুগে সে সেই রোগটাকে ভালবেসে ফেলেছিল—যেমন আমরা আমাদের হাত পা নাক মুখ চোখ বিশ্বাস আত্মপ্রবঞ্চনা ও বৃথাগর্বগুলিকে, মেধা ও বোধগুলিকে ভালবাসি। এর থেকে প্রতিসারিত কোনো অস্তিত্বের কথা আমরা কখনো ভেবে দেখিনি। শেষবার হিরণ লোকটাকে দেখেছিল লিণ্ডসে স্ট্রিটের মুখে দাঁড়িয়ে একটা চোরাই ঘড়ি সম্ভাব্য খদ্দেরকে গছাবার তালে আছে। বিরক্ত

হিরণ তাকে পাকড়াও করে প্রশ্ন করেছিল 'এ সব কি? আপনি এখানে এভাবে কেন?' লোকটা অনেকক্ষণ হিরণের দিকে চেয়ে বিড় বিড় করে বলেছিল তার রোগটা জটিল, এমন রোগ সহজে হয় না, সহজে সারেও না, এবং মৃত্যু অনিশ্চিত। হিরণ নিজের ধর্মবোধ ও পরোপকারপ্রবৃত্তির দ্বারা চালিত হয়ে লোকটাকে প্রায় কোণঠাসা করে এনেছিল। লোকটা অবশেষে দৃঢ় ভাবে হিরণকে বলে দিল 'মশাই, যদি আমার ঘড়িটা কিনতে হয় ত কিনুন, নইলে নিজের পথে যান। আমি আত্মহত্যা করছি না—কেউই কখনো তা করতে পারে না।'

এই জটিল কথাটা এতকাল হিরণ বুঝতে পারেনি। আজ হিরণ সেই লোকটার মুখ মনে করতে পারে না। কিন্তু এতদিনে সে যেন সেই রোগটার অর্থ ধরতে পারছে। যদিও জটিল রোগ—দুরারোগ্য—কিয়দংশে পরিকল্পিত ক্ষয় ও স্বপ্নের দ্বারা গঠিত, তবু হিরণ এর অর্থ বুঝতে পারে।

এখন মর্গে চারুলালের মৃতদেহের ওপর তার শিল্পচিন্তাগুলি মাছির মতো এসে বসেছে। তার মেদ-মজ্জা শুষে নিচ্ছে। দুরারোগ্য সেই ব্যাধি—বড়ো সংক্রামক। ভাবতে ভাবতে হঠাৎ ভয়াবহ চীৎকার ক'রে উঠতে ইচ্ছে করে হিরণের। তার মনে হয় এক অচেনা কিন্তু সুসংবদ্ধ কার্যকারণসূত্রে চারুলালের আত্মহত্যা সংঘটিত হয়েছে। এ আইনসম্মত এবং এ কারো অনুমতিসাপেক্ষ নয়।

চারুলালের সঙ্গে নিজেকে সম্পূর্ণ যোগাযোগহীন ও সম্পর্কশূন্য অনুভব করে সে একবার ভাবল—এ অন্যায়। পরমুহূর্তেই ভেবে দেখল—কিন্তু হায়, চারুলালের এই মৃত্যু ধর্ম ও অধর্মে গঠিত এক ধাঁধার মতো—যার সমাধান কখনো সম্ভব নয়।

চারুলালের কাছে পাঁচটা টাকা পাওনা ছিল। কিন্তু আজ রাত্রে হিরণ সেই পাঁচটা টাকার যাবতীয় স্বত্ব ও দাবীদাওয়া ছেড়ে দিল।

হিরণ অনুভব করে এবার সে আস্তে আস্তে কিংবা এক্ষুণি ঘুমিয়ে পড়বে।

সন্টুর জন্য

শিশির কর

সন্টুরা যখন ত্রিচি থেকে তিরুপতিতে পেঁছাল, তখন বেলা পড়েছে। ত্রিচিনাপল্লী থেকে ট্রেনটা নির্দিষ্ট সময়েই তিরুপতি ষ্টেশনে পেঁছেছিল। কিন্তু লেফট লাগেজ রুমে মাল রেখে দেবস্থানের বাসের জন্য বেশ কিছুক্ষণ ষ্ট্যাণ্ডে দাঁড়ানোর দরুণ দেরি হয়ে গেল। দেবস্থানের বাস দীর্ঘ ২০ কিলোমিটার পাহাড়ী পথ বেশ জোরেই ছুটে এসেছে। মালপত্র রেখে আসায় ওরা এখন ঝাড়া হাত-পা। তাই সোজা মন্দিরের দিকে পা বাড়াল। কাছাকাছি একটা দোকানে জুতো খুলে রেখে ফুল কিনে মন্দিরে ঢুকলো। বালাজীর হুণ্ডিতে দেবার জন্য কিছু রুপো-তামাও কিনল।

একেবারে আশাতীত ব্যাপার। মন্দিরে একদম ভীড় নেই। বালাজীর দর্শনের জন্য কতটা যে লাইনে দাঁড়াতে হবে সে কথাই ওরা এতদিন বারবার আলোচনা করছিল। আসার আগে সন্টুর এক মাসীমা বলেছিলেন, বালাজীর কাছে পেঁছনোর জন্য ওদের দীর্ঘ ৮ ঘণ্টা লাইনে দাঁড়াতে হয়েছিল। সন্টুর ঠাকুমা কি এতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারবেন? বিশেষ করে সারা রাত ট্রেন জার্নির পর সকলেই ক্লান্ত। তাই সন্টুর বাবা ঠিক করেছিলেন যে, বিনা পয়সায় সাধারণ লাইনে না দাঁড়িয়ে ওরা ২৫ টাকার লাইনে দাঁড়াবে। কিন্তু কী আশ্চর্য। একেবারে ভীড় নেই। এক ঘণ্টাও লাইনে দাঁড়াতে হল না। বালাজী কি ওদের আকুল আগ্রহের কথা বুঝেছিলেন? বালাজীর সোনার বরণ মূর্তিতে প্রণাম করে উঠতেই পুরোহিত মাথায় ঠেকিয়ে দিলেন সোনার টোপর। তারপর হাতে হাতে দিলেন প্রসাদ।

বালাজীর প্রসাদ খেয়ে ওরা তাড়াতাড়ি বাস ষ্ট্যাণ্ডে গেল। এখনই ফিরতে হবে। তা না হলে তো মাদরাজের ট্রেন ধরা যাবে না। মন্দিরের আশপাশের দোকান থেকে কটা বালাজীর আংটি আর টুকিটাকি দু'একটা জিনিস কিনে তড়িঘড়ি ওরা বাস স্ট্যাণ্ডে গেল। আবার দীর্ঘ লাইন। অন্ধ্র পুলিশের বেশ সুব্যবস্থা। কোন বিশৃংখলা নেই। কিছুক্ষণ পর বাস ছাড়ল। পাহাড়ের চূড়া থেকে বাস দ্রুতগতিতে নীচে নেমে এল। বেশ কিছুটা আগেই ওরা স্টেশনে পেঁছেছে। টিকিট কাটিয়ে লেফট লগেজ থেকে মাল এনে ওরা ট্রেনে উঠল। মাদরাজে পেঁছাতে পেঁছাতে রাত হয়ে গেল। তাই ওরা স্টেশনের কাছেই একটা লজে উঠল। আঠার টাকাতেই একটা বড় ঘর পাওয়া গেল। রিক্সাওলাই নিয়ে এল। যদিও জানুয়ারি মাস, গরম কিন্তু কলকাতার বোশেখের মতই। লজে উঠেই সকলে স্নানের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ল। সন্টুর বাবা লজের মালিককে কিছু অ্যাডভান্স দিয়ে আবার বেরিয়ে গেলেন বাইরে। আশে-পাশে

দোকান আছে কিনা দেখতে। হোটেলের বয় পাশেই একটা দোকান নিয়ে গেল। দোকানটা ভালই। সেখানে খাবার অর্ডার দিয়ে ফিরে আসার সময় বয় বললো।

'বাবু কাল সকালে মহাবলীপুরম্ যাবেন? টুরিস্ট বাস যাবে?'

বিনয়বাবু তো হাতে স্বর্গ পেয়ে গেলেন। উনি এমনই একটা বাসের কথা ভাবছিলেন। কাল না হলে ওদের আর মহাবলীপুরম্ দেখা হবে না। কারণ, পরশু ভোরেই তো করমণ্ডলে ওরা হাওড়া চলে যাবে। টিকিট রিজার্ভ করাই আছে।

বিনয়বাবু বয়কে জিজ্ঞাসা করলেন: 'ভাড়া কত?'

সে বললো: 'পারহেড টোয়েনটিফাইভ রুপিস। হাফ টিকিট ফর চিলড্রেন।'

বিনয়বাবু বললেন: আমাদের ৬টা সিট চাই। চারটে ফুল, দুটো হাফ। পাওয়া যাবে?

বয় বললো: 'একটু দূরেই ওদের অফিস। আপনি আমার সঙ্গে চলুন। সব জানতে পারবেন।'

বয়ের সঙ্গে গলির রাস্তা দিয়ে এঁকেবেঁকে কিছুক্ষণ যাবার পর বিনয়বাবু টুরিস্ট অফিসে পেঁছিলেন। সিট পাওয়া গেল। একশ টাকা অগ্রিম দিয়ে বিনয়বাবু আবার ফিরে এলেন হোটেলে।

সকাল আটটায় বাস ছাড়বে। তার আগেই ওখানে পেঁছাতে হবে। বিনয়বাবু বয়কে বললেন: 'তুমি যা গলিঘুঁজি দিয়ে আমাকে নিয়ে গেলে আমি খুঁজে যেতে পারবো না তোমাকেই আমাদের সকালে ওখানে নিয়ে যেতে হবে।'

বয় বললো: 'আচ্ছা।'

বিনয়বাবু বয়কে একটা টাকা বখশিস দিলেন। ও তাতে খুশি। কিছু লোক অল্পেই সন্তুষ্ট হয়।

এত সহজে মহাবলীপুরম্ যাবার ব্যবস্থা হওয়ায় বিনয়বাবু এত খুশি হয়েছিলেন যে, ও যদি দশ টাকা বকশিসও চাইত, উনি সানন্দে দিয়ে দিতেন।

লজে ফিরে বিনয়বাবু দেখলেন যে, সকলে স্নান সেরে পাউডার লাগিয়ে আরামে বিশ্রাম করছে।

ঘরে ঢুকেই উনি জোর গলায় বললেন, 'মণ্টু, তোদের ভাগ্য খুব ভাল। মহাবলীপুরম্, কাঞ্চীপুরম, পক্ষীতীর্থম তোদের দেখা হয়ে যাবে। কাল সকালে টুরিস্ট বাসে যাব। আমি ভেবেছিলাম, এবার আর মহাবলীপুরম্ যাওয়া হবে না।

সবার মুখই হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। রমা বললো। 'তুমি তাড়াতাড়ি কাজ সেরে নাও। সবার খুব খিদে পেয়েছে। একসঙ্গে খেতে যাব।'

'বেড়াতে হলে কষ্ট করতেই হবে। কষ্ট না করলে কী কেষ্ট মেলে?' —এই বলে বিনয় বাথরুমে ঢুকে পড়ল।

আগের দিন তিরুপতি দর্শনজনিত পরিশ্রম। তার আগের দিন ঘোরাঘুরি ও সারা রাত ট্রেন জার্নিজনিত পরিশ্রমে সকলেই বেশ কাহিল হয়ে পড়েছিল। তাই ঘুম থেকে উঠতে সকলেরই বেশ দেরি হয়ে গেল। মন্টুর ঠাকুমা সকলকে ঠেলে ঠেলে তুলে না দিলে আরও দেরী হয়ে যেত। টুরিস্ট বাস ছাড়ার কথা সকাল ৮ টা। ওদের বের হতেই ৮টা বেজে গেল। লজের বয়ের সঙ্গে ওরা যখন বাসে এল তখন ঘন ঘন হর্ন বাজছে ওদেরই উদ্দেশে। আর সকলে এসে গেছে।

তাড়াহুড়ো বেরুতে গিয়ে বিনয় শুধু ম্যানিব্যাগটাই সঙ্গে এনেছিল। এমনকি ওয়াটার বটলটাও আনে নি। সন্টুর জন্য যেটা সব সময় মাস্ট আইটেম। তবে অসুবিধা হয় নি। এখানে দূর পাল্লার বাসে পানীয় জলের ট্যাংক থাকে।

সারাদিন ঘুরে ওরা মহাবলীপুরম্, কাঞ্জীপুরম্, ও পক্ষীতীর্থম্ দেখলো। ওরা যখন বাড়ি ফিরল, তখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে।

বিনয় ভাবল, মাদ্রাজে এসে তো কিছু শপিং হয় নি। এ ক'দিন তো ওরা নাকে দড়ি দিয়ে খালি ঘুরছে। কিছু কিনতে গেলে এখনই কিনতে হয়। হোটেলে গিয়ে হাত মুখ ধুয়ে মার্কেটিং করার সময় হবে না। তখন দোকান বন্ধ হয়ে যাবে।

বিনয় জিজ্ঞাসা করলো, 'তোমরা মাদ্রাজে কিছু কেনা-কাটা করতে চাও কি? তবে এখনই কিনে নাও। আর সময় হবে না। কাল সকাল ৮টাতেই তো ট্রেন।'

সবাই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। কেউ মুখ খোলে না। মা-ই প্রথম বললো: 'কিছু তো কিনতেই হবে। বুলি, মিঠুর পিয়ার সিল্কের শাড়ি না কিনে নিয়ে গেলে ঘরে ঢোকা যাবে না।'

যদিও বেশি হাঁটাহাঁটি হয়নি তবে গরমে সকলেই পরিশ্রান্ত। তাই বিনয় দুটো রিক্সা ভাড়া করলো। রিক্সাগুলোকে সিল্কের শাড়ির দোকানে যেতে বললো। কয়েকটা দোকান ঘুরে চারটে পিওর সিল্কের শাড়ি কেনা হল। আরও কিছু কেনাকাটা হল। স্টিলের ধুপদানি, খেলনা প্রভৃতি। মাউন্ট রোড, ইভনিং মার্কেট ঘুরে ওরা যখন ফিরল, তখন রাত দশটা বেজে গেছে।

স্টেশন থেকে ওদের লজ খুব কাছেই। বিনয় রিক্সাগুলোকে সোজা হোটেলেই যেতে বললো। রাতের খাবার স্টেশনের ক্যানটিনেই খেতে হবে। খাওয়া-দাওয়া সেরে ওরা যখন বের হল, তখন রাত ১১টা বেজে গেছে। ওরা লজের দিকে এগোল। রাতে ঘুমিয়েই সকালে হাওড়ার ট্রেন।

স্টেশনের পাশেই একটা রাস্তায় লজ। কিন্তু আশপাশের সব রাস্তা ঘুরেও ওরা লজ খুঁজে পেল না। স্টেশনের এত কাছে লজটা, তবু খুঁজে পাচ্ছে না। ওরা তো কাল রাতেই ওই লজে উঠে ছিল। আর সকাল বলে বেরিয়ে পড়েছে

মহাবলীপুরমের বাসে ওঠার জন্য। জায়গাটা ভাল করে দেখাই হয় নি। তাড়াহুড়োতে লজের কার্ডটাও সঙ্গে আনেনি। এদিকে ক্লান্তিতে সকলেই যেন ভেঙে পড়ছে। কদিন ধরে দৌড়ঝাঁপ। কাল থেকে একটুও বিশ্রাম নেই। বিনয়ও খুব উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে। কাল সকালেই তো ফিরতে হবে। বাঁধাবাঁধির কাজ রাতেই সেরে রাখবে ভেবেছিল। কিন্তু কী ভীষণ মুশকিলে পড়ল। লজের নাম দূরের কথা রাস্তার নামটাও কারো মনে পড়ছে না। মা ঘুমে ঢলে পড়ছে। রমাও। একমাত্র সন্টুই একটু চাঙ্গা আছে। কী যে করবে এত রাতে? বিনয় ভেবে কূলকিনারা পায় না। ও ঠিক করল, কাছাকাছি কোন থানায় যাবে। পুলিশের সাহায্য না নিয়ে উপায় নেই। এভাবে সারারাত খুঁজেও তো ফল পাবে না। থানায় যাবার জন্য রিক্সা ডাকল। রিক্সাগুলো বললো ঃ পাশের লাল বাড়িটাই তো কোতোয়ালি। দু'পা গেলেই হবে।'
বিনয় বাড়ির সকলকে বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখে থানায় ঢুকলো। সন্টু কিন্তু বাবার সঙ্গ ছাড়ে না। বিনয় বিরক্ত হয়ে সন্টুর গালে এক চড় দিল। তবু সে কেঁদে কেঁদে বাবার সঙ্গে গেল।
থানার অফিসারকে বিনয় সব বললো। তিনি বিনয়কে একচোট বকুনি দিলেন। বললেন, 'আপনি তো আচ্ছা লোক, মেয়েদের নিয়ে এতদূরে বেরিয়েছেন। লজের নাম, এমন কি রাস্তার নামও জানেন না। এতটুকু রেশপনসিবিলিটি নেই।'
ইংরিজিতেই কথা হচ্ছিল, ছোট্ট সন্টু ইংরেজি না জানলেও বুঝতে পারে। ওর বাবাকে ওরা বকাবকি করছে। সন্টুর খুব রাগ হচ্ছিল। একবার বাবাকে বললো 'চল, এখান থেকে চলে যাই। বিনয় এবার রাগল না। অসহায়ভাবে ওর দিকে তাকাল শুধু।
ও সি আর একজন অফিসারকে ডেকে পরামর্শ করলেন, সেও বললো 'ইমপসিবল! কী করে জানবো, উনি কোন লজে উঠেছেন! স্টেশনের কাছে তো ডজনডজন লজ। দু' একটা হলে নয় খোঁজ নেওয়া চলে। ভেরি ইরেসপনসেবল ফেলো।' বলে উনি গটমট করে চলে গেলেন।
বিনয় ঘাড় নিচু কর সব শুনছে। কারো মুখেই কথা নেই। শোনা যাচ্ছে ঘড়ির কাঁটাটার টিক টিক শব্দ। কালো মেঘে বিজলীর ঝিলিকের মত থমথমে নীরবতার বুক চিরে হঠাৎ ভেসে উঠল সন্টুর গলা, 'বাবা, আজকে সকালে আমি দেখেছিলুম আমাদের লজের পাশে চায়ের দোকানের সাইনবোর্ডে 'আইজাক রোড' লেখা।'
সবাই সচকিত হয়ে উঠল। যেন একটা জটিল মার্ডার কেসের সূত্র পেল ব্যোমকেশ। এতক্ষণে বিনয়ের স্বর বেরুলো, 'দয়াকরে আমাদের আইজাক রোডটা দেখিয়ে দিন। সেখানে গেলে আমরা নিজেরাই হোটেল খুঁজে নিতে পারবো। আপনাদের দেখাতে হবে না।'

পুলিশ অফিসার একজন কনসটেবল দিলেন। আইজাক রোডে পেঁছিলে লজ পেতে দেরী হল না। এখন সন্টুর আদরের ধুম পড়ে গেল। মা, ঠাকুমা, পিসি চুমায়চুমায় ওর মুখ ভরিয়ে দিলেন। দিদি বললো; 'যুগ যুগ জিও ম্যাটা বোস।'

সকালের সেই বয় লজের বাইরে সিঁড়ির উপর বসে ছিল। সে বললো, বাবু. চাবি হাতে কখন থেকে বসে আছি। আপনাদের জন্য গেট বন্ধ করতে পারছি না।

অন্ধকারে

সমর মিত্র

ইজিচেয়ারে আরাম করে বসে চা খাচ্ছিলাম। হাতে সিগারেট। পাশের ছোট্ট টেবিলটায় ছাইদান। চোখের সামনেই একটা আলনা। আলনায় বাচ্চা দুটোর শার্ট ফ্রক প্যাণ্ট, ওদের মায়ের ব্লাউজ, শায়া।

আমার চোখ আলনার দিকে। লাল ব্লাউজটা বোধ হয় আমিই কিনে দিয়েছিলাম ময়দানমারকেট থেকে। লাল না হলুদ ব্লাউজটা? ঠিক মনে করতে পারছি না। রংটা শাড়ির সঙ্গে ঠিক মেলে নি। আমি বলেছিলাম, উনিশ বিশ। ওতে চলে যাবে। এই নিয়ে সামান্য তর্ক বিতর্কও হয়েছিল।

হলুদ রং আমার খুব প্রিয় রং। হলুদ ব্লাউজটাও তাই আমার মন কেড়ে নিল। আমি সিগারেট টানতে টানতে হলুদ ব্লাউজটার দিকে পলক না ফেলে তাকিয়ে রইলাম। গায়ে হলুদ, হলুদ রংয়ের ফুল, হলুদবসন্ত পাখি ইত্যাদির কথা মনে করতে করতে একসময় চোখদুটো টন টন করে উঠল। আমি চোখ বুজলাম। আর টুক করে আলো নিভে গেল। আমি আবার তাকালাম আলনার ওপর রাখা হলুদ ব্লাউজটার দিকে। কিন্তু কিছুই নজরে পড়ল না। শুধু দেখলাম, আলনার পিছন থেকে বেরিয়ে এল একটি মেয়ে। হলুদ শাড়ির সবুজ পাড়। সামনে এসে দাঁড়াল।

বললাম, কে?

—আমি বিভা। চিনতে পারছ না?

আমি ভাল করে তাকালাম। বহুদিন পরে বিভাকে দেখলাম। বিভার বিনুনি বুকের ওপর ফেলা। বিনুনিটা দুলছে। সামনের দাঁত দুটো দিয়ে নীচের ঠোঁটটা টিপে রেখেছে। মুখে সামান্য হাসি। হাতে বালা। গলা, মুখ কপাল কী পরিষ্কার, তকতকে, টানটান। কোথাও কোন ভাজ নেই। আহ্, ওর চুল আর চোখের পাতাগুলোও কী সজীব।

আমি আমার গালে হাত বোলালাম। সকালে দাড়ি কামিয়েছি। তবু মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। মুখেকপালে অজস্র ভাজ। এখানে ওখানে চুলের রং সাদা। ঘন চুল পাতলা হয়ে গেছে। পেটের নীচে মেদ। ঘাড়ে কয়েক থাক মাংস।

বিভা বলল, ভাল্লাগে না, তুমি কোন কথা বুঝতে পার না।

আমি চমকে উঠলাম। ও তো কোন কথাই বলে নি। সবে তো সামনে এসে দাঁড়ালো। তবে? আবার চমকালাম আমি। আরে, ও তো এমন করেই কথা বলত! যে দিন ওর সঙ্গে শেষ দেখা হয়, সেদিন কি ও এভাবেই কথা বলেছিল? মনে পড়ল না। তবে এই ভাবেই ও কথা বলত। আমি তো সব সময়েই ওর সিরিয়াস কথাবার্তা হেসে উড়াতাম। আবার আমি হেসে উঠলাম।

—বিভা, তুমি কি করে ঠিক তেমন রয়ে গেলে ?

—বিভারা ঠিক তেমনই রয়ে যায়। ওদের বয়স বাড়ে না।

মামার বাড়িতে মাঝে মাঝে আমি বেড়াতে যেতাম। মামাদের বাড়ির পাশেই ছিল বিভাদের বাড়ি। ওদের বাড়িতেও ছিল আমার অবাধ গতিবিধি। সকাল নটা। ঠিক সকাল নটায় সময় যেতাম আমি ওদের বাড়ি। ওই সময়েই রোজ বিভা স্নান করতে যেত। ও আমার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চুল খুলত। দাঁতে ঠোঁট টিপে হাসত। ওই সময় ওকে দেখে আমার ভারী ভাল লাগত। সবুজ পাড় হলুদ শাড়িতে ওকে মানাতও বেশ। মামারা একদিন ওখান থেকে শহরে চলে আসে। আমারও বিভাদের বাড়ি যাওয়ার পাট উঠে যায়।

—কিন্তু বিভা, আমি যে বুড়ো হয়ে যাচ্ছি। দেখ আমি আগের মতো নেই।

বিভা হেসে উঠল। বিভা হাসতে হাসতে ডানদিকে মাথাটা হেলিয়ে দিত। তারপর বলত, তোমাকে নিয়ে আর পারি না। ঠিক আগের মতই বিভা হেসে উঠল। ঝকঝকে দাঁতগুলো এক ঝলক আলো ঠিকরে দিল। ঠিক আগের মতই মাথাটা সে ডানদিকে হেলিয়ে দিল। তারপর বলল, তোমাকে নিয়ে আর পারি না। কে বলল, তোমার বয়স বেড়েছে ? আমি তো তোমায় দেখি সেই আগের মতো—মাথায় ঘন কালো চুল, পাজামা পাঞ্জাবী, ঠোঁটের ওপর সরু গোঁফ একহারা টানটান চেহারা—

—সে কী !

—সবাই যখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়—দুপুরে একা ঘরে শুয়ে শুয়ে কর্তার জন্যে সোয়েটার বুনতে বুনতে যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ি, ঠিক তখনই তুমি পরনে পাজামা পাঞ্জাবি মাথায় ঘন কালো চুল জানলা গলে টুপ করে ঢুকে পড়।

—তারপর আমি কি করি ?

—কি আর করবে ? তোমার যেমন স্বভাব ! উল্টোপাল্টা কথা বলতে শুরু কর। আমার কোন কথার তুমি গুরুত্ব দাও না। ভাল্লাগে না, তুমি কোন কথা বুঝতে পার না। তোমাকে নিয়ে আর পারি না।

আমি আমাকে স্পষ্ট দেখতে পেলাম। আমার টানটান একহারা চেহারা—মাথা ভরতি ঘন কালো চুল, পরনে পাজামা পাঞ্জাবী। আমার সামনে সবুজ পাড় হলুদ শাড়ি পরে দাঁড়িয়ে বিভা। সে মাথার চিরুনি বুকের সামনে এনে খুলছে। দাঁত দিয়ে সে ঠোঁটটা টিপে ধরেছে। হঠাৎ সে হেসে উঠল। মাথাটা ডানদিকে হেলিয়ে দিল।

আমি ধড়মড় করে ইজিচেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লাম। আমাকে উঠতে দেখে বিভা পিছু হাঁটতে লাগল। আমি হাতটা বাড়িয়ে দিলাম। বিভা বলল, আমরা কেউ কাউকে ছুঁতে পারি না।

আমি চেষ্টা করে আর একটু এগিয়ে গেলাম। বিভা টুক করে আলনার পিছনে চলে গেল। আর ঠিক তখনই ঘরের আলো জ্বলে উঠল।

সাদা পায়রা

সমীর রক্ষিত

ম্যাজিসিয়ান হাতের তালুতে কষে খৈনী ডলছে। তার পরণে হাতকাটা গেঞ্জি আর নীলচে বিবর্ণ তাঁতের লুঙ্গি। ম্যাজিসিয়ানের এরকম দেখতে ঠিক স্বাভাবিক লাগে না। বস্তুতঃ ম্যাজিসিয়ান পরিমল একটা গলাবন্ধ লম্বা কোট আর সাদা চুস্ত পরে যখন ম্যাজিক দেখায়, তখন তার মাথায় থাকে রাজকীয় মুকুট, হাতে যাদুদণ্ড ; চালচলনে আর কথার তুবড়ি ফোটানোর ভঙ্গিতে সে তখন যথার্থই রাজার মত স্মার্ট কিম্বা তারও চেয়ে বেশী, অনেকটা অবতারের মত। সে তখন যা-খুশী-তাই করতে পারে। তার হাতের তুকে জ্যান্ত পায়রা ডিম হয়ে যায়। এবং ডিমটা সে টেনে বের করে ডেকে স্টেজে তোলা কোন বালকের পেট থেকে। পরমুহূর্তেই ডিমটা ফের পায়রা হয়ে ডানা ঝাপটায় দুমুখ-খোলা টিনের ভেতরে। যেন সমস্ত পৃথিবী তখন ম্যাজিসিয়ানের আজ্ঞাধীন।

এমন যার অলৌকিক ক্ষমতা, সে হোটেলের বারান্দায় বসে হুহুব সন্ধ্যায় খৈনী টিপছে।

আর তখনই আরেক পশলা গোঁয়ার বৃষ্টি ঝেঁপে আসে, যেন দূর থেকে ঝাঁক ঝাঁক পঙ্গপাল ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে টিনের চালে। এমনি চলছে দিনকয়েক···ঝরছে থামছে ফের ঝরছে। আকাশের মুখটা হাঁড়িপানা।

বিড়ি ফুঁকতে ফুঁকতে তারক বলে—'পরীবাবু ম্যাজিক দিয়ে বৃষ্টিটা বন্ধ করে দিতে পারেন না ?'

প্রথম যেদিন ম্যাজিসিয়ান এল, তারক খুব পেছনে লেগেছিল—'ম্যাজিক ; কী ম্যাজিক দেখান আপনি। ভোজবাজি ?' ভানুমতীর খেল ?'

পরিমল পায়ের কাছ থেকে একটা খোয়া তুলে এগিয়ে দিয়ে বলেছিল—'নিন খান, কলকাতার ভীম নাগের সন্দেশ।'

তারক স্পষ্ট দেখল একটা নিটোল লোভনীয় সন্দেশ, তবু হাতে নিয়ে দ্বিধা করছিল।

ম্যাজিসিয়ান তার চোখের দিকে তাকিয়ে ধমক দিয়েছিল—'খান। খেয়ে ফেলুন।

তারক মোহাবিষ্টের মত খোয়া চিবুতে সুরু করেছিল। পাশে বসে হোটেল-মালিক শৈলেন হাততালি দিয়ে উঠেছিল।

ফলে তারক আর তাকে খুব এলেবেলে ম্যাজিসিয়ান বলে উড়িয়ে দিতে পারে না।

এই শালা পচাবিষ্টি মাইরি জ্বালাচ্ছে, দিন না বন্ধ করে ? কী পরীবাবু ?'

খৈনী মুখে পুরে বুঁদ হয়ে বসে আছে ম্যাজিসিয়ান। তারক তার কাঁধে হাত রাখে।

মুখ ফিরিয়ে তাকায় পরিমল, তারক একটু থমকায়। হিপ্নোটাইজ করা চোখ নয়, মাছের চোখের মত, লালচে কাঁচের ডেলার মত নির্বোধ দুচোখ।

'কী দাদা, কী হল? মনটন খারাপ নাকি? বৌদির চিঠি এসেছে বুঝি আজ?'

ম্যাজিসিয়ান দেয়ালে মাথা হেলিয়ে দেয়, তার মুখটা হাড়উঁচু বড়সড়, চুলগুলিতে পাক ধরছে, গালও ভাঙা কিন্তু চোখ দুটি কোটরগত হলেও টানা টানা বড়—স্বপ্নে দেখা চোখের মত বিষণ্ণ।

ম্যাজিসিয়ান চাপা হাসি হেসে বলে—'মনটাকে তারকবাবু তুক করে দিয়েছি, এখন ওটা ঐ ফুলের মধ্যে ঢুকে পড়েছে।' —হাত টান করে বারান্দার বাইরে সুপুরী গাছের গোড়ায় লাল কলাবতী ফুল দেখায় সে।

ম্যাজিসিয়ানের ব্যাপার, তারক আধা বিশ্বাসে ফুলের দিকে তাকায়। বৃষ্টিতে ভিজছে, টপ টপ করে জল ঝরছে হাওয়া-নাড়া ফুল থেকে, ঠিক জলে ভেজা মানুষের চোখের মত। ফুলটা দেখে তারকের স্থির বিশ্বাস জন্মে যায়—ম্যাজিসিয়ানের আজ মন ভাল নেই।

আজ পরিমলের মনটা যথার্থই খারাপ। মোহিতনগর স্কুলে খেলা দেখাতে গিয়েছিল আজ সে।

হেডমাষ্টার গতকাল তাকে প্রায় হাঁকিয়েই দিয়েছিল—'ছেলেরা না খেয়ে স্কুলে আসে মুখ দেখলে বুঝতে পারি মশাই, ম্যাজিক দেখার পয়সা চাইতে পারব না।'

অনেক বলাকওয়ার পরে দশটা করে পয়সা আনার জন্য ছেলেদেরকে বলেছিল শেষ পর্যন্ত হেডমাষ্টার, কিন্তু দুচারজন ছাড়া কেউ আনেনি। বৃষ্টি ছিল ছাত্রদের বেশীর ভাগ আসেনি। শেষ পর্যন্ত হেড মাষ্টার নিজের পকেট থেকে দশটি টাকা দিয়েছে।

আগে একটা স্কুলে কম করেও চল্লিশ পঞ্চাশ টাকা হত।

'আপনাদের নর্থ বেঙ্গলের বৃষ্টির মাবাপ নেই মশাই, যখন খুশী তখন নামে।' —পরিমল বৃষ্টির দিকে চোখ রেখে বলে।

'এবার লেটে নামল, কিন্তু দাপটখানা দেখুন তিন দিনেই বন্যা, মণ্ডলঘাট ভেসে গেছে—বার্নেশ ঘাট, দোমোহিনীর অবস্থাও খুব খারাপ। আপনাকে বললাম ম্যাজিকের বাণ মারুন—'

উদাস গলায় পরিমল বলে—'আর ম্যাজিক ফ্যাজিকে আর চলছে না মশাই। পুরুলিয়া বাঁকুড়া গেলাম, সেখানে খরা আর এখানে বন্যা। দেশে গাঁয়ের কী হাল হয়েছে। আগে একেকটা শোতে নাই নাই করেও চল্লিশ পঞ্চাশ টাকা

উঠত, এখন ইস্কুলটিস্কুল থেকে তাড়িয়ে দেয়, বলে—ম্যাজিক দেখাতে চাও দেখাও কিন্তু বাপু, পয়সা ফয়সার কথা বলো না।'

পেটে ভাত জোটে না পয়সা দেবেই বা কোত্থেকে বলুন? আপনারা কলকাতার লোক তাও র‍্যাশনটা পান ঠিক ঠিক মত, আমাদের তো না র‍্যাশন, না খোলা-বাজার। সাড়ে চার চালের কেজি, আটা আড়াই।' —বলে নিভে যাওয়া বিড়ি বৃষ্টির জলে ছুড়ে ফেলে তারক।

'সব জেলাতেই এক অবস্থা। আমি তো সারা বাংলা দেশ চষে বেড়াচ্ছি।'—ম্যাজিসিয়ান আনমনে বলে উদাস গলায়।

হোটেলের ভেতর-বারান্দা থেকে পায়রার বকবকম আর ডানা ঝাপটানোর শব্দ ওঠে, বৃষ্টি পড়ার পর থেকেই শব্দটা আসছে, অথচ তারক অবাক হয়ে লক্ষ্য করে ম্যাজিসিয়ান কোন গা করছে না।

এতদিন সে দেখছে পায়রাগুলোর একটু শব্দ হলেই ম্যাজিসিয়ান ছুটে গেছে, বলেছে—

'শালা একটা হুলো পেছনে লেগেছে বুঝলেন?'

তারক বলে—'আপনার পায়রাগুলো বোধ হয় ভিজে যাচ্ছে ম্যাজিসিয়ান।'

'ভিজুক, আর ভাল্লাগে না শালা পায়রাবাজি।' ম্যাজিসিয়ানের কথা শুনে শৈলেন হেসে ওঠে।

'কী হল ম্যাজিকবাবু! পায়রার ওপর এত রাগ?'—শৈলেন হোটেলের ভেতর থেকে বোধহয় রাতের রান্নার তদারকি করে ফেরে, ম্যাজিসিয়ানকে বলে—'আপনি ব্যানার্জি সাহেবের মত ম্যাজিক সুরু করুন, দেখবেন খেলা কীরকম জমে।' —শৈলেন অর্থপূর্ণ হাসি হাসে।

তারকের দুচোখ ফুলের ওপরে বসা প্রজাপতির মত রঙ্গিন হয়ে ওঠে সে। বলে—'সুরু হয়ে গেছে?'

'আমার হোটেলে শালা পুলিশের ফুলিশের হুজুৎ হবে মাইরি, ব্যানার্জি আমাকে সুদ্দু ডোবাবে। মেয়েটাও তেমনি—ছেনালি সুরু করেছে—' শৈলেন পানমুখে দোক্তা ফেলে।

'কাজ বাজে হচ্ছে নাকি শৈলেন? একটু দেখে আসব?'—তারক উঠে পড়ে উত্তেজিতভাবে।

পানের রসে ভরা মুখে শৈলেন বলে, 'জানলার ফাঁক দিয়ে দেখলাম মেয়েটা চিৎ হয়ে শুয়ে ছেনালের মত হাসছে আর ব্যানার্জি প্যান্ট ছেড়ে লুঙ্গি পরছে—'

'মাইরি, তার মানে এখন আসল কাজ হবে, আমি যাচ্ছি তাই—একটু চোখ জুড়িয়ে আসি।'—তারক প্রায় লাফ মারে।

শৈলেন কড়া ধমক দেয়—'রোস ব্যাটা, ব্যানার্জি শালা অত বোকা নাকি? দরজা জানালা বন্ধ করে লাইট নিভিয়ে দেয়।'

তারক মুখ শুকনো করে বসে পড়ে। প্রথমতঃ শৈলেন তার বন্ধু হলেও হোটে-

লের মালিক, তার অমতে সে গিয়ে আড়ি পাততে পারে না। দ্বিতীয়তঃ তারক যে চা-বাগানে টাইপিস্টের কাজ করত, সে বাগানটা পনের দিন আগে বন্ধ হয়ে গেছে। বৌ-ছেলেমেয়ে নিয়ে দাদার ঘাড়ে এসে চেপেছে তারক। পারতপক্ষে বাড়ি যায় না। শৈলেনকে তোয়াজ করে সারাদিন যদি কোন এক বেলা খাবারটা জুটে যায় হোটেলে। ফলে সে বসে ফের একটা বিড়ি ধরায়। কিন্তু তার মনটা পড়ে থাকে ব্যানার্জি'র ঘরে।

'ব্যানার্জি'র এলেম আছে এটা তোকে মানতেই হবে শৈলেন, মালটা কিন্তু ভাল পাটিয়েছে'—তারক দু ঠোঁটে বিড়িতে কড়া চাপ দিয়ে ধোঁয়া টানে।

'বিকাশ ডাক্তার যদি টের পায় না ব্যানার্জি'কে হাজতে পুরবে।' —উঠে গিয়ে একমুখ লাল থুথু ফেলে শৈলেন বৃষ্টির মধ্যে। শুকনো মুখে বলে—'আমি, বুঝি না এত বড় একটা ডাক্তারের মেয়ে এরকম চট করে পটে যায় কী করে?'

'কেন?'—তারক সোজা হয়ে বসে, বলে—'কেন ব্যানার্জি' ছেলেটা খারাপ কিসে? হিরোর মত ফার্স্ট' ক্লাস চেহারা। তার ওপর বড় কোম্পানীর রিপ্রেজেনটেটিভ—পকেটেভর্তি' টাকা। আজকাল আসল জিনিসই তো অই বাবা, টাকা। টাকা থাকলে তুই যা খুশী তাই করতে পারিস।'

ফ্যা ফ্যা করে হাসে তারক, ম্যাজিসিয়ানকে আঙুলে খোঁচা দিয়ে বলে—'কী ম্যাজিকদা ঠিক বলিনি?'

ম্যাজিসিয়ান লাল কলাবতী ফুলে জলপড়া দেখছিল, শুনছিল সব; এবার মুখ ঘোরায়। খৈনীর নেশায় বুঁদ চোখে তাকিয়ে বলে—'শুধু টাকা না, মেয়েরা গুণীলোকদের পছন্দ করে।'

'বাজে কথা, মেয়েরা ওসব গুণফুনের ধার ধারে না।'—তারক খেঁকিয়ে ওঠে।

শৈলেনের মুখে ফের লালা জমে উঠছে, সে নীচের ঠোঁট সামনে উঁচিয়ে বলে 'ম্যাজিসিয়ান খুব বেঠিক কথা বলেনি। তবে কী জানো ম্যাজিসিয়ান, শুধু গুণফুনও কিছু না, যদি ট্যাঁকে তোমার মাল না থাকে।'

কী যেন উত্তর দিতে যাচ্ছিল ম্যাজিসিয়ান কিন্তু থমকে যায়। কথাটি বলে না। শান্তির কথা মনে পড়ে।

আসলে এতক্ষণ সে শান্তির কথাই ভাবছিল। সেই তরুণী শান্তির কথা—কবেকালের কথা। তবু মনে হয় এই তো গতকাল যেন ঘটে গেছে সব। পঁচিশটা বছর এর মধ্যে কখন হাতের ফাঁক দিয়ে গলে বেরিয়ে গেছে টের পাওয়া গেল না।'

পঁচিশ বছর আগে—তখন তার নিজের বয়েস কুড়ি একুশ, ভরা যৌবন শরীরে, আর শান্তি পনের ষোল বছরের তরুণী। সদ্য সদ্য যৌবনের সবুজ জমিতে পা দিয়েছে শান্তি। সারা শরীরে কুঁড়ি ফুটিয়ে পাপড়ি ছড়াবার জৌলুশ, কথায় আর চোখের ধারে যেন সৌরভ ছড়ায়। বিষ্ণুপুরের এক গাঁয়ের

হেডমাষ্টারের বাড়িতে থেকে ইস্কুলে ইস্কুলে ম্যাজিক দেখাচ্ছে পরিমল। তার হিপ্নোটিজম্‌শেখা চোখের দিকে চোখ রেখে পাগল হয়ে গেল সেই সদ্যযুবতী মেয়ে শান্তি।

সে বছর নয়, তার পরের বছর আবার গেল পরিমল খেলা দেখাতে। কিন্তু সব খেলা দেখানো শেষ করার আগেই নিজে এক মাতালকরা খেলায় ডুবে গেল। শান্তি ঘর ছেড়ে চলে এল গভীর রাতে তার হাত ধরে।

সেদিন কুয়াশাভরা গভীর শীতের রাতে, ফসলে উপচেপড়া ক্ষেতের আলপথ ধরে দুজনে হোঁচট খেতে খেতেও মনে হয়েছিল এ-পৃথিবী বড় শান্তিময়—প্রেমের সুঘ্রাণে উত্তেজিত। আকাশময় অজস্র তারের চোখ জ্বলছিল সে রাতে মিটমিট করে।

পরিমলের মনে হয়েছিল পৃথিবী নয়—সে ঘুমের মধ্যে স্বর্গের স্বপ্ন দেখছে। সে যেন সমস্ত পৃথিবীটাকে হিপ্নোটাইজ করে দিয়েছে। পরিমলের বুকজুড়ে তখন শুধু স্বপ্ন, সে আর গ্রাম শহরের ইস্কুলে নয় কিম্বা কলকাতার ফুটপাতে নয়, বড় বড় হলে শো দেখাবে, শুধু কলকাতা বম্বে না, যাবে ফ্রান্স ইংল্যান্ড আমেরিকা জাপানে। পি-সি-সরকার হবে সে। শান্তি তার খইফোটা ঠোঁটে চারবেলা চুমু খেত।

পঁচিশ বছরে স্বপ্নের সন্দেশ এখন খোলা হয়ে পায়ের তলায় ফুটছে অহরহ। চোখ বেঁধে ছোঁড়া তীর এখন নিজের বুককে বিদ্ধ করছে। দিবানিশি টুপটাপ করে রক্ত ঝরে যাচ্ছে ফোটায় ফোটায়, কেউ দেখে না, কেউ জানে না, শুধু সে জানে। পরিমলের অন্তরটা জানে শুধু।

টালিগঞ্জের হরিপদ দত্ত লেনের খোলার চালের ঘরে দিনরাত শান্তির সঙ্গে তার অশান্তি হয়। চল্লিশ বছরের নয় যেন ষাট বছরের বুড়ি এখন শান্তি। প্রতিমুহূর্তে গঞ্জনা দেয়, দাঁতমুখ খিঁচোয়, অভিসম্পাত দেয়।

'কী ম্যাজিক, এমন বেগুনবেচা মুখ কেন?' —শৈলেন কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে—'ব্যানার্জির প্রেমলীলা দেখবে নাকি চলো। কাঠের দেয়ালে ফুটো আছে—যুযুৎসু দেখবে ওঠ।' —জর্দার ঝাঁঝালো গন্ধ ভুরভুর করে জলো বাতাসে।

খৈনীর নেশাটা আজ বড় জাঁকিয়ে এসেছে, মাথার ভেতরে রক্তস্রোত বনবন করে ছুটে বেড়ায়। বুকের মধ্যে কলজেটা পাথরের মত ভারী হয়ে ঝুলে থাকে। দুহাতে নিজের উরু দশ আঙুলে খামচে ধরে তারক বলে চিবিয়ে চিবিয়ে—'গভর্মেণ্ট যদি বাগানটা ন্যাশনালাইজ' করে নেয়, আবার যদি চাকরীটা ফিরে পাই না শৈলেন, দেখিস সালা লাইফটা আবার নতুন করে স্টার্ট দেব, যা পাব হাতের কাছে সারা শরীরে চেখে দেখব।' —বলে নিজের শুকনো দুঠোঁটই চাটে তারক। তার চোখ-মুখ টসটসে। টান টান শিরা পেশী। মেঘের থেকে বিদ্যুৎ-ঝলকে বজ্র লাফ মারে মাটিতে, মাটি কেঁপে ওঠে।

হা-হা শব্দে হাওয়া ছোটে চারিদিকে এলোমেলো রক্তমুখ পিশাচের মত। তোড়ে বৃষ্টি পড়ে গলগলিয়ে যেন আকাশ এখন বুকফাটা।

'অই আনন্দেই থাক, নিয়েছে তোমার বাগান! হাতের মোয়া।' —শৈলেন আবার একখিলি পান ছোট্ট টিনের বাক্স থেকে সোজা মুখে পোরে।

'কেন নেবে না, আমরা কী সালা বানের জলে ভেসে এসেছি নাকি? চিরকাল বেকার বসে থাকব নুলো হয়ে?' —তারক রেগে উঠতে যায় কিন্তু সাহস করে না। তার গলার স্বর ফেঁসে যায়।

'এমনি এমনি নেবে নাকি? আপনারা আন্দোলন-টান্দোলন কিছু করছেন না?'

পরিমল নেশা ভেঙে পাঝাড়া দিয়ে বলে। আড়মোড়া ভাঙে। ভেতরে কলজেটা নড়বড় করে।

তারক বলে—'করছে, মজুররা করছে।'

'আপনি কী করছেন? ঠুঁটো জগন্নাথ?' —পরিমল হিপ্নোটাইজ করা চোখ দুটো পরিপূর্ণ খুলে তারকের দিকে তাকায়।

সহসা তারক আঁতকে ওঠে। কোন কথা বলতে পারে না। ভয় ভয় মুখটা তার কাঁচুমাচু হয়ে যায়। আর তখন ম্যাজিসিয়ান চোখ সরিয়ে নিয়ে জলেভেজা কলাবতী ফুল দেখে। হাওয়ার নাড়া খেয়ে কাত হচ্ছে। জল গড়াচ্ছে লালপাপড়ির ওপরে সাদা মুক্তোবিন্দুর মত।

ঠুঁটো জগন্নাথ কথাটা পরিমলের ছেলে তাপসের লব্জকথা। পরিমলকে শুনতে হত হামেশা ছেলের মুখে। কুড়ি বছুরে ছেলে বুকের পাটা চওড়া, সে বয়সে পরিমলের যেমন স্বপ্ন ছিল, তারও চেয়ে ধারালো স্বপ্ন দেখে ছেলেটা। দেশের সবার ভাবনা যেন ওর মাথায়। সবার খাওয়া-পরা স্বাস্থ্য নিয়ে ওর ভাবনা। কবে সবাই মানুষের মত বাঁচবে। নতুন করে জীবন সুরু করবে। আর ঠিক এজন্যই বনে না বাপের সঙ্গে। খিটিমিটি লাগে, যুদ্ধও বলা যায়। পরিমলের ইচ্ছে ছেলে চাকরী করুক। ছেলে বলে—চাকরি আমি একটা না হয় পেলাম, তারপর সারাজীবন নেই নেই খাই খাই। আর যেখানে লাখ লাখ বেকার, সেখানে একা একটা চাকরি পাওয়া যেন হায়েনার ছাগলছানা শিকারের মত নিষ্ঠুরতা। সে বস্তির হা-ভাতে হা-ঘর লোকজনদের নিয়ে মিছিল করত, দাবী করত; দাবী তুলত। দিনরাত স্বপ্নের ঘোরে ফিরত ছেলে। ডাকাবুকো ছেলেটা নাকি সমাজ পাল্টাবে। এখন সে জেলে। দু বছর।

একদিনও গিয়ে দেখে আসেনি সে ছেলেকে। শান্তি যেতে চেয়েছে। শান্তির সঙ্গে তুমুল খিস্তিখেউর ঝগড়াঝাটি হয়েছে। পরিমলের জেদ কী নিজের ছেলের চেয়ে একবিন্দু কম? শান্তির চোখের জলে কী পরিমল গলে যাবে? সেদিন আর নেই, যখন একজনের আবদার রক্ষার জন্য আরেকজন সব কষ্ট স্বীকার যেত, সে টান নেই মায়া নেই, সে প্রেম নেই; এখন কারো কিছু এসে যায় না,

কারো চোখের জলে কারো মন ভেজে না ; উল্টে খাঁ খাঁ করে বুক। আগুন জ্বলে রক্তের মধ্যে। মুখের কথা বিষ হয়ে ঝরে পড়ে।
বৃষ্টির ওপর বৃষ্টি ঝাঁপিয়ে পড়ে, হাওয়ার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে হাওয়া, অন্ধকার গাঢ় হয়ে ওঠে আলকাতরার মত ; ঝলসানো আঁকাবাঁকা বিজলী মুখে নিয়ে অন্ধকার মেঘ দাপিয়ে বেড়ায় সারা আকাশ।
'একী দুর্যোগ করলে রে বাবা!' বলে শৈলেন ডানহাত দিয়ে সুইচ টিপে দেয়, বারান্দার আলো জ্বলে ওঠে।
চোখে আলো সূচের মত বেঁধে, ম্যাজিসিয়ান যন্ত্রণায় চোখ বোজে। দূরে কোথাও একটা গরু হামলাচ্ছে, কুকুর ডাকছে আকাশে মুখ তুলে।
তারক যেন আপনমনে অনেক দূর থেকে বলে—'এবারও দেখবি শৈলেন সেবারের মত দারুণ বন্যা হবে, লোকজন গরুবাছুর অনেক মরবে। সাংঘাতিক কিছু একটা হবে।'
'রাখ শালা তোর যত ভয়দেখানো কথা!'—শৈলেন ধমকায়', তারও ভয়পাওয়া মুখ।
আর ঠিক এসময় ভেতর-বারান্দা থেকে আর্ত বকবকম আর সন্ত্রস্ত ডানা ঝাপটানোর শব্দ ওঠে। ম্যাজিসিয়ান উঠে পড়ে, ভেতরে চলে আসে। যতটা না প্রাণের টানে তারও চেয়ে বেশী অভ্যাসবশে।
দুদিকে তারের জাল আর চারদিক বন্ধ প্যাকিংবাকস বৃষ্টির ছাঁটে ভিজে যাচ্ছে। তাকে দেখেই জলেভেজা পায়রাগুলো গোল গোল চোখে চায়, গ্রীবা বাঁকায়। নিঃশব্দ ভঙ্গিতে যেন অভিমান ফুটে ওঠে,—'এতক্ষণ থেকে ডাকছি শুনতে পাও না? ভিজে যাচ্ছি আমরা।' যেন এরকম কথা ওরা পরিমলের দিকে চেয়ে বলে। আজ আর পরিমল জালের ভেতর দিয়ে আঙুল ঢুকিয়ে দেয় না, ওরাও আঙ্গুলে চুমু খাবার ভঙ্গিতে ঠোঁটে ঠোকরায় না, অন্যদিনের মত পরিমল ওদের বকাঝকাও করে না—'কীরে একমুহূর্ত আমাকে শান্তিতে কোথাও বসতে দিবি না? বসেছি কী অমনি তোদের ডাকাডাকি সুরু হয়ে যায়? আমি কী তোদের কেনা গোলাম?' সাদা পায়রা দুটো জালের ভেতর দিয়ে ঠোঁট বাইরে বের করে দেয়। যেন বলে—'কই তোমার আঙ্গুল কই?' খাঁচাটাকে আলতো করে ধরে ঘরে আনে পরিমল। ফাঁক পেয়ে সাদা পায়রা দুটো তার গালে ঠোঁট ঘষে। আরো দুটো ছাইরঙের ছিট ছিট পায়রা আছে। ওরা বেশী এগোয় না। সাদা দুটোর আদর-আবদার বেশী; বেশী ন্যাওটা।
ওদের দিয়েই খেলা শেষ করে পরিমল। কালো চাদর শূন্যে ছড়িয়ে দেয় পরিমল জঞ্জালফেলার ভঙ্গিতে। কোথাও কিছু নেই কিন্তু সেই বস্তুহীন শূন্য থেকে চাদর যখন নেমে আসে, তখন তার ভেতর থেকে বের করে আনে ধবধবে দুটি সাদা পায়রা। তারপর দুহাতে দুটিকে ধরে নিজ সন্তানের গালে চুমু খাবার মত করে চুমু খায়—দর্শকের দিক হিপ্নোটাইজ করা চোখে তাকিয়ে বলে—

'শান্তি আর মৈত্রীর দূত, আমাদের ভারত-আত্মার প্রতীক।

আধো আলো আধো অন্ধকারে মহাশূন্যে দু হাত উৎক্ষিপ্ত করে দেয় ম্যাজিসিয়ান, প্রথমে কিছুক্ষণ পায়রা অদৃশ্য হয়ে যায়, তারপর শান্তির মন্ত্র উচ্চারণ করে সে, তখন অকস্মাৎ শূন্যে আবির্ভূত হয় শান্তি আর মৈত্রীর দুই দূত সাদা পায়রা, দর্শকদের মাথার ওপরে ব্যালেনৃত্যের ভঙ্গিতে উড়ে যায়। ম্যাজিসিয়ান দুহাত ছড়িয়ে ভারতবর্ষের ম্যাপের আকারে দাঁড়িয়ে থাকে। পায়রাগুলো এরপর শূন্য থেকে টাল খেয়ে সাঁ করে নেমে আসে, বসে পড়ে ম্যাজিসিয়ানের দুকাঁধে দু দিকে। নতমস্তকে দু হাত কপালের কাছে এনে দর্শকদের অভিবাদন করে ম্যাজিসিয়ান। আর তখন হাততালির উল্লাসের তরঙ্গ বয়ে যায় তার শরীরের ওপর দিয়ে সমুদ্রের মত।

ওরা ঠোঁট দিয়ে জাল কামড়ে ধরে ঝুলে থাকে। আজ ছাতুটাতুও বিকেলে দেয়নি পরিমল। ওদের খিদে টের পায় পরিমল ওদের মুখ দেখে। তর্জনী ঢুকিয়ে দেয় ভেতরে পরিমল—ওরা চুমু খাওয়ার ভঙ্গিতে ঠোঁট ঘষে। পরিমল ধমক দিয়ে বলে—'ঠুকরে দে, ঠুকরে খা দেখি আঙুলটাকে।' ওরা অবাক হয়ে গ্রীবা বাঁকায়।

শান্তির মুখ মনে পড়ে পরিমলের। এসেই টাকা পাঠাবার কথা ছিল। কড়া চিঠি এসেছে আজ। একটা বৌকে পোষার মুরোদ নেই, অত ঢং করে তার জীবনটা নিয়ে কেন ম্যাজিক খেলেছিল সে?

গাছ নাড়লে টাকা আসে? যারা দেবার তাদের ট্যাঁক ফাঁকা হলে সে কী করবে? টাকা বানাবে? নানান ভাবনা ভাবে, কিন্তু সঠিক কিছু ভেবে পায় না পরিমল। তার হোটেল খরচ আর ফিরে যাবার টাকাই এখন টান। কিছু যা আছে তাতে কী হবে? দু আঙুল ঢুকিয়ে পায়রার ঠোঁট সাঁড়াশীর মত চেপে ধরে পরিমল। পায়রাটা ডানা ঝাপটায়, অতর্কিতে তীক্ষ্ম নখে আঁচড়ে দেয় পরিমলের হাত। সাদা আঁচড়ের দাগে কলাবতী ফুলের রঙের রক্তবিন্দু ফোটে। শেষ যেটুকু ছাতু ছিল এনে দেয় পরিমল রক্তাক্ত হাতে। চিনচিন করে জ্বলে যায় বুকের ভেতরটা। কেউ দেখে না, কেউ জানে না—অথচ সেখানে আরো কত রক্ত।

চড়াৎ করে মেঘ থেকে বাজ লাফিয়ে পড়ে মাটিতে, ভিতসুদ্ধ কাঁপিয়ে দেয়। শরীর ফুঁড়ে যেন বিজলি ছুটে যায় মাটিতে।

মেঝে কাঁপিয়ে ব্যানার্জি দরজা খুলে বেরিয়ে আসে। লুঙ্গির ওপরে পায়ের ডিম অবধি লম্বা চকচকে নাইট গাউনে তার রক্তমাংসের শরীর ঢাকা।

'শৈলেনবাবু, রাত্রে দু প্লেট মুরগীর মাংস চাই। যা ফাইন ওয়েদার করেছে।' ছ ফুটি শরীরে, তার দু চোখ নেশাছন্ন।

'মুরগী? এই ঝড় বৃষ্টিতে এখন আমি মুরগী পাব কোত্থেকে?' শৈলেন হেসে অসহায়তা ফোটায় মুখে।

আমি মশাই ক্যাশ পেমেণ্ট করব। দেখুন না কাউকে পাঠিয়েটাঠিয়ে যদি—
'আমি একবার ঘুরে আসতে পারি শৈলেন'—তারক চকচকে চোখে তাকায়।
'তুই যাবি ?' সন্দিগ্ধ চোখে তাকায় শৈলেন—গিয়ে কী ফয়দা। এই ঝড়বৃষ্টির মধ্যে তোর জন্য মুরগীর দোকান খোলা রেখেছে ?'
'প্লিজ শৈলেনবাবু। ম্যানেজ ইট সামহাউ। ওয়েদারটা দেখছেন না ?'—বলে ব্যানার্জি নাইট গাউনের পকেট থেকে দুটো দশ টাকার নোট বের করে। পায়রার চেয়েও লম্বা গলা উঁচিয়ে ঝুঁকে পড়ে ম্যাজিসিয়ান। বলে—'আমি একটা ব্যবস্থা করে দিতে পারি।' তিন জোড়া চোখ তার ঢাউস মুখে এসে আঠার মত আটকে যায়।
নিজের মুখের থুথু নিজে গিলে ম্যাজিসিয়ান বলে—'আপনি কুড়ি টাকা দিয়ে আমার চারটে পায়রা কিনে নিন, ব্যানার্জি সাহেব, পায়রার মাংস বেশ'—
'পায়রা ? বিউটিফুল। খুব টেস্টি।—ব্যানার্জি দুহাত এগিয়ে দেয় ম্যাজিসিয়ানের দিকে যেন তার প্রাণ বাঁচিয়েছে সে। দুটো দশ টাকার নোট তুলে দেয় ম্যাজিসিয়ানের রক্তাক্ত হাতে।
শৈলেন তারক প্রায় একসঙ্গে বলে ওঠে—'সে কী ম্যাজিক, তুমি তোমার পায়রা বেচে দিচ্ছ ?'
ম্যাজিসিয়ান হাসে, দুঠোঁট পায়রার মত লম্বা করে বলে—টাকার দরকার। আপনার হোটেলের বিলও তো মেটাতে হবে।'
'তাই বলে।' শৈলেনের গলায় পানের রস আটকে যায়। অন্ধকারে কলাবতী ফুল জলে ভেজে।
শক্ত মুঠোয় টুঁটি চেপে ধরে ঝটাং টানে যখন সাদা পায়রার গলা ছেঁড়া হয়, তখন তাদের সাদা এবং ছাই রঙের পালক ফিনকি দিয়ে ছড়ানো রক্তে ভিজে যায়। চকচকে জলেভেজা মেঝেয় রক্তের ধারা গড়িয়ে যায়।
অদূরে দাঁড়িয়ে নির্নিমেষ তৃষ্ণার্ত চোখে তাকিয়ে দেখে ম্যাজিসিয়ান। বুকের ভেতরটা চিনচিন করে। শান্তির কথা ফুট্‌কুরি কাটে বুকের মধ্যে ? সে ভাবে, এবার ফিরে গিয়ে শান্তিকে নিয়ে সে জেলে ছেলেকে দেখতে যাবে, যেমন করে গভীর এক কুয়াশাময় শীতের রাতে ফসলেভরা ক্ষেতের পাশে আল ভেঙে ভেঙে শান্তিকে বুকের কাছে জড়িয়ে ধরে সে হেঁটেছিল অবিকল তেমনি করে সে শান্তিকে নিয়ে ফাটক-বন্দী ছেলেকে দেখতে যাবে।

গন্ধ

সুচিত্রা ভট্টাচার্য

গন্ধটা প্রথম নাকে এসে লাগে পারুলবালার। সে যেদিন কাজে আসে সেদিন বেশ সকাল সকালই এসে পড়ে। ঠিক ঘড়ি ধরে দশটার মধ্যে তাকে ছ ছটা বাড়ি ছুঁয়ে যেতে হয়। সাতসকালে ঘুম ঘুম মেজাজে, অনেকটা গাড়ির ইঞ্জিন স্টার্ট নেব নেব ভঙ্গিতে সে প্রথমে ছতলার আঠার নম্বর ফ্ল্যাটের কলিং বেল টেপে। সে সময় রোজই আটতলাএই দামড়া অলকাপুরী একেবারে কোলের বাচ্চার মত নেতিয়ে পড়ে থাকে।

আজও পারুল ঘুমন্ত বাড়িটার পেট চিরে চিরে লিফ্‌ট্‌ বেয়ে ওপরে উঠে আসে। দরজা সরিয়ে মোজাইক করা মেঝেতে পা রাখার সঙ্গে সঙ্গে একটা পচা দুর্গন্ধ এসে তাকে ধাক্কা মারে। 'এ ম্যা গোঃ', পারুল নাকে মুখে পুরো আঁচলটা চেপে ধরে পেট থেকে শব্দ তোলে। চোখ ভুরু কুঁচকে এদিক ওদিক তাকায়। কয়েক সেকেন্ড থমকে দাঁড়িয়ে থাকার পর ওয়াক তুলতে তুলতে ছুটে যায় আঠার নম্বরের দরজায়।

এ ফ্ল্যাটে থাকেন ডাক্তার হিমানীশ ভৌমিক। বিশাল নামী এবং দামী হার্ট স্পেশালিস্ট্‌। বছর পঞ্চাশ বয়স। দীর্ঘ বলিষ্ঠ চোখা চেহারা। পারিশ্রমিক চেম্বারে চৌষট্টি, বাড়ীতে কল দিলে একশ কুড়ি। স্ত্রী অনুরূপা একটু গোলগাল, মোটা সোটা। ভরাট মুখ আর স্নিগ্ধ চোখে একটা চিরন্তন মা মা ভাব থাকলেও পোষাকআশাক এবং হাবভাবে তিনি ধোপদুরস্ত আধুনিকা। তবে মানুষটা স্বামীর মত তত গম্ভীর স্বভাবের নন, রীতিমত হাসিখুশী, মিশুকে। মেয়ে ঝিনুক ডাক্তারি পড়ছে। ছেলে সৈকত ইন্‌জিনিয়ারিং। দুজনেই হস্টেলে থেকে পড়াশুনা করে।

বাচ্চা চাকরটা এখনও ঘুমোচ্ছে। অনুরূপাই পারুলকে দরজা খুলে দেন,—'কি রে, ব্যাপারটা কি? একভাবে বেল চেপেই আছিস? কাল আসিসনি কেন? কি হয়েছিল?

পারুল এক ঝটকায় ড্রয়িংরুমে ঢুকে পড়ে দরজার পাল্লা ঠেলে দেয়। আধুনিক ঝকমকে বিদেশী কায়দায় তৈরী সুসজ্জিত ফ্ল্যাট। হিমানীশ ভৌমিক হিসেবী মানুষ। নিজের করে বাড়ি তৈরির হ্যাপা অনেক। তার ওপর আজকাল ইন্‌কামট্যাক্স, প্রফেশনাল ট্যাক্সওয়ালাদের দৌরাত্ম্য বড় বেড়েছে। এমত অবস্থায় বিশাল বাড়ি একার করে না হাঁকিয়ে এই ধরণের 'ওন ইওর ফ্ল্যাট্‌' স্কীমটাই তাঁর বেশি পছন্দ হয়েছিল।

ড্রইং রুমের গা ঘেঁষে একটু উঁচুতে ডাইনিং স্পেস্‌। সুদৃশ্য কাঠের দুতিন খানা ছোট্ট ছোট্ট সিঁড়ি বেয়ে সেখানে যেতে যেতে পারুল ওয়াক তোলে।

—'কি হল তোর ?' পারুলের হাবভাবে অনুরূপার ঘুমঘুম ভাবটা ছুটে গেছে।

ওয়াক। পারুল আবার শব্দ তোলে।

অনুরূপা মনে মনে ভারি শঙ্কিত হয়ে পড়েন। এই কদিন আগেই তো পারুল বাচ্চা হবে বলে ছুটি নিয়েছিল। আবার ?

পারুল আরও বার কয়েক ওয়াক তুলে শান্ত হয়—'কি পচেছে কি বৌদি। ঠিক আপনাদের দোরগোড়ায়। বাবাঃ, কি বাস গো।

অনুরূপা চমকে ঘুরে তাকান। দরজা বন্ধ করার পর যদিও এদিকে গন্ধটা আসছে না, আসার কথাও নয় তবু অনুরূপা পারুলের মত শাড়ির আঁচল চেপে ধরেন নাকে,—'কি পচেছে একবার দেখলি না ?'

'—আমার কি ঠেকা ? আপনেদের ঘর দোর। আপনেরাই দেখুন।' পারুল এতক্ষণে নিয়ম মাফিক খরখর করে ওঠে। ঘেন্নাঘেন্না মুখে কিছুটা কঠিন ভাব ফুটিয়ে টেবিল থেকে রাতের বাসন তুলতে থাকে।

কুড়ি নম্বরের মনিকাঞ্চন ব্যানার্জী তখন ঘরের আলো জ্বালিয়ে, লো ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসে দাড়ি কামাচ্ছে। কিছুক্ষণ আগে সে বিছানা ছেড়েছে। আর একটু পরে উঠলেও হত। ঘুমটা সেই যে মাঝরাতে পালিয়ে গেল আর এল না। সামনে কোন টেন্‌শন্‌ থাকলে তার এমনটাই হয়। আজকের দিনটা তার কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ফরেন এক্সপার্টরা আসছে তাদের নতুন প্ল্যান্টের কাজ দেখতে। সঙ্গে চেয়ার ম্যান আর এম্‌ডিও থাকছে। নিজেকে সেখানে ঠিক মত জাহির করতে পারলে ষ্টেট্‌স্‌ যাওয়াটা তার আটকায় কে ? ওই একটা আঙুর ফলের জন্য অনেক শালা লাইন মারছে। ঘোষ, সিন্‌হা, স্বামীনাথন সবাই ধান্দায় আছে। এ বাজী তাকে জিততেই হবে। মনিকাঞ্চন জুলপীর পাশ দিয়ে ইলেকট্রিক রেজার টানে আলতো করে। উঠতেই হবে তাকে। আরও ওপরে উঠতে হবে। দরকার হলে আরেকবার উর্মির সাহায্য নিতে হবে। চেয়ারম্যানের উইকপয়েন্ট্‌স্‌ গুলো তার জানা আছে। পঁয়ত্রিশ পেরিয়ে গেলেও উর্মি যেন কি যাদুতে বয়সটাকে বেঁধে রেখেছে পঁচিশের কোঠায়। এটাই মনিকাঞ্চনের একটা বিরাট গর্ব। অ্যাসেট্‌ও বটে। নিজে গত জুনে বিয়াল্লিশে পড়েছে। এর মধ্যে ঘন চুলের গা বেয়ে মোটা রুপোলি রেখা। ডাক্তার বলে লিভারই নাকি এ ধরণের ষড়যন্ত্রের মূলে। শালারা মাল খাওয়াটা বন্ধ করতে বলে। ওদিকে পাশের ফ্ল্যাটের ভৌমিককে দেখো। একটি চলমান পিপে। কে জানে, ডাক্তারদের লিভারে হয়ত আলাদা কোটিং থাকে।

অনেক সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে মনিকাঞ্চনের চোখ চলে যায় পাশের বিছানাটার দিকে। ডানলোপিলোর নরম গদির কোলে উর্মিমালা অকাতরে ঘুমোচ্ছেন। এখন ডাকলেও উঠবেন না। কাল পার্টিতে বড় বেশি জিন্‌ টেনেছেন।

মনিকাঞ্চন একবার চোখের ইশারায় বারণও করেছিল। এই জন্যই বলে মেয়েমানুষকে নেশা ধরাতে নেই, ওদের মাত্রাজ্ঞানটা বড় কম। মনিকাঞ্চন কাল সারাক্ষনই খুব সাবধানে ছিল। দু পেগেই সারা পার্টি কাটিয়ে দিয়েছে। প্রথমতঃ আজকের চিন্তাটা মাথায় ছিল। দ্বিতীয়ত কন্ট্রাকরদের দেওয়া পার্টিতে মণিকাঞ্চন কখনও বেহেড মাতাল হওয়াটা পছন্দ করে না। সুরজ জৈন কাল খুব তেল মারছিল চিফকে। আরে শালা, তোর টেন্ডার তো আমার হাতে। ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খেতে চাইছ বাবা। মণিকাঞ্চন দাঁতে দাঁত চেপে চোয়াল বরাবর রেজারটা ঘুরিয়ে নেয়। জৈন তার কাছেও খুব ঘ্যানঘ্যান করছিল। চিফ্ নাকি পুরো দশ চেয়েছে। তার আমি কি করতে পারি? দিতে পারো দাও দশ বিশ যা খুশী তোমার চিফের গবে। টেন্ডার তো আমার হাতে। এক ঝানু ব্যবসাদার তুমি আর এটুকু বুঝলে না? আমি তো শালা তোমার আঙুল চুষতে বসে নেই। ওকে যা দেবে তার চেয়ে আমার পাঁচ বেশি! মণিকাঞ্চন সে কথা কাল সফ্‌সুফ্ জৈনকে জানিয়ে দিয়েছে। তুমি শালা লাখ টাকার সরকারি কন্ট্রাক্ট পাওয়ার ধান্দায় আছ আর এখনও কোন্ শিবের পুজো দেওয়া দরকার তা বুঝলে না? কালকের মত আরও দশটা পার্টি দিতে হবে তোকে ডেপুটি চিফ ইঞ্জিনীয়ার ব্যানার্জীকে গলাতে গেলে। বুঝলি?

নিজের মনে জৈনের গুষ্টি উদ্ধার করতে করতে মণিকাঞ্চন কেমন যেন আত্মতৃপ্তি অনুভব করে। নরম গালে বিলিতি আফটার শেভ্ লাগাতে লাগাতে নিজেকে একটু আদরও করে। আয়নায় নিজেকে জিভ ভেংচায়। এক কাপ চা বা কফি পেলে এখন মন্দ হত না। ঊর্মির কাজের লোকরা সব আসবে সাতটার পর। সামনের ঘর থেকে বুমবুমের আয়াটাকে ডাকবে? না থাক। তার চেয়ে বরং ঊর্মিকেই ডাকা যাক।

খাট বরাবর এগিয়েও থেমে যায় মণিকাঞ্চন। বিশ্রী লোভনীয় ভঙ্গিতে ঘুমোচ্ছে ঊর্মি। পাতলা নাইটির ভেতর দিয়ে ঊর্মির রোজ দেখা শরীর আরেকবার দেখে মণিকাঞ্চন। নাঃ, ঊর্মি সত্যিই সুন্দর। কি রঙে, কি মুখশ্রীতে, কি শরীরের ঠিক ঠিক খাঁজে বউটা তার সত্যিই অ্যাসেট্।

মণিকাঞ্চনের একভাবে তাকিয়ে থাকার জন্যই হক কিম্বা কোন ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের ধাক্কাতেই হক ঠিক সেই সময় চোখ খোলে ঊর্মি। ঘুম ঘুম গলায় জড়িয়ে জড়িয়ে প্রশ্ন করে,—'তুমি উঠে পড়েছ? কটা বাজে?'

মণিকাঞ্চন খাটের লাগোয়া বুকষ্ট্যাণ্ড থেকে ডানহিলের প্যাকেট খুলে ধরায়। ঊর্মি চোখ বন্ধ করে। আবার খোলে।

—'তুমি আজ কটায় বেরোবে?'

—'বেরোব।' মণিকাঞ্চন আধশোয়া হয়,—'একটু চা খাওয়াবে?'

ঊর্মি চোখে বুজে মুখ দিয়ে অদ্ভুত আদুরে কিছু শব্দ বার করে,—'উঁ উঁ',

প্লিজ, আমার মাথাটা ভীষণ টিপ টিপ করছে।'

মণিকাঞ্চন হতাশ মুখে উঠে দাঁড়ায়। রান্নাঘরে গ্যাস জেবলে জল বসায়। ঘড়ি দেখে। ছটা বাজতে চলল। সাড়ে সাতটার মধ্যে বেরোতে হবে। ড্রাইভারকে সেই মত আসতে বলা আছে। সাধারণতঃ অন্যান্য দিন সাড়ে আটটা থেকে নটার মধ্যে বেরোয়। অফিস যাওয়ার পথে বুমবুমকে স্কুলে নামিয়ে দিয়ে যায়। ছেলেটা বেশ ব্রাইট হয়েছে। মাথা খুব সাফ্। তবে মায়ের মত অত রূপ পায়নি। কিছুটা বাপঘেঁষা চেহারা। ওকে দেখলে মাঝে মাঝে নিজের ছোটবেলাকে মনে পড়ে যায় মণিকাঞ্চনের।

রান্নাঘর থেকে বুমবুমের ঘর খোলার শব্দ পাওয়া যায়। যাক্। আয়াটা উঠেছে। বছর তিনেক বয়স থেকেই উর্মি ছেলের জন্য আলাদা ব্যবস্থা করে দিয়েছে। গত চার বছর ধরেই আয়াটা রাতে বুমবুমের ঘরে থাকে। পুরোন, বিশ্বাসী, অলস মেয়েছেলে।

—'জল বসিয়ে দিয়েছি। চা করে ফেলো তো।' আয়াটার উদ্দেশ্যে কথাগুলো ছুঁড়ে দিয়ে বুমবুমের ঘরে ঢোকে মণিকাঞ্চন। ঢুকেই দেওয়ালে ঝুলন্ত বিবেকানন্দ আর রামকৃষ্ণর দিকে তাকিয়ে অন্যমনস্কভাবে কপালে হাত ঠেকায়। এটা তার একেবারে ছোটবেলাকার অভ্যাস। সে আর উর্মি দুজনে মিলে বুমবুমের ঘর সাজিয়েছিল। দেওয়ালের বিবেকানন্দ, রামকৃষ্ণ মণিকাঞ্চনের আর সুভাষচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ উর্মির ফ্যাসিনেশন্।

মণিকাঞ্চন ফুলের মত নরম ছেলের চুলে হাত রাখে। আর তখনই বাইরে কলিং বেল বেজে ওঠে।

—'মিঃ ব্যানার্জী, দেখুন তো, আপনার দরজার আশেপাশে কিছু পচেছে কি না।' ভৌমিকের ব্যস্তসমস্ত ভাবে প্রথমটা ঘোলা হয়ে যায় মণিকাঞ্চন। পরক্ষণেই পচা দুর্গন্ধটা এসে লাগে তার নাকে।

—'উঁ উঁ, কি মরেছে বলুন তো?' মণিকাঞ্চন নাক টিপে ধরে।

ডাক্তারের পরনে ড্রেসিং গাউন। নাকে সাদা রুমাল, —'ইস্, কি আনহোলিদ স্মেল্।' এদিক ওদিক ঘুরে ঘুরে গন্ধের উৎস খোঁজেন ডাক্তার।

মণিকাঞ্চন দরজার বাইরে এসে দেখে ব্যারিষ্টার সেনগুপ্ত আর প্রফেসার চৌধুরিও বেরিয়ে এসেছেন। সেনগুপ্ত এত সকালেও ধোপদুরস্ত পাজামা পাঞ্জাবী পরে আছেন। হাতে জলন্ত চুরুট। মণিকাঞ্চনেরই সমবয়সী। হাইকোর্টে ভদ্রলোকের বিশাল পসার। বেঁটেখাট চেহারা। চোখের নীচে অ্যালকোহলের ফলস্বরূপ ফোলা ফোলা ভাব। দ্বিতীয় চিবুক গজিয়ে গেছে। প্রফেসার নীহারবিন্দু চৌধুরি নামকরা একটি কলেজের ইংলিশের প্রফেসর। ইউনিভার্সিটির পেপার সেটার, এক্সজামিনার এবং ট্যাবুলেটরও বটে। ছ ফুট লম্বা তাগড়াই চেহারা, চওড়া কাঁধ। গায়ের রঙ্ বেশ কালো। মাথা জোড়া চকচকে টাক।

এ'রা সকলেই যখন গন্ধটার উৎস সন্ধানে ব্যস্ত তখন মণিকাঞ্চন লক্ষ্যই করেনি বুমবুম কখন উঠে বেরিয়ে এসেছে। হঠাৎ বুমবুমের উত্তেজিত চিৎকারে সবাই চমকে তাকায়,—'এই যে পেয়েছি ; এই যে এখানে।'

ছোট্ট বুমবুম লিফ্‌টের দরজার এককোণে উ'চু হয়ে বসে আছে। সবাই গিয়ে দেখে, একটা ধেড়ে ই'দুর বেকায়দায় কোলাপসিব্‌ল্‌ গেটের একেবারে কোণার খোঁজে আটকে মরে পড়ে রয়েছে। এমন বিশ্রী প্যাঁচ খেয়েছে যে গেট খোলা বন্ধ করার সময়ও নীচে পড়ে যাচ্ছে না। কবে মরেছে কে জানে। কেউই লক্ষ্য করে নি। এখন পচে ফুলে থসথসে হয়ে বিকট গন্ধ ছড়াচ্ছে।

—'এত বড় একটা ই'দুর এত উ'চুতে উঠল কি করে?' বিস্ময়ে ফেটে পড়ে মৃদুলা। প্রফেসারের স্ত্রী। —'আগে একটা জমাদার ডাকো।' অনুরূপা ঘরের দরজা থেকে চে'চান।

মণিকাঞ্চন সবার কাছে মাপ চেয়ে নেয়,—'আমায় এক্ষুনি বেরোতে হবে। বড্ড দেরী হয়ে গেল। প্লীজ্‌, কিছু মনে করবেন না।'

ঊর্মি নাইটির ওপর একটা ঝলমলে হাউসকোট চাপিয়ে বেরিয়ে এসেছে। ফোলা লালচে মুখ। বাসি চুল এলোমেলো। পুরুষরা সবাই আড়চোখে তাকায় তার দিকে। মৃদুলার এসব দিকে খুব কড়া নজর। মণিকাঞ্চনের কথার সঙ্গে সঙ্গে সে বলে ওঠে,—'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। মিসেস ব্যানার্জী, আপনারা ভেতরে যান। ও সাফাই আমরা করিয়ে নিচ্ছি।'

কেয়ার টেকারকে খবর দেওয়া হয়। কিছুক্ষণ পর সে একটা বাচ্চা ছেলেকে ধরে আনে,—'সুইপার কোথাও পেলাম না স্যার। এই ছোকরাই ফেলে দেলে দেবে।'

মিশকালো বাচ্চাটার পরনে ছেড়া ঝলঝলে হাফপ্যান্ট্‌। খালি গায়ের চাপ চাপ নোংরা ছাপিয়ে পাঁজরাগুলো ফুটে রয়েছে। চুল রুক্ষ। ছেলেটা দেখেশুনে অদ্ভুত এক দাবী করে বসে।

—'এ যে দেখচি বাবু গলে পচে প্যাঁক হয়ে রয়েচে। ওটাতে গেলি খসে খসে পড়বে। দুটো ট্যাকা দিতি হবে।'

ওটুকু একটা প্যাংলা ছেলের দাবী শুনে সবাই থ। ডাক্তার ধমক মারে,—'দূর ব্যাটা, দুটাকা কখন একসঙ্গে চোখে দেখেছিস? ওঠা। আট আনা দেব।'

ছেলেটা গোঁ ধরে থাকে,—'না বাবু, হবে নি কো। দু ট্যাকা নাগবে।'

প্রফেসর ছেলেটার মুখোমুখি দাঁড়ান,—'দুটাকা আবার কি? একটাকা দেব। তুলে ফ্যাল।'

ছেলেটা তবু গোঁজ হয়ে থাকে। গম্ভীর মুখে ব্যারিস্টার রায় দেন,—'থাক্‌, তোকে তুলতে হবে না। একটু পরে সুইপার আসবে। সেই তুলবে।'

অদ্ভুত জেদী ছেলেটা ঘাড় শক্ত করে সিঁড়ি বেয়ে তরতরিয়ে নেমে যায়।

সব কটা ফ্ল্যাটের দরজা আপাততঃ বন্ধ হয়ে যায়।

সকাল আটটা থেকে দশটা প্রফেসর নীহারবিন্দু চৌধুরি কোচিং ক্লাশ নেন নিজেরই ড্রইং রুমে। জব্বর নোট। দারুন সাজেশন। তাঁর প্রাইভেট ছাত্রদের রেজাল্ট খুবই ভাল। টিউশন ফিও সাধারণ মধ্যবিত্তের ক্ষমতার দু ধাপ ওপরে। একসঙ্গে পাঁচজন করে, সপ্তাহে দুদিন সকাল সন্ধ্যে পড়তে আসে।

আজ লিফ্‌টে উঠতে উঠতে একজন বলে,—'স্যারের আবার ফি বাড়ছে, শুনেছিস্ ?'

রোগা চেহারার ঘন কালো চোখের একটি ছেলে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করে,—'কত হচ্ছে ?'

অন্য একজন টাইট্ জিন্ পরা ছেলে বলে ওঠে,—'হি ডিজার্ভস্ ইট্। পরীক্ষার আগে কোশ্চেন জানতে গেলে দক্ষিণা তো একটু মোটা দিতেই হবে।'

লিফ্‌ট্ থেকে বেরিয়ে এসে এরাও শিউরে ওঠে,—'এঃ কি গন্ধ। কি পচলো রে বাবা।'

—'স্ক্যাণ্ডালের গন্ধ মনে হচ্ছে।' নাকের কাছে ঠোঁট উঠিয়ে বলে একজন।

প্রফেসরের কিশোরী মেয়ে শকুন্তলা তখন স্কুলে যাওয়ার জন্য বেরোচ্ছে। বাবার ছাত্রদের কথা শুনে যৌবন ছুঁই ছুঁই কিশোরী নাকে রুমাল চেপেই হেসে গড়িয়ে পড়ে।

ছাত্ররা ভ্যাব্যাচ্যাকা খেয়ে যায়। শকুন্তলা আবার একবার শরীর দুলিয়ে লিফ্‌টে ঢুকে দরজা টেনে দেয়।

এগারটা নাগাদ সুইপার আসে। দেখে শুনে ছেলেটার চেয়েও সাংঘাতিক দর হাঁকে,—'দশ রুপিয়া লাগবে।'

অনুরূপা চোখ কপালে তুলে উর্মিকে ডাকেন। উর্মি এসব দরাদরির ব্যাপারে অত্যন্ত দক্ষ। সে খরখর করে ওঠে,—'কি বলছ তুমি ? সকালে একটা ছেলে দুটাকায় তুলতে চেয়েছিল।'

উর্মির পরনে এখনও হাউসকোট। জমাদার চকচকে চোখে উর্মিকে জরিপ করে নেয়,—'নেহি বহুজি। বহুদ গন্দা কাম্। দশ রুপিয়ার কম হোবে না।'

অনুরূপা ঠোঁট টিপে জমাদারের লোভী চোখে তাকান উপভোগ করেন।

উর্মি ঝাঁঝের সঙ্গে বলে,—'নেই হোগা যাও। আমরা ওই ছেলেটাকেই ডাকব।'

এ সময় ছোট খাট চেহারার মিতালী সেনগুপ্ত মার্কেটিং করে ফেরে। নাকে কাপড় চেপে সেও ঘাড় নাড়ে,—'কত চাইছে ? দশ টাকা ? না ভাই যাও।'

জমাদার চলে যায়। এ সব হুজুগে পড়ে আজ কাজ সারতে একটু দেরীই হয়ে গেছে পারুলের। ঘরে ফেরার মুখে সে দেখে গন্ধের ঝাঁঝ আরও বেড়েছে। প্যাসেজের জানালা দিয়ে একদলা থুতু ফেলে সিঁড়ি দিয়ে সে ছুটে নেমে যায়। নামে আর গজগজ করে,—'আচ্ছা কেপ্পন সব। এদিকে এত পয়সার বড়াই। ওদিকে নোংরা পরিষ্কার করতে গরীব গুবরোকে কিছু দেবে তাতে কারুর হাত ওঠে নিকো।'

বেলা বাড়ে। গন্ধের দমকও বাড়ে সঙ্গে সঙ্গে।

দুটো বাজে। তমাল ঘরে ঢুকেই প্রথম প্রশ্ন করে,—'তোমাদের ফ্ল্যাটের সামনে এত গন্ধ কিসের?'

মিতালী ইঁদুর পচার সমস্ত বৃত্তান্ত শোনায় তমালকে। তমালের চেহারা কিছুটা উড়ু উড়ু। দুঃখী দুঃখী ভাব। চোখদুটো মায়াবী। সে বিখ্যাত এক সংবাদপত্রের সাংবাদিক ছাড়াও বাংলা সাহিত্যের একজন উঠতি কবিও বটে। কাঁধের ঝোলা থেকে তমাল রোজকার মত একটা ছোট চ্যাপটা বোতল বার করে। মিতালী ছুটে এসে হাত চেপে ধরে,—'আজ থাক্ খেয়ো না। আমার আজ সকাল থেকে ভীষণ গা গোলাচ্ছে।'

'যাঃ বাবাঃ।' তমাল অবাক চোখে তাকায়। মিতালী ওর গা ঘেঁষে বসে। সে উর্মির মত রূপসী না হলেও, লাবণ্যের ছটা তারও কম নয়। কাঁচ কলাপাতার মত চকচকে তার ঈষৎ চাপা গায়ের রঙ্। ঘন কালো চোখ। ছোট্টখাট্ট চেহারা। সব মিলিয়ে তার মধ্যে এমন কিছু আছে যা পুরুষদের টানবেই।

মিতালী তমালের কাঁধে হাত রাখে,—'বিশ্বাস করো, সকাল থেকে আমার শুধুই গা গোলাচ্ছে। উঃ কি ভীষণ পচা গন্ধ।'

তমাল মিতালীকে বুকে টেনে নেয়,—'মিতু, আমার ছোট্ট মিতু, পাগলি মিতু। গন্ধ কোথায় নেই? আমাদের গোটা সমাজটাই তো এখন পূতিগন্ধময়।'

—'তোমার কবিত্ব রাখো।' মিতু তমালের কোলে শুয়ে পড়ে,—'আজ আমার কিছু ভাল লাগছে না।'

—'ব্যারিষ্টার সাহেবের সঙ্গে আবার ঝগড়া হয়েছে নাকি? মারধোর হয়েছে আবার? না কি বেশি পিরীত চলছে? কোন্‌টা?'

—'সব সময় ইয়ার্কি ভাল লাগে না যাও।'

তমাল হাসতে থাকে,—'আশ্চর্য পৃথিবী। তোমার ব্যারিস্টার স্বামী কোর্টে দাঁড়িয়ে রোজ কত জটিল কেস জিতছেন।' একটু থেমে প্রশ্ন করে,—'আচ্ছা মিতু। তোমার স্বামী কোন জটিল বৈবাহিক কেস্ করেন নি?'

মিতালীর দু চোখের কোলে জল টলমল করে ওঠে। তমাল তার খোলা চুলে হাত বোলায়,—'তোমার স্বামী কাল একটা বিরাট হৈচৈ ফেলা কেস জিতে গেছেন শুনেছ?'

মিতালী চুপ করে থাকে।

—'বিরাট জটিল একটা রেপ কেস্। একটা ষোল বছরের স্কুল গার্লকে দু'তিনটি বড়লোক তনয় মাস্ রেপ করেছিল। মেয়েটির বাড়ির অবস্থা তেমন ভাল না। পুলিশও প্রচুর চেষ্টা করেছিল কেসটা ধামাচাপা দিতে। তবু ভদ্রলোক মানে মেয়েটির বাবা লড়েছিলেন। কিন্তু যা হয়, আই উইট্‌নেস্‌গুলোকে পর্যন্ত তোমার পতিদেবতা হোস্টাইল করে ছাড়লেন। সত্যি ক্যালিবার আছে বটে ব্যারিষ্টারের। এখন ওর দক্ষিণা কত যাচ্ছে?'

মিতালী তাচ্ছিল্যের সুরে উত্তর দেয়—'বোধহয় সিক্সটি জেম্।'

—আরও দশ বাড়বে।' তমাল গম্ভীর ভাবে রায় দেয়।

মিতালী হঠাৎ হু হু করে কেঁদে ফেলে,—

—'আমায় তুমি বাঁচাও তমাল। আমি আর পারছি না। একটা ব্যক্তিত্বহীন, ইম্পোটেন্ট্‌ লোক। ও আমায় কিছু দিতে পারে নি।'

হাসি পায় তমালের। এ ধরণের কথা এর আগে সাতচল্লিশবার শুনেছে সে। এতদিনের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগে সে মিতালীকে মোটামুটি বুঝে গেছে। একটু বেশি ছিঁচকাঁদুনে। থাক্, কাঁদুক একটু। কাঁদলে বিছানায় মেজাজটা শরিফ থাকে মেয়েটার।

হাসি চাপতে তমাল ঠোঁট কামড়ায়। আরে বাবা, যতই কাঁদ আর গালাগালি দাও, তুমি তোমার ধনী স্বামীটিকে ছেড়ে কিছুতেই বেরিয়ে আসতে পারবে না। নিউমার্কেটে ঢুকলেই আধখানা মার্কেট কিনে আনার লোভ তোমার অনেক বেশি। সব কিছুই বুঝে শুনে ঠাণ্ডা মাথায় তুমি একদিন আমায় ছেড়ে ব্যারিষ্টার সাহেবকেই বেছে নিয়েছিলে। তোমার খেয়াল মেটাবার মত ক্ষমতা তমাল বসু রায়দের মত পুরুষদের নেই, তা তুমি বেশ ভাল মতই বোঝ সুন্দরী!

কাঁদতে কাঁদতেই তমালের বুকে মিশে যেতে চায় মিতালী। তমালও সময় নষ্ট করে না। মিতালীর ছোট্ট শরীরে রোজকার জৈবিক নিয়মে ডুবে যেতে যেতে হঠাৎই আজ মিতালীকে একটু আঘাত করার ইচ্ছে হয় তমালের। বিশেষ কোন ঘনিষ্ঠ মুহূর্তে আচমকা সে বলে বসে,—'মিতু জানো, আমি না বাবা হতে চলেছি।'

মিতালী ছিটকে সরে যায়। তার আদর খাওয়া চোখে মুখে সঙ্গে সঙ্গে হিংস্র ভাব ফুটে ওঠে,—'বলো নি তো আগে?'

—'বলিনি। কারণ আগে নিজেই জানতাম না। কালই ডাক্তার কনফার্ম করেছে সুজাতা প্রেগ্‌নেণ্ট্।' তমাল যেন মিতালীর মুখের কোন ভাব পরিবর্তনকে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনতে চায় না।

মিতালী আহত সাপের মত ফোঁস ফোঁস করে,—'তুমি আমায় বিট্রে করেছ।'

তমাল ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ায়। নিজেকে গুছিয়ে নিতে নিতে তার চোখ যায়

পাশের লম্বা সো কেসের দিকে। কাচের র‍্যাকে ব্যারিস্টার সেনগুপ্তর হাসিখুশী ছবি। লম্পট, মদ্যপ, যশবান মানুষ। এই লোকটির সঙ্গে সোনাগাছিতে একদিন মুখোমুখি হয়ে গিয়েছিল তমাল। দুজনেই মুখ ঘুরিয়ে পরস্পরকে না চেনার ভান করেছিল।

তমালের হঠাৎ ভীষণ বমি পায়। বাইরের পচা গন্ধটা যেন ভেতরে ঢুকে পড়েছে। ভীষণ ঘেন্না হয় তমালের নিজের ওপর, মিতালীর ওপর, ব্যারিস্টারের ওপর, গোটা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের ওপর। ক্ষিপ্ত মিতালীকে একা রেখে, সদর খুলে পচা সেই দুর্গন্ধের ভেতর হঠাৎই বেরিয়ে আসে তমাল।

শেষ পর্যন্ত সন্ধেবেলা পারুলবালা আবার সেই ছেলেটিকে ডেকে আনে। এবার সঙ্গে তার মা আসে। মা, ছেলে দুজনেই রাস্তায় ভিক্ষে করে খায়। ফুটপাথেই থাকে। পারুল আসার আগে মোটামুটি শিখিয়ে পড়িয়ে, বুদ্ধি দিয়েই আনে তাদের। খালি গায়ে আটফাটা শাড়ি কোনরকমে জড়ান, একমাথা শনের নুড়ির মত চুল ছেলের মা পরিষ্কার জানিয়ে দেয়,—'পনের ট্যাকার কম হবে নি।'

মণিকাঞ্চন এখনও ফেরেনি। উর্মি ড্রইংরুমে একা বসে টি. ভি দেখছিল। বাইরে লোকজনের গলা শুনে সে বেরিয়ে আসে। মৃদুলা বলে,—'শুনেছেন এরা কি বলছে? বলে পনের টাকা দিতে হবে।'

উর্মি চোখ ঘোরায়,—'সে কি গো? তোমার ছেলে তো সকালে দুটাকায় সাফ্ করছিল।'

ছেলের মা রুক্ষ্ম মুখে ঘাড় দোলায়,—'ও কচি ছেলে। কি বলতি কি বলেচে। দ্যাখেন না গিয়ে কেমন ফুইল্যে উটেচে। ওকি ওই কচি ছেলে একা তুলতি পারবে? আমারেই হাত নাগাতে হবে।' তারপর একটু উদাস ভাবে বলে,—'আমাদেরও তো মাইনষের শরীল বৌদি। ঘেন্না পিত্তি আচে। দ্যাখেন সাদা পোকা এক্কেরে কিলবিল করতিচে।'

অনুরূপা ঘরের দরজা থেকে হতাশ গলায় বলেন,—'উপায় নেই মিসেস ব্যানার্জি। যা চাইছে এখন আমাদের তাই দিতে হবে। সারারাত তো আর ওটাকে ওভাবে পড়ে থাকতে দেওয়া যায় না। উনি তো ওই গন্ধের চোটে আজ অসুস্থই হয়ে পড়েছেন। সন্ধের চেম্বারে যেতে পারলেন না।'

মৃদুলা মনে মনে হাসে। ডাক্তারের শরীর খারাপের আসল কারণটা সে শুনেছে। পারুল বিকেলে কাজে এসে সব বলেছে তাকে। দুপুর তিনটে নাগাদ পাড়ার কিছু ছেলে এসেছিল ডাক্তারকে ডাকতে। এ পাড়ারই পুরোন বাড়িগুলোর একটাতে কারুর হার্ট এটাক হয়েছে।

ছেলেদের ডাক শুনে ডাক্তার নাকি প্রথমেই প্রশ্ন করেছিলেন,—'বাড়ি গেলে আমার ফিস্ কত জানেন তো?'

ব্যস্। তাতেই ছেলেরা মারমুখী হয়ে ওঠে। প্রচুর মুখ খারাপ,

গালিগালাজ। কলার ধরে প্রায় প্রায় টানতে টানতে নিয়ে যায় ডাক্তারকে। যেমন ওই সব ছেলেদের পেছনে লাগা? ওদের কখনও ঘাঁটাতে আছে? সেই তো তোকে স্‌ড়় স্‌ড়় ক'রে যেতে হল। বিনে পয়সায় নাকি রুগীও দেখে এসেছিস। সব জায়গায় দেমাক দেখালে চলে? জায়গা বুঝে দেখাতে হয়।

অনেক দরাদরির পর ছেলের মা বারো টাকাতে রাজি হয়। সে আর তার ছেলে দুজনে মিলে ভাগে ভাগে পচা ইঁদুরটার শরীর খুলে আনে গেটের ফাঁক থেকে। কাগজের মোড়কে প্যাকিয়ে প্যাকিয়ে তোলে।

সব কটা ফ্ল্যাটেরই দরজা তখন বন্ধ। শুধু ছোট্ট বুমবুম কুড়ি নম্বরের কী হোলে চোখ লাগিয়ে সবার অলক্ষ্যে একা, অবাক বিস্ময়ে সমস্ত ব্যাপারটা প্রত্যক্ষ করে যাচ্ছে।

কুকুরের ভাষা

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

প্রিয় সুবিমল, আমি এখন কিছুদিন ধরে কুকুরের ভাষা শিখছি। আমার কুকুরটার নাম আইক। আমার বড় প্রিয়। আমেরিকার ভূতপূর্ব প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারের ডাক নাম আইক, কিন্তু তার সঙ্গে এর কোনো মিল খুঁজতে যাসনি। আইক নিছক একটা শব্দ। যেমন ইস্বল, আর্জেন্টিনা, হলুদ, প্রেম, স্ট্রাইক, ঘাড়, দেবদারু, টাকা—উঁহুঃ, টাকা নয়। টাকা শব্দই না, অর্থ।

মানুষ কুকুর পোষে—তারপর কুকুরকে মানুষের ভাষা শেখাতে যায়—এটা আমার হাস্যকর লাগে। মানুষের ভাষা বলতে ইংরেজি ভাষা। অনেক হাড়হাভাতে পরিবারেও নেড়িকুত্তাকে লোকে বলে, জনি, কাম্‌ হিয়ার, ভুলো, গো, গো। পাখি পুষলে তাকে শেখানো হয়, ময়না, বলো, রাধাকৃষ্ণ রাধাকৃষ্ণ। আর কুকুর পুষলে, জনি, জনি, সিট ডাউন, সিট ডাউন, জনি।

ইংরিজি বা বাংলা যাই হোক, আমি মানুষের ভাষা মানুষের জন্য ও কুকুরের ভাষা কুকুরের জন্য আলাদা রাখতে চাই। বাঁশীর সুর কিংবা বাঁশীওয়ালার হাতের নড়াচড়া, এর কোনটাতে সাপ মুগ্ধ হয়—সে সম্পর্কে আমি এখনও মীমাংসায় আসতে পারিনি।

আইক আমার সঙ্গে সঙ্গে, কখনো পাশে কখনো সামনে ছুটে যাচ্ছে, শিকল ছাড়া, আমি নদীর ধার দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলুম। বেশ দূরে, পাকুড় গাছটার কাছে, আর একটা অপরিচিত কুকুর এক ঠ্যাং তুলে খুব ব্যস্ত—আইক ওটাকে দেখতে পায়নি। বস্তুত সেই কুকুরটার ঠ্যাং-তোলা ভঙ্গিটাই আমার কাছে আস্পর্ধা বলে মনে হয়, আমি অজান্তেই চেঁচিয়ে উঠলুম, আইক, লুঃ লুঃ লুঃ। সঙ্গে সঙ্গে আইক আমার দিকে তাকালো, আমার চোখ অনুসরণ করে দেখতে পেলো সেই কুকুরটাকে—চাপা গর-র্‌-র্‌ শব্দ তুলে আইক আবার তাকাল আমার দিকে। আমি ফের বললাম, লুঃ লুঃ লুঃ—আইক বিদ্যুতের মতন ছুটে গেল। সেই কুকুরটার সাইজ ছোট ছিল, আইক তাকে ধরতে পারলে—যদি যদি না হয়—তবে কামড়ে ছিঁড়ে একেবারে শেষ করে ফেলতো—কিন্তু সেই সাদা রঙের কুকুরটা, কোনো দৈবদৃশ্যের মতন হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে যায়।

আমি চিন্তিত হয়ে পড়ি অন্যকারণে। আমি সর্বসমেত তিন রকম মানুষের ভাষা জানি, কিন্তু তার কোনটাতেই লুঃ লুঃ লুঃ জাতীয় শব্দ নেই। আইকও কখনো এত নরম শব্দ উচ্চারণ করে না। তবু আমি ওটা বললাম কেন, এবং আইক বুঝলো কি করে? এও কি সেই বাঁশীর সুর ও বাঁশীওয়ালার হাত নাড়ার ধাঁধা? অন্যমনস্কভাবে আমি নির্জন নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে ছুড়ু ছুড়

শব্দের একটু আগে অন্য কুকুরটা যা করছিল, সেই কাজ করতে লাগলুম, আইক যেন খুব আনন্দ পেয়ে আমার চারপাশে দৌড়ে দৌড়ে ঘুরতে লাগলো।

কুকুরের সবচেয়ে দোষ এই, সব সময়ে সে পায়ে পায়ে ঘোরে, কিছুতেই সঙ্গ ছাড়ে না। অপ্রত্যাশিতভাবে তিনতলার চিলেকোঠায় শিখা এসে উপস্থিত দুপুর-বেলা, বিব্রতভাবে বললো, ও আপনি এখানে? ভেবেছিলাম মন্দিরা এখানে থাকবে,…মন্দিরা কোথায়? আমি তখন আইকের গা থেকে এঁটুলি বাছছিলাম, তাকে ছেড়ে খপ্ করে শিখার হাত চেপে ধরে বললুম, মন্দিরা নেই, কিন্তু আমি আছি। শোন—। শিখা ঈষৎ হাসি, কিছুটা ভয় ও বেশ খানিকটা অহংকারের সঙ্গে বললো, কি, কি বলছেন? হাত ছাড়ুন। আমি ওর হাত ছেড়ে দিলাম সঙ্গে সঙ্গে, প্রার্থনার ভঙ্গিতে আমার হাত জোড় করে, ওর ঠিক ভুরু সন্ধিতে স্থির দৃষ্টি রেখে, মানুষের কাতরতম কণ্ঠে বললাম, শিখা, আমি তোমাকে চিনি না, আর সময় কত কম…।

শিখা মুখখানা একটু বাঁদিকে ঘুরিয়ে গর্জন তেলের মতন দুপুরের রোদ মাখলো। তারপর সংক্ষিপ্তভাবে বললো, তাহলে আমি চললাম!

কী কথার কী উত্তর! ও যেন আমার কথা শোনেইনি, কিংবা বুঝতে চায় না। আমি তৎক্ষণাৎ হাঁটু গেড়ে দাঁড়িয়ে দু'হাতে ওর কোমর জড়িয়ে ধরে আকর্ষণ করলাম, শিখা ছটফটিয়ে উঠলো, আমি ওর খোলা পেটের ফর্সা জায়গায়, ঠিক ওর নাভিতে—আজকাল নাভির নিচেই শাড়ি পরার রেওয়াজ—আমার মুখখানা চেপে ধরলাম, এলোমেলো ব্যস্ত হাতে পোঁছুবার চেষ্টা করলাম উরুর দিকে—মোটেই বেশী সময় নেই, ছাতে বড় মাসিমা যে-কোনো মুহূর্তে বড়ি শুকোতে দিতে আসতে পারেন—তাহলে তো আর হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকলে চলে না—খোলা, স্বাধীন যে কটা মুহূর্ত পাওয়া যায়, তা নষ্ট করার কোন মানেই হয় না, শিখা নিজেকে সামলাবার কিংবা ছাড়াবার চেষ্টায় পড়ি-মরি, আর কুকুরটা—এইসময় উঠতে চাইলো আমার কোলে, ভুক-ভুক-ভুক—ঘেউ-উ-উ লম্বা ভাবে ডেকে উঠলো, আমি কোনক্রমে একটা হাত একটুক্ষণের জন্য ছাড়িয়ে আইকের মাথায় চাঁটি মেরে বললুম, এই, এখন যা, যা বলছি। আইক শুনলো না, দুটো থাবা আমার ঘাড়ে তুলে দিতে চাইলো—আইককে আমি খুন করে ফেললেও সে আমাকে কামড়াবে না জানি—কিন্তু ঐ সময়ে ওর আদেখলেপনা অসহ্য—কিন্তু তখন আমার দুটি হাতের একটিকেও সামান্য ছুটি দেবার উপায় নেই, ভীষণভাবে খুঁজছি শিখাকে, যেন শিখার শরীরের ঠিক কোন জায়গায় শিখা তা না জানলে আমার চলবেই না। ওর বুকে, কোমরে, উরুতে আমার সেই খোঁজাখুঁজির নিশ্বাস, আর তখনও সেই রকমই হাসি, কিছুটা ভয় ও বেশ খানিকটা অহংকার মেশানো গলায় শিখা বলছে, ছাড়ুন, ছাড়ুন, আপনার পায়ে পড়ি, এ-রকম জানলে…লক্ষ্মীটি, প্লিজ, আপনি

এ-রকম অসভ্য, ছোটলোক—শিখার হাত থেকে সব বইগুলো ছড়িয়ে পড়েছে, বারবার ও চোখ ফিরিয়ে দেখছে—ছাদে আর কেউ আছে কিনা কিংবা দূরের কোনো বাড়ী থেকে দেখা যাচ্ছে কিনা—সেদিকে আমিও নজর রেখেছি, কিন্তু ঘাড়ের ওপর আইক এমন ঝটাপটি লাগিয়েছে যে অসহ্য—খুশী না রাগ—কিসে যেন সে গর-র্-র্ শব্দ করে লাফাচ্ছে। শিখাকে মাটিতে শুইয়ে ওর আগুনের হল্কাময় ঠোঁট দুখানা আমার ঠোঁটে চেপে ধরে আমি অতি কষ্টে সার্কাসের খেলোয়াড়দের মতন শরীর বাঁকিয়ে আইককে একটা লাথি কষিয়ে গা থেকে ঝেড়ে ফেলেছি, ছিটকে পড়ে আইক একটু হিংস্রভাবে চেঁচিয়ে উঠলো, ঘ্যাক্। ঘেউ-উ, ঘেউ-উ, ঘেউ-উ। এত বিরক্ত লাগলো, আমিও একবার মুখ তুলে দাঁত খিঁচিয়ে বললাম, ঘ্যাক। ঘেউ-উ, ঘেউ-উ, ঘেউ-উ। সঙ্গে সঙ্গে আশ্চর্য ফল ফললো। আইক আমার দিকে কুৎকুতে চোখ মেলে লেজ গুটিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। সেই প্রথম আমি কুকুরের ভাষার ফল পেলুম। আইক ছাতে ছোটাছুটি করতে করতে হঠাৎ আবার ডেকে উঠল, ভুক, ভুক্ ভুক্। সাংকেতিক ডাক, এ ডাকের মানেও আমি বুঝলুম। সিঁড়িতে পায়ের শব্দ, দ্রুত উঠে শিখা পোষাক সামলে নিয়েছে, ক্রুদ্ধ ভ্রূভঙ্গি করে শিখা বললো, অসভ্য কোথাকার, আমার সেফটিপিনটা কোথায় গেল, দিন খুঁজে দিন।

দোহাই সুবিমল, এর থেকে তুই বার্লিন ক্রাইসিসের কোনো রূপক খুঁজতে যাস না। কেন একথা বলছি, তার একটা কারণও আছে। আজ সকালবেলা দীনবন্ধু সরকার এসেছিলেন একটা লোভনীয় প্রস্তাব নিয়ে—আমি যদি আমার বন্ধু তপনকে ধরে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে (জানিস তো আমাদের তপন মুখ্যমন্ত্রীর কী রকম যেন ভাগ্নে) ওঁকে নিয়ে যাই, বাড়িতেই—অন্য কোথাও নয়—মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ওঁর কি একটা গূঢ় প্রয়োজন আছে—যা আমাকে বললেন না—তাহলে দীনবন্ধু সরকার ওঁর ঘাটশীলার বাগান বাড়িটা আমাকে এক মাসের জন্য বিনামূল্যে ব্যবহার করতে দেবেন। প্রস্তাবটা এমন চাঁছাছোলা ভাষায় আসেনি, আধঘণ্টা আমড়াগাছির পর এই নির্যাস বেরিয়ে এলো। ঘাটশীলায় শুধু এক মাসের জন্য একটা বাগান বাড়ি পেয়ে আমি কী করবো একলা একলা? অথচ একেই তো লোভনীয় প্রস্তাব বলে, তাই না? হ্যাঁ কিংবা না কিছুই স্বীকার না করে আমি প্রস্তাবটা নিয়ে মনে মনে খেলা করতে লাগলুম। তপনকে এই অনুরোধ করা তো কিছুই না আমার পক্ষে। কিন্তু কাজের গুরুত্ব অনুযায়ী মূল্য। কি দরকার ওঁর? ঘাটশীলার বাগান বাড়িতে একমাস—খুব বেশী কি? ভাড়া লাগবে না, কিন্তু একমাস সেখানে থাকার অন্যান্য খরচ কে দেবে? এর বদলে আমার ভাইয়ের চাকরীটা—

এই সময় আইক লেজ নাড়াতে নাড়াতে ঘরে ঢুকেই দীনবন্ধু সরকারকে শুঁকতে লাগলো। দীনবন্ধু শিউরে উঠলেন, পাংশু মুখে বললেন, এটাকে

সরিয়ে নিন্‌ মশাই, আমি কুকুর একদম সহ্য করতে পারি না।
আমি অভয় হাসি দিয়ে বললুম ও কিছু করবে না। আইক খুব ভালো ছেলে, মানে, ভালো কুকুর—
—আইক? এ কি অদ্ভুত নাম। ভদ্দরলোক মরতে বসেছেন, তার নাম নিয়ে এ রকম অশ্রদ্ধা—সত্যি ব্যাড টেস্ট।
—কোন্‌ ভদ্রলোক মরে গেছেন? আমি খাঁটি বিস্ময়েই জিজ্ঞেস করেছিলাম। আমার সত্যিই খেয়াল ছিল না। এখানে কাগজ পাওয়া যায় না ঠিকমতন।
—আইসেনহাওয়ার। নামটা বদলান। এ-সব ঘরোয়া ব্যাপারে আমেরিকাকে টেনে আনবেন না।
আমি হাসতে হাসতে বললাম, নাম বদলাবো? ঠিক আছে, আপনি এই কুকুরটাকে গোলাপ ফুল বলে ডাকুন না।
আমি আইকের বকলস ধরে টেনে এনে আলতোভাবে ওর ঘাড়ে একটা চাপড় মারলাম। কুঁই, কুঁই ঘড়র ঘড়র শব্দে আইক ডাকলো। প্রথমটা আমি বুঝতে পারিনি। তারপর আইক আমার কোলের ওপর দু'পা দিয়ে দাঁড়িয়ে সোজা আমার মুখের দিকে চেয়ে ফের ঐ শব্দ করলো। এবার আমি স্পষ্ট বুঝতে পারলুম, আইক বলেছে সাবধান, সাবধান লোকটা ভালো না। লোকটা ভাল না। আমি মনে মনে বললুম, তাতো জানিই। কেই বা ভালো, তুই ভালো, আমি ভাল? অপ্রত্যাশিতভাবে আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো ঘ্যাঁক ঘ্যাঁক ঘ্যাঁক ঘ্যাঁক। আইক চকিতে ছুটে গিয়ে দীনবন্ধু সরকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। উনি লাফিয়ে উঠতে গিয়ে চেয়ার উল্টে পড়ে যেতেই—
নাঃ, বুঝলি সুবিমল, আমাকে কুকুরের ভাষা শিখতেই হবে। নইলে কুকুর পোষার কোনো মানে হয় না। ইতি তোর পরিতোষ।
প্রিয় পরিতোষ, তোর চিঠি পেলাম। শিখার সঙ্গে তুই যে ওরকম ব্যবহার করেছিস—তাতে আমি মর্মাহত হয়েছি। তোর কাছ থেকে ওরকম ব্যবহার আশাই করিনি। আমি ভেবেছিলাম, তুই 'ফেয়ার-গেম'-এ বিশ্বাসী। ঐরকম ছাদের ঘরে একা পেয়ে অতর্কিত বর্বরের মতন ব্যবহার, তুই কি পাগল হয়ে গিয়েছিস? মফঃস্বলে পড়ে আছিসই বা কেন? শিখাকে আমরা দু'জনে ভালোবেসেছিলাম—তার মানে অবশ্যই এই নয় যে শিখাকে আমরা দু'জনে সমান ভাগে ভাগ করে নেবো। কোনো মেয়ে রাজী হয় না, অন্তত প্রকাশ্যে। সুতরাং শিখাকে যে কেউ একজন চাই, তার জন্য আমি সসম্ভ্রম ধৈর্যে অপেক্ষা করেছিলাম। কিন্তু তুই খেলার নিয়ম মানিস নি। সব খেলারই একটা না একটা নিয়ম আছে, নইলে সেটা হুটোপুটি হয়ে যায়। জীবনটা হুটোপুটি নয়। অবশ্য তুই যতখানি বাড়িয়ে লিখেছিস—অতটা কিছুই হয়নি। শিখার সঙ্গে এর মধ্যে আমার একদিন দেখা হয়েছিল। ও যা বললো, তাতে বুঝলুম, তুই চিলেকোঠায় ওকে একা পেয়ে ওর হাত ধরে টেনেছিলি, ওর বুকে হাত

দেবার চেষ্টা করেছিলি—এই সময় কুকুরটা খুব চেঁচাতেই মাসীমা ছুটে আসেন। শিখা খুব আঘাত পেয়েছে। শুনে আমারও রক্ত গরম হয়ে গিয়েছিল—ভাগ্যিস সে সময় তুই সামনে ছিলি না। নিজেকে এখনও সামলাবার চেষ্টা কর। ইতি সুবিমল

সুবিমল, যাচ্চলে, এসব কি লিখেছিস্! তুই আমার চিঠিটা কিছুই বুঝতে পারিসনি, দেখছি! শিখার কথা এর মধ্যে এলো কি করে? আমি তো তোকে লিখেছিলাম কুকুরের ভাষা সম্পর্কে। শিখার ব্যাপারটা তো আর কিছুই না, একটা উদাহরণ মাত্র। শিখার বদলে যে কেউ হতে পারতো—ছাদের ঘরে নির্জন দুপুরে, জ্বলন্ত সূর্য আর অর্ধলুপ্ত চাঁদ এক আকাশে আড়াআড়ি—তখন যদি একটি মেয়ে আসে, মনে কর পাঁচ মিনিট আঠেরো হাজার বুদ্বুদ—এই সামান্য সময়ে শরীর ছাড়া আর কিছুতেই জীবন খোঁজাখুঁজি সম্ভব নয়—এমনকি কোনো সীমান্ত সমস্যাও পাঁচ মিনিটে মেটে না, তখন যদি আমি মেয়েটির—যে-কোনো মেয়েই হোক না কেন, পোষাক না খুলেও তার সমস্ত শরীরটা স্পর্শ করে বিদ্যুতের তরঙ্গ পাই, এবং সেও খেলাচ্ছলে আমাকে বাধা দেয়—এতে পৃথিবীর কারুরই কোনো ক্ষতি হয় না, একটি পালকও খসে না, মনুষ্য সমাজে একটু চিড়ও খায় না—কিন্তু দুটো শরীর টনকো হয়ে ওঠে—পঞ্চাশ দিনের ব্যর্থতা ঐ পাঁচ মিনিটে মিলিয়ে যায়—আইককে এই কথাটা আমি বোঝাতে পেরেছিলুম, কিম্বা ও আমাকে বুঝিয়েছিল—সেই বিষয়েই আশ্চর্য হয়ে তোকে লিখেছিলুম। এর মধ্যে শিখাকে অপমান করা কিংবা তোকে রাগানোর প্রশ্ন আসে কিসে?

হ্যাঁ, যা বলছিলুম কুকুরের ভাষা এর মধ্যে আমি অনেকটা শিখে গেছি। খুব শক্ত না, বুঝলি। স্বয়ং ধর্ম কুকুরের ছদ্মবেশ নিয়ে ঠিকই করেছিলেন। কুকুরের চরিত্র ধর্মের মতনই সরল। মানুষের ষড়রিপুর বদলে কুকুরের রিপু মাত্র তিনটি। কুকুরভাষায় নবরসের বদলে রসও মাত্র তিনটি। প্রত্যেক কুকুরই এক্সজিস্টেনশিয়ালিস্ট। ওরা ব্যঞ্জনবর্ণের চেয়ে স্বরবর্ণ বেশি ব্যবহার করে। কাঁধে বোঁচকাওয়ালা যে-কোনো লোককেই কুকুর ঘোরতর অপছন্দ করে। কুকুর অশরীরীদের দেখতে পায়। দেখবি, একটা কুকুর চুপচাপ বসে আছে, হঠাৎ এক ঝলক হাওয়া বয়ে গেল—আর কোনো পশু-প্রাণী ধারে কাছে নেই—তবু কুকুরটা তারস্বরে ডেকে উঠলো। এসব কথা শুনে তোর কি কিছু মনে পড়ছে? আইক এত ভালো কুকুর যে আমাকে ওর ভাষা শেখাবার বদলে আমার কাছ থেকে অতিরিক্ত কোনো প্রশ্রয় দাবি করে না। মাঝে মাঝে আমি ওকে আমার খোলা পা চাটতে দিই। তাতেই খুশী। আজ এই পর্যন্ত।—তোর পরিতোষ।

প্রিয় পরিতোষ!
ঘ্যাক ঘ্যাক ঘ্যাক। ঘ্যা ঘ্যা ঘ্যা ঘ্যা ঘ্যা। ঘেউ-উ-উ-উ, ঘেউ-উ উ। গর র্-র্-র্ ঘ্যাক্ ঘ্যাক্।
ও-ও-ও ঘাউ ঘাউ ঘাউ।
ঘা-ঘা-ঘা-ঘাউ। ঘা-ঘা-ঘা-ঘাউ। ইতি—সুবিমল

প্রিয় সুবিমল; তোর চিঠি পড়ে আমি কিছুই বুঝতে পারলুম না। বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে এরকম ভুল বোঝাবুঝি সত্যিই খুব খারাপ। তুই যে লিখেছিস, আমি তোর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছি, তার কোন মাথামুণ্ডুই আমি খুঁজে পেলাম না। প্রথমত, তোর সঙ্গে আমি কোনদিন কোন সর্ত করিনি! করে থাকলেও, সংবিধানের ১৪৭ ধারার গ উপশাখা অনুযায়ী হোয়েন এ নেশান্ অর এ সভ্রেন স্টেট—অর্থাৎ আমাদের শাস্ত্র অনুযায়ী, প্রেমে ও রণে যে শর্ত মানে, সে নির্বোধ। আমি অবশ্য এ দুটোর কোনটাতেই জড়িয়ে পড়িনি কিন্তু ঐ যে পাঁচ মিনিট সময়ের কথা বলেছিলাম, সেই মহাদুর্লভ পাঁচ মিনিটের মধ্যে নিহিত আছে এই বস্তু বিশ্বের নির্বাচিত সত্য। অর্থাৎ 'Penchance he for whom this Bell tolls may be so ill, as that he knows not it tolls for him—'আশা করি এ সব তোর জানা আছে, আমি মৃত্যুর কথা বারবার মনে করিয়ে দিতে চাই না। মনে পড়লে, তুই বুঝতে পারতি, নির্জন ছাদে ঐ একই আকাশে বিরাজমান জ্বলন্ত সূর্য ও অর্ধলুপ্ত চাঁদের দুপুরে—তুই কিংবা আমি যে হোক, শিখা কিংবা লেখা কিংবা ঝর্ণা কিংবা শান্তা—যে-হোক, ঐ পরম পাঁচমিনিটে একটা ভাষা শিক্ষা করা দরকার। আমি হঠাৎ সেই ভাষা শিখেছিলাম—শিখার গায়-টায় হাত দেওয়া অবান্তর—ও তো একটা মিডিয়াম মাত্র। আচ্ছা বাবা, আমি কথা দিচ্ছি, এখন থেকে আমি চাঁদ কিংবা সূর্যকে নিয়ে ভাষা-শিক্ষা চালাবো, আমি জানি শরীরের মধ্যে ওদেরও পাওয়া যায়। আর একটা কথা মাঝরাত্রে মানুষ যখন ভয় পায়, তখন তার সেই ভয়ের মধ্যে একটা কুকুরের ডাক মিশে থাকে। ইতি—

তোর পরিতোষ

চিঠিখানা খামে মুড়ে সুবিমলের ঠিকানা লিখে পরিতোষ বাইরে বেরিয়ে এলো। হুইশ্‌ল দিতেই আইক ছুটে এলো। সামান্য দূরে লালরঙা চিঠির বাক্স, সেখানে চিঠি ফেলে পরিতোষ এগিয়ে গেল হালকা পায়ে। বাচ্চা ঘোড়ার মতন ফুরফুরে গতিতে ছুটছে আইক।
মাঠ পেরিয়ে এলো একটা নদীর ধারে। নদীর ওপর ঝুঁকে আছে হেমন্তের সন্ধ্যা। নির্জনতারও একটা শব্দ আছে, সেই শব্দে চরাচর আচ্ছন্ন। কদমগাছ থেকে কয়েকটা কদম ফুল পেড়ে নিয়ে আইক আর পরিতোষ লোফালুফি খেলতে

লাগলো। দূরে একটি মেয়ে হাই-ল্যান্ডার-চেক রঙা ব্যাগ নিয়ে একটু ঝুঁকে ঝুঁকে হাঁটছে। পরিতোষ বিস্মিতভাবে চেঁচিয়ে উঠলো, আরে, ঐতো শিখা। মেয়েটা সঙ্গে সঙ্গে সোজা হয়ে, থেমে, একটা গাছের তলায় দাঁড়ালো। আইক আওয়াজ করলো গর-র-র, ঘাউ ঘাউ। পরিতোষ মৃদু হেসে বললো, কি করে বুঝলাম? এসো প্রমাণ দিয়ে দিচ্ছি। তখন আইক আর পরিতোষ, পরিতোষ আর আইক, দু'জনেই ছুটলো, কখনো এ আগে, কখনো ও আগে। মাথার পিছনে হাত দুটি রেখে সাঁওতালনীর ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটি। আইক ও পরিতোষ দু'জনে কাছে এসে মেয়েটির বগল ও নিতম্ব, বুক ও ঘাড় শুঁকে দেখলো। আনন্দে ঘন ঘন লেজ নাড়তে লাগলো আইক। পরিতোষ জিজ্ঞেস করলো, তুমি কোন ট্রেনে এলে? মেয়েটি নিচু হয়ে আইকের লোমশ কাঁধে হাত রেখে বললো, আইক আমাকে খুব ভালোবাসে।

পরিতোষ মেয়েটিকে আবার জিজ্ঞেস করলো, তুমি ঋণ চাও? তোমাকে আমি অর্ধেক পৃথিবী ঋণ দিতে পারি।

মেয়েটি শাড়ীটা গাছ-কোমর করে বাঁধলো। তার দৃঢ় স্তনদুটি কচি বাঁধাকপির মতন স্পষ্ট হয়ে উঠলো। সে আইকের দিকে চেয়ে জিভ ও ঠোঁটে শব্দ করলো, উস্, চু, চু, চু—। আইক ডেকে উঠলো, ঘাউ ঘাউ ঘাউ—পরিতোষ চাপা গর-র—গর-র শব্দ করতেই আইক শূন্যে লাফিয়ে উঠলো প্রবলভাবে, মাটিতে পড়েই শিখার জানুর কাছে এক পলক হুটোপুটি করে আবার লাফিয়ে উঠলো। পরিতোষ মেয়েটির টিনখোলা মাখনের মতন তক্‌তকে ঘাড়ের দিকে চেয়ে তার সবকটা চোখের পল্লব কাঁপিয়ে হাসলো। তারপর মেয়েটির হাত ধরে বললো, এসো। মেয়েটি নাচের ভঙ্গিতে দ্রুত ঘুরে যেতেই পরিতোষ স্প্যানীশ নর্তকের মতন সাবলীল ভঙ্গিতে তার কোমর ধরে হেলিয়ে নাচের আর একটি মুদ্রা দেখিয়ে বললো, আমি তোমাকে চিনি। অন্তত এই মুহূর্তে—

তারপর ওরা তিনজনে নাচতে লাগলো। সন্ধ্যেবেলার সূর্য থেকে মোটাসোটা লাল শিখা নেমে আসছে, মেয়েটির শাড়ী উড়ছে ঘাঘরার মতন, পরিতোষ আর আইক ঘুরছে তার দুপাশে, নদী থেকে উঠে আসছে আলোছায়াময় হাওয়া, গাছের প্রত্যেকটি পাতার ফাঁক দিয়ে চুঁইয়ে পড়ছে শেষ রং। ঘুরে ফেরার ডাকে ঝংকৃত হয়ে গেল নিখিল বিশ্বের আবহ তাল, এইমাত্র ওরা একটা দমকা ঘূর্ণী ধুলোর ঝড়ে ঢেকে গেল।

আলপিনের শয্যা

সুভাষ সিংহ

লিফটের খাঁচার ভেতর দাঁড়িয়ে সুদামের বুক শিরশির করে ওঠে। আর তখন কেমন নার্ভাস মনে হয় নিজেকে। মনে হয় মাঝপথে লিফট্ হঠাৎ থেমে যাবে। বেরুবার কোন পথ না পেয়ে দমবন্ধ হয়ে মারা পড়বে। অবশ্য শির-শিরানী ভাবটা বেশিক্ষণ বজায় থাকে না। কয়েক মুহূর্তের ব্যাপার—পরক্ষণেই আবার স্বাভাবিকতায় ফিরে আসে।

রাস্তায় পা দিয়ে শীতের প্রকোপ হাড়ে হাড়ে টের পায় সুদাম। জানুয়ারীর মাঝামাঝি। রাস্তায় আলো, সুবেশ নরনারীর কলহাস্য। তেলেভাজার দোকানে মৌমাছির গুঞ্জন। গরম গরম ফুলুরি, আলুর চপ…জিভে জল এসে যায়। উহুঁ, চলবে না! বুবুর কড়া হুকুম। সেই সঙ্গে ডাক্তারের সাবধান-বানী মনে পড়ে—সুদামবাবু চল্লিশের পর খাওয়া-দাওয়ায় বেপরোয়া হতে নেই। হোটেল-রেস্তোরাঁর খাবারদাবার ভুলেও মুখে দেবেন না!

খুশি মনে সুদাম গুনগুন্ করে একটা গানের সুর ভাঁজে। পুরনো দিনের জনপ্রিয় বাংলা গান। পকেটে নেট দুশো টাকা। পুরনো একটা বকেয়া টাকা মাসের মাঝামাঝি হঠাৎ হাতে পাওয়ায় সুদাম বেজায় খুশি। বুবু মাংস খেতে ভালো বাসে। আজ শীতটাও জাঁকিয়ে পড়েছে। গরম গরম মাংসের ঝোল আর ভাত…আঃ দারুন জমবে!

মিনিবাসের জন্যে লাইন পড়েছে। সুদাম একজন মহিলার পেছনে দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট ধরায়। দিনের ষষ্ঠ সিগারেট। সিগারেটের রেশনিং করে দিয়েছে বুবু। রোজ এক প্যাকেট বরাদ্দ। টিফিন এক টাকা। অফিস ছুটির পর বন্ধুদের সঙ্গে নো আড্ডা। রোজ সন্ধ্যে সাতটার মধ্যে বাড়ি ফেরা চাই।

মিনিবাস থেকে নামবার পর সুদামের দাঁতে দাঁত লেগে যায়। সমস্ত মুখে আর দু'হাতে ঠাণ্ডা লাগছে বেশি। হাফসোয়েটারে শীত মানছে না। রাস্তায় এরই মধ্যে লোক চলাচল কম। ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপতে কাঁপতে সুদাম বাজারে ঢোকে। মাংস বিক্রেতা পরিচিত। দোকানের সামনে দাঁড়ানো মাত্র নীরবে একগাল হেসে আড়াইশো মাংশ শালপাতায় নিপুন ভাবে প্যাক করে সুদামের হাতে গুঁজে দেয় দশাশই চেহারার কশাই।

প্রচণ্ড হাওয়ায় রিকশা জোরে চলতে পারে না। সুদামের মনে হল তার মুখে অনবরত আঘাত হানছে বরফের বল্লম। রাস্তার দু'পাশের দোকান অধিকংাশ বন্ধ। অথচ রাত মোটে আটটার কাছাকাছি। কাজের চাপ্ বেশি থাকার ফলে আজ সাড়ে ছ'টার আগে অফিস থেকে বেরোতে পারেনি। বুবু এতক্ষণে

নিশ্চয়ই অস্থির হয়ে উঠেছে। সুদাম অধৈর্য হয়ে রিকশা চালককে তাড়াতাড়ি চালাতে বলে।

যাক বাবা, এখনও লোডশেডিং হয়নি। রিকসার ভাড়া মিটিয়ে সুদাম তাড়াতাড়ি হাঁটে। বাড়ি পোঁছুতে দু'তিন মিনিট। কী ব্যাপার? বাড়িঅলার ষণ্ডা মার্কা ছেলেটি কাকে ধমকাচ্ছে? সুদাম রাস্তার ফ্যাকাসে আলোয় লোকটাকে দেখে চমকে ওঠে। লোকটা…লোকটাকে কোথায় যেন সে দেখেছে!

গেটের কিছুটা দূরে একটা টেলারিং শপ। ইঁটের দেয়াল—ওপরে ঢেউ তোলা টিনের আচ্ছাদন। লোকটা টিনের সেডের নিচে দাঁড়িয়ে ঠক্‌ঠক্‌ করে কাঁপছে। বুড়ো মানুষ। রোগা লিক্‌লিকে। দুটো চোখ গর্তে বসা। গায়ের হাফ শার্টটা বুকের কাছে ফালা ফালা। পরনে একটা ময়লা হাফ প্যাণ্ট। রোমশ খালি গা।

—এই শালা…ভাগ এখান থেকে! বাড়িওয়ালার যুবক ছেলে পানু খেঁকিয়ে ওঠে।

লোকটা বোবা দৃষ্টিতে ফ্যালফ্যাল করে সুদামের দিকে তাকিয়ে থাকে। ঠক্‌ঠক্‌ করে কাঁপে। লোকটার গর্তে বসা দু'চোখের দিকে এক পলক তাকিয়ে সুদাম মুখ ফিরিয়ে বলে, আহা বুড়োমানুষ…পানু, বেচারী থাক না…এই প্রচণ্ড শীতে…!

—দরদে যে একবারে উথলে উঠলেন। পানু বিশ্রী মুখভঙ্গি করে বলে, দোকান থেকে মেসিন চুরি হলে কী আপনি দাম দেবেন?

নিঃশব্দে সুদাম বাড়ির ভেতরে ঢুকে যায়।

এক তলায় দু'খানা ছোট ঘর নিয়ে সুদামরা থাকে। ঘরের বাইরে লম্বা টানা বারান্দা। অনবাকার বারান্দায় দাঁড়িয়ে সুদাম কাঁপতে কাঁপতে কড়া নাড়ে। ডান হাতে মাংসের প্যাকেট।

দরজা খুলে বুবু একপাশে সরে দাঁড়ায়।

সুদাম হাতের প্যাকেট স্ত্রীর দিকে এগিয়ে দেয়—ধর।

—মাংস! বুবু খুশি গলায় বলল, যা ঠাণ্ডা…কষা হলে জমবে ভালো… কী বল?

সুদাম স্থির চোখে বুবুর হাসি মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। বুবুর শরীরে মেদ জমেছে। দুপুরে নিয়মিত ঘুমোবার ফলে দু'চোখের পাতা ভারী। ফর্সা মুখে প্রসাধনের চড়া প্রলেপ। দু'চোখে সামান্য কাজলের আভাস।

বুবু অবাক চোখে সুদামকে কিছুক্ষণ লক্ষ্য করে ঠাট্টার সুরে বলল, কী ব্যপার …অমন করে কী দেখছো আমাকে? আজ তোমার এক ঘণ্টা লেট হয়েছে বাড়ি ফিরতে। কোথায় গিয়েছিলে?

—বুবু, ভীষণ গরম লাগছে!

সুদাম শোবার ঘরে ঢুকে পোশাক পাল্টায়। তারপর সাবান আর তোয়ালে

হাতে বাথরুমে ঢোকে। বারবার হাত ধোয় সাবান দিয়ে। কেমন যেন একটা মড়া পোড়া গন্ধ টের পায় সে। দু'চোখে ঠাণ্ডা জলের ঝাপটা মারে ঘনঘন। শরীরের সমস্ত লোমকূপ দিয়ে গলগল করে ঘাম ঝরছে।
খালি গায়ে সুদাম শোবার ঘরের মধ্যে পায়চারী করে। পাখা চালিয়ে দেয়। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ঘরের চারদিকে তাকায়। সমস্ত জানলা বন্ধ। বাইরের ঘরের দরজা বন্ধ। রান্নাঘরে বুবু মাংস চাপিয়েছে স্টোভে। শোঁ শোঁ শব্দে সে চমকে ওঠে।
সুদামের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বুবু চোখ মুখ কুঁচকে বলল, এত ঘামছো কেন··· শরীর খারাপ লাগছে বুঝি ?
বুবুর শরীর থেকে ভেসে আসা চামড়া পচা গন্ধ টের পায় সুদাম। একটা ময়াল সাপ তাকে পাকে পাকে জড়িয়ে ধরেছে। দম বন্ধ...বড় বড় নিঃশ্বাস ছেড়ে সে দূরে সরতে যায়। ঠোঁটে কালকেউটে বিষাক্ত ছোবল মারে !
—অমন ছট্‌ফট্‌ করছো কেন ? বুবু কুটিল চোখে সুদামের বিপর্যস্ত চেহারা চেহারা লক্ষ্য করতে করতে প্রশ্ন করল, আজ আবার ছাইভস্ম গিলে এসেছো ?
—টের পাচ্ছি না। কি হল···এমন নেতিয়ে পড়লে কেন ?
সুদামের মুখ কাছে টেনে বুবু গন্ধ শোঁকে।
সুদাম বিড়বিড় করে কি যেন বলে। হাসিখুশি মানুষটার হঠাৎ এমন অস্থিরতা কেন ? ডাক্তার ডেকে আনবে কী ?
মাংসের গন্ধে বুবুর জিভে জল এসে যায়। সে একরকম ছুটে যায় রান্নাঘরের দিকে।
সুদাম পা টিপেটিপে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল। বুবু তখন মাংস রান্নায় ব্যস্ত। বাইরের ঘরের দরজা খুলে অন্ধকার বারান্দায় কিছুক্ষণ দাঁড়ায় সুদাম। ফুলের বাগান থেকে ভেসে এলো মড়া পোড়ার গন্ধ ! সুদাম এগিয়ে যায়। পায়ের নিচে শিশিরে ভেজা ঘাস। সদর দরজা বন্ধ। প্রকাণ্ড একটা তালা ঝুলছে।
বন্ধ দরজার কাছে সুদাম চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। চারপাশে চাপা চাপা আবছায়া অন্ধকার সে টের পায় তার পিছনে একটা অস্পষ্ট শব্দ। সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে সুদামের। দূরে একটা আমগাছের মগডালে পাখির ডানা ঝাপটানোর শব্দে সে চমকে ওঠে। পিঠে হিমশীতল স্পর্শে সে অস্ফুট চিৎকারে ঘুরে দাঁড়ায়।
—এখানে দাঁড়িয়ে কী করছো ? বুবু চাপা গলায় বলল, এই ঠাণ্ডায় খালি পা খালি গা···এখুনি আমি পানুকে পাঠাচ্ছি ডাক্তার ডাকতে। ঘরে চল।
সুদামকে একরকম জোর করে টানতে টানতে বারান্দায় নিয়ে এলো বুবু।

ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলল, তোমাকে আমি চিনতে পারছি না! ওগো, তোমার পায়ে পড়ি…বল, তোমার কী হয়েছে? তোমার কীসের দুঃখ?
তারপর আর্ত চিৎকারে পানুর নাম ধরে ডাকতে থাকে বুবু।
কিছুক্ষণের মধ্যেই বারান্দায় লোক জড়ো হয়।
বাড়িঅলা ঘুম চোখে দোতলা থেকে নিচে নেমে আসেন।
—এত রাতে চেঁচামেচি কীসের…বৌমা, কী হয়েছে?
বুবু লোকজন দেখে সুদামকে ছেড়ে সামান্য দূরে দাঁড়িয়ে কান্নাবিকৃত গলায় বলে, পানু, তোমার সুদামদা পাগল হয়ে গেছেন! অফিস থেকে ফিরে কেবল মাথায় জল ঢালছেন—আর বলছেন, ফুলের বাগানে চামড়ার পচা গন্ধ! আরও বলছেন—একটা বুড়ো লোক গায়ের জামা ফালা ফালা, ঠাণ্ডায় ঠক্‌ঠক্‌ করে কাঁপছে। মাথা মুণ্ডু কি যে বলছেন…পানু, তুমি ভাই তাড়াতাড়ি ডাক্তার নিয়ে এসো!
দু'চোখ কচলে বাড়িঅলা ধমকের সুরে বলেন, এত রাত্রে আর জ্বালিও না বৌমা! পানু, হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছিস কেন…শুতে যা।
বুবুর কাজল-মাখাকালো দু'চোখের দিকে আড়চোখে একবার তাকিয়ে পানু অতিকষ্টে দীর্ঘশ্বাস চেপে মুখ ফিরিয়ে নেয়। বাবা আর একবার তাড়া দিতেই সে গম্ভীর মুখে বাবার পিছন পিছন সিঁড়ির দিকে অগ্রসর হয়।
সুদামকে এক রকম টানা-হেঁচড়া করে শোবার ঘরে নিয়ে এল বুবু।
বুবুর চোখমুখ কান্নায় ফোলা। সে বিষণ্ণ দৃষ্টিতে সুদামের প্রতিটি ভাবভঙ্গি লক্ষ্য করতে থাকে। হঠাৎ সুদামের মাথাটা এমন বিগড়ে গেল কেন? একটা মানুষের সঙ্গে পনেরো বছর একসঙ্গে থাকার পর তার অনেক কিছু অনাবিষ্কৃত থেকে যায়। সুদামের কীসের দুঃখ? সন্তান না হওয়ার জন্যে? আমার চেয়ে বেশী? বুবু আপন মনে মাথা নাড়ে। উঁহু, সুদামের মনের নাগাল সে কোনদিনই পাবে না। এই রহস্যময় মানুষটাকে আদৌ সে চেনে না!
মাংসের বাটির দিকে তাকিয়ে সুদাম আঁতকে ওঠে। ঝোলের মধ্যে থলবল করে লাফাচ্ছে একটা ব্যাঙ। ব্যাঙটা হঠাৎ নরমুণ্ডু হয়ে যায়। মুখে খোঁচা খোঁচা পাকা দাড়ি, দু'চোখে গর্তে বসা। হাত গুটিয়ে সুদাম উঠে পড়ল। তার দু'চোখে দৃষ্টি অস্বাভাবিক হয়ে ওঠে।
—কী হল? বুবু ধমকের সুরে বলল, তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও… জ্বালিয়ো না আমাকে…আমি আর পারছি না!
দু'হাতে মুখ চেপে সুদাম ছুটে যায় বাথরুমের দিকে। গলগল করে বমি করে। মাথায় আগুন জ্বলে। দু'হাত দিয়ে মাথা চেপে বসে থাকে অনেকক্ষণ। বড় দুর্বল মনে হয় নিজেকে। কী বিশ্রী টক গন্ধ! চোখ মুখে ঠাণ্ডা জলের ঝাপটা মারে ঘনঘন।
…ভিড়ের বাসে কোন রকমে হ্যাণ্ডেল ধরে ঝুলছে সুদাম। ঘামে ভেজা হাত

থরথর করে কাঁপছে। সুদামের কোমর বাঁ হাত দিয়ে আঁকড়ে পিছনে দাঁড়িয়েছিল একটা বুড়ো লোক—মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, দু'চোখ গর্তে বসা, হাড় জিরজিরে চেহারা। ক্রমশঃ শ্বাস-প্রশ্বাস ভারী হয়ে এলো সুদামের। সে বুঝতে পারছিলো, বুড়ো লোকটাকে সরাতে না পারলে যে-কোন মুহূর্তে দ্রুত চলন্ত বাস থেকে পড়ে যাবে। মৃত্যু অনিবার্য ভেবে সুদাম আত্মরক্ষার তাগিদে লোকটার বাঁ হাত খুব জোরে মুচড়ে দেয়। একটা আর্ত চিৎকার শোনা যায়। কয়েকজন যাত্রী হৈ হৈ করে ওঠে। তারা বাস থামাবার জন্যে পীড়াপীড়ি করে। কণ্ডাক্টারকে শাসায়। কিন্তু বাস থামে না। ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে যায়। কয়েকটা স্টপেজ পেরিয়ে সুদাম নেমে পড়ে।…

ঘরে নীল হালকা আলো জ্বলছে। অস্ফুট চিৎকারে সুদাম বিছানার ওপর উঠে বসল। সে টের পায় তার সমস্ত শরীর ঘামে ভেজা। বিছানার একধারে বুবু লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে। সুদামের মনে পড়ল। বাথরুমে অনেকক্ষণ বমি করার পর তার সমস্ত শরীর অবসন্ন হয়ে উঠেছিল। কি ভাবে সে বিছানায় এসে শুয়ে পড়েছে – মনে পড়ছে না।

গায়ের জামা খুলে সুদাম মশারি তুলে বাইরে এলো। আলো জেলে বুবুর নাম ধরে কয়েকবার ডাকল। বুবুর জেগে ওঠার কোন লক্ষণ নেই দেখে সে পায়ে পায়ে এগিয়ে যায়। ঘরের কোনে জলের কুঁজো। এক গ্লাস জল এক নিঃশ্বাসে পান করে সুদাম ফিরে এলো বিছানার কাছে। আবার বুবুর নাম ধরে কয়েক বার ডাকল। কোন সাড়াশব্দ না পেয়ে সে মশারি তুলে বিছানায় শুয়ে পড়ল। ঘরে জ্বলতে থাকে একই সঙ্গে সাদা আর নীল আলো। সুদাম ঘুমোবার আপ্রাণ চেষ্টায় বার বার এপাশ ওপাশ করতে করতে…হঠাৎ সে চমকে ওঠে করাঘাতের শব্দে। তার শরীরের সমস্ত রোমকূপ খাড়া হয়ে ওঠে। কোথায় করাঘাতের শব্দ? জানলায়? শোবার ঘরের দরজায়? শব্দ ক্রমশঃ বাড়তে বাড়তে…দু'হাতে কান চেপে সুদাম লেপের তলায় ঢুকে যায়। শব্দ ঢুকে যায় তার মস্তিকে। লেপের তলায় দম বন্ধ হয়ে আসা সুদামের মনে হল—অজস্র আলপিনের খোঁচায় তার সর্বাঙ্গ রক্তাক্ত, ক্ষতবিক্ষত।

স্মৃতি অশরীরী

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

ব্যাপারটা নিছক স্বপ্ন হতেও পারে—কিংবা সত্যিসত্যি ঘটেছিল, নাকি মনে-মনে বানিয়ে মনে-মনেই বিশ্বাস করে বসে আছি, আমার পক্ষে এখন বলা বেশ কঠিন। শুধু জানি, স্বপ্নে হোক বা বাস্তবে হোক, এটা ঘটেছিল।

তখন আমার বয়স বড় জোর দশবছর। সে আমলের রেওয়াজ মতো প্রাথমিক বৃত্তিপরীক্ষা দিতে গেছি গ্রাম থেকে মহকুমা শহরে। এখনকার বিচারে ওটা শহর-টহর ছিল না নিতান্ত ইলেকট্রিফায়েড গ্রামনগরী। শহরের আনাচে কানাচে বনজঙ্গল ছোঁক ছোঁক করত। শেয়াল ডাকত বাঘও হামলা করত কদাচিৎ। শহরের বেশির ভাগ লোকই খালি গায়ে ঘোরাফেরা করত। মাঝে মাঝে অবশ্য জমিদার কিংবা ইংরেজ কর্মচারী ফোর্ড হাঁকিয়ে হর্ন বাজিয়ে ভিড় হটাতে-হটাতে যাতায়াত করত। সেগুলো নিশ্চয় বড় হাস্যকর দৃশ্য ছিল। জনসাধারণকে তাক লাগাতে তাদের গোঁফগুলোয় কী পরিমাণ মোমের পালিশ দেওয়া হত, তা আঁচ করা যায়।

পরীক্ষার শেষ দিন ছিল অংক। মৌখিক এবং লিখিত। মৌখিক হয়ে গেছে। স্কুলবাড়ির বড় মাঠের ধারে শিরীষতলায় বসে অংকের বই খুলেছি, হঠাৎ আমার সমবয়সী একটি ফ্রকপরা ফুটফুটে মেয়ে এসে বলল—রাজু তুই এখানে কী করছিস রে? এদিকে তোকে খুঁজতে খুঁজতে আমার পা ব্যথা। আয়, দাদু তোকে ডাকছে।

অবাক হয়ে বললুম—কে রাজু। আমি রাজু না।

মেয়েটি সে কথা গ্রাহ্যই করল না। আমার দিকে ঝুঁকে এসে অংকের বইটা ছুঁড়ে ফেলে দিল। তারপর আমার চুল খামচে ধরে বলল—খুব তো ইয়ে হয়েছিল। তোর কারিকুরি ভাঙছি চল। সারাদিন কেবল পালিয়ে-পালিয়ে বেড়ানো। আয় বলছি।

আমি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়েছিলুম। নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করে বললুম—আঃ! কাকে কী বলছ? তোমার চোখ নেই? দেখতে পাচ্ছ না? আমি রাজু নই, মুকুল। বৃত্তি পরীক্ষা দিতে এসেছি।

মেয়েটি খিলখিল করে হেসে উঠল। আমার চুল ছেড়ে দিয়ে বলল—কী চালাক হয়েছিস রে তুই! বৃত্তি পরীক্ষা না হাতি? থাম, বলছি গিয়ে দাদুকে—রাজু এল না।

রাগে কোন কথা না বলে অংকের বইটা কুড়িয়ে নিলুম। তারপর দেখলুম, মেয়েটি ভাঙা পাঁচিল গলিয়ে চলে গেল। এদিকটা নির্জন। একটু দূরে স্কুলের সামনে অজস্র ছেলেমেয়ের ভিড়। এক্ষুনি ঘণ্টা পড়বে। সেদিকে

এগিয়ে গেলুম। কিন্তু ব্যাপারটা ভারি অদ্ভুত লাগল। মেয়েটি আমাকে ভুল করে রাজু ভেবে বসল কেন? বোঝা গেছে, রাজু নামে কোন ছেলে ওর ভাই-টাই হবে। কাজেই এমন ভুল হওয়া তো একেবারে অসম্ভব।

মনের ওই গোলমাল নিয়ে পরীক্ষাটা মোটেই ভাল হল না। সময়টা ছিল মার্চের শেষ। বিকেল পাঁচটায় পরীক্ষার হল থেকে বেরিয়ে সোজা সেই শিরীষতলায় চলে গেলুম। ছোটমামা আমার ক্ষুদে গার্জেন। তাঁর সঙ্গে এসেছি। তাঁর চোখ এড়িয়েই যেতে হল।

এই যাওয়ার মানে একটাই, মেয়েটির সঙ্গে দেখা হওয়া। দেখা হলে জেনে নেব, কেন সে আমাকে রাজু বলে ভুল করল।

বিকেলের গোলাপী রোদ্দুর আস্তে আস্তে মুছে যাচ্ছিল। ফুলন্ত কৃষ্ণচূড়া আর শিমুলের মাথা পেরিয়ে একঝাঁক পাখি চেঁচাতে চেঁচাতে খালের ওপারে জঙ্গলের দিকে চলে গেল। স্কুলবাড়ি ফাঁকা হয়ে গেল। মাঠের ঘাসের ওপর হাল্কা ছায়ার কমল পাতা হল, যেন কেউ রাতে টানা ঘুম দেবার আয়োজন করছে। ছোটমামার কথা ভুলে গিয়ে শুধু সেই হলুদ ছিটের ফ্রক পরা মেয়েটির প্রতীক্ষা করছি তো করছি।

অথচ এই প্রতীক্ষাটা যে নিতান্ত বোকামি, তা টের পাচ্ছি না। আমার স্বভাবে খুব ছেলেবেলা থেকেই এক অন্ধ জেদ ছিল।

কিন্তু ওখানেই সে আবার কেন আসবে, তা ভেবে দেখছি না। শুধু মনে হচ্ছে, সে আসবে। এলে তাকে খুব রেগে ধমক দিয়ে বলব—তখন আমার চুল টেনে বড্ড অপমান করেছ। আমার মাথাটা এখনও ব্যথা করছে।

শীতের শেষে এইসব গাছপালা থেকে পাতা ঝরে পড়েছিল, তখনও তলায় জমে রয়েছে। ওপরে চিকন কচি পাতার গালে সন্ধ্যা এসে মায়ের মতো চুমু খাচ্ছে। হঠাৎ শুকনো পাতায় একটা চাপা শব্দ হল। চমকে উঠে দেখি, আশ্চর্য, এই মোটা গাছটার ওপাশে পাঁচিলের দিকে ঘুরে মেয়েটি সম্ভবত অনেকক্ষণ থেকে দাঁড়িয়ে আছে। এইমাত্র একটু নড়ে দাঁড়াতেই শব্দটা উঠল। এবং আরও আশ্চর্য, সে নিঃশব্দে যেন কাঁদছে—ওপাশে ঘুরে আছে বলে শুধু তার কনুইটা বাঁকা হয়ে আছে অর্থাৎ চোখ কচলাচ্ছে, সেটুকু স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।

একটু ইতস্তত করে সোজা চলে গেলুম ওর কাছে। ও গ্রাহ্যই করল না। বললুম—কী হল? কান্নাকাটি করছ কেন?

মুখ ভেংচে মাথা নাড়া দিয়ে ও বলে উঠল—বেশ করছি তোর তাতে কী? তুই আবার জ্বালাতে এলি কেন?

—তুমি যে তখন চুল খামচে দিলে! এবার আমি যদি…

—ইস্! আয় না, দেখি।

বলা যায় না, যা স্বভাব—ফের হামলা করবে ভেবে গম্ভীর হয়ে বললুম—আচ্ছা

শোন। তুমি আমাকে রাজু ভাবলে কেন? রাজু কে?

সন্ধ্যার ধূসরতা গাছতলায় খানিকটা ঘন হয়েছে। আমার কথা শুনেই মেয়েটি যেন চমকে উঠে আমার দিকে তাকাল। ওর রুক্ষ চুলের ঝালরের মধ্যে জ্বলজ্বলে দুটো চোখ দেখতে পেলুম। বেশ কিছুক্ষণ ওভাবে ওকে তাকিয়ে থাকতে দেখে বললুম—কী? এবার বিশ্বাস হচ্ছে তো? আমি তোমাদের রাজু নই। আমার নাম মুকুল।

ওর ঠোঁটদুটো কাঁপতে থাকল। ভুরু কুঁচকে গিয়েছিল—সেই কুঞ্চন মুছে গেল তারপর হঠাৎ দুহাতে মুখ ঢেকে হু হু করে কেঁদে উঠল আবার। কান্নার মধ্যে ওর বারবার 'না না না' শুনতে পাচ্ছিলুম। তারপর বিকেলের মতোই সে আচমকা দৌড়ে সেই ভাঙা পাঁচিল গলিয়ে চলে গেল।

আমার অন্ধ জেদ বুনো ঘোড়ার মতো লাফ দিল। আমি ওকে অনুসরণ করলুম। ভেবেছিলুম পাঁচিলের ওপাশে রাস্তা পড়বে। কিন্তু তার বদলে জঙ্গলে একটা জায়গায় পড়লুম। মনে হল এটা একটা বাগান। অন্ধকার গাঢ় হয়েছে সেখানে। আবছা ওর ছুটে চলা চোখে পড়েছে। মরীয়া হয়ে দৌড়াচ্ছি। ওকে ধরা চাই-ই, এমন একটা ঝোঁক চেপে গেছে মাথায়।...

এখন ভাবলে সব টের পাই। কেন আমি ছুটে গিয়েছিলুম—কেনই বা অমন অন্ধ জেদ জেগেছিল। টের পাওয়া মাত্র গা শিউরে ওঠে। তবে সে কথা পরে।...

বাগানের ওধারে একটা আলো দেখা যাচ্ছিল। খানিকটা এগিয়ে দেখি, আলোটা একটা জানলা থেকে বেরচ্ছে। মেয়েটি আলোর দিকে যাচ্ছে না। বাঁদিকে দৌড়ে গিয়ে অন্ধকারে মিশে গেল। আমি সেখানে পৌঁছে দেখি, একটা দালান বাড়ি—দুর্গের মতো উঁচু। মনে পড়ল, এখানেই একটা রাজবাড়ির ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। এবং মনে পড়া মাত্র খুব ভয় পেয়ে গেলুম—নিছক ভূতের ভয়। তখন ডানদিকে আলোটার দিকে এগোলুম।

ঠিক এইসময় কোথায় যেন সেই মেয়েটির কণ্ঠস্বর শোনা গেল—রাজু! রাজু! রাজু!

কী করব ভাবছি, আমার গায়ে টর্চের আলো পড়ল। কে ভারিক্কি স্বরে বলে উঠল—কে ওখানে?

ভয়ে ভয়ে বললুম—আমি। আমি মুকুল। বনকাপাশিতে থাকি।

টর্চটা এগিয়ে এলে দেখি, গাড়ু হাতে এক বুড়ো। সে বলল—এখানে কী করছ খোকা? কাদের বাড়ি এসেছ তুমি?

—বৃত্তিপরীক্ষা দিতে এসেছি।

বুড়ো হো হো করে হেসে উঠল।—বৃত্তিপরীক্ষা দিচ্ছ এই সন্ধেবেলা ভূতের আড্ডায়? নিশ্চয় পথ ভুল করেছ। কোথায় উঠেছ তুমি?

—ছোট মামার হোস্টেলে।

—সে তো খালের ওপারে। চলো, তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।—

সে রাতে ঘুমটা ভাল হল না। নানারকম ভয় এবং ভালবাসার স্বপ্ন। হ্যাঁ—ভালবাসার ছাড়া কী বলব? ওই বয়সে যেরকম ভালবাসা জাগে, তাই নিয়ে অনেক সব ছেলেমেয়ের সঙ্গে কোথায় যেন যাচ্ছি। সেই মেয়েটিকে খুঁজছি—পাচ্ছিনা। অথচ ওর ডাক শুনতে পাচ্ছি রাজু! রাজু! রাজু!

ঘুম ভেঙে দুঃখে আমার ছোট হৃদয় ভেঙে যাচ্ছে। মনে মনে বলছি—কেন আমি রাজু হয়ে জন্মাইনি পৃথিবীতে!

ছোট মামা আমার স্বপ্নের ব্যাপারটা টের পেয়ে ঘুমজড়ানো গলায় খুব ধমক দিচ্ছিলেন—তেলেভাজা খেয়ে পেট খারাপ হলেই ভূতের স্বপ্ন দেখে। খবরদার, আর ওসব খাবিনে।...

পরদিন সকালে গ্রামে ফিরে যাবার কথা। কিন্তু গেলুম না। ছোট মামাকে বললুম—ওবেলা যাব মামা। এবেলা একটু বেড়াব।

—কিন্তু সাবধান! পথ হারাসনে। আমি খুঁজতে যেতে পারব না বলে দিচ্ছি।

ছোট মামার কলেজের পরীক্ষা সামনের সপ্তাহে শুরু হবে। তাই পড়াশুনো নিয়ে ব্যস্ত। আমি সকালেই বেরিয়ে পড়লুম।

প্রথমে সেই স্কুলবাড়িতে গেলুম। আজ একেবারে ফাঁকা সব। শিরীষ তলায় কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে পাঁচিল গলিয়ে বাগানে ঢুকলাম তারপর ঘুরতে ঘুরতে রাজবাড়ির কাছে গিয়ে পড়লুম। দিনের আলোয় জায়গাটা দেখে বোঝা গেল, কাল সন্ধ্যায় এমন জায়গায় আসাটা এক অসমসাহসিক কীর্তি'র ব্যাপার হয়েছে। কোথাও কোথাও ভাঙ্গা দেয়াল থেকে কড়িকাঠ ঝুলছে। ইটের স্তূপের ওপর আগাছার জঙ্গল গজিয়েছে। হলুদ আর শুকনো পাতার স্তূপ সরিয়ে কয়েকটা ছাতার পাখি পোকা বের করে খাচ্ছে। তারপর আমার চোখ গেল মন্দিরের পেছনে। খুশিতে মন নেচে উঠল। সেই মেয়েটি একই ফ্রক পরে পা ঝুলিয়ে বসে রয়েছে। আমার পায়ের শব্দে ঘুরেই হেসে উঠল।

ঠিক এইসময় উঠোনে খড়মের আওয়াজ হল। ঘুরে দেখি, লাল ধুতি আর ফতুয়া গায়ে একটা সন্নেসী গোছের লোক ঢুকছে। তার একহাতে একগোছা শুকনো লকড়ি। অন্যহাতে একটা থলে। থলের মধ্যে তেলের শিশি উঁকি মারছে। তার চুল দাড়ি পেকে ভুট হয়েছে। আমাকে দেখে সেও থমকে দাঁড়াল। তারপর চোখ পিট পিট করে চেনার চেষ্টা করল যেন। তুমি কে খোকা? কোথায় থাকো?

—আমি মুকুল। বনকাপাশিতে থাকি। এসেছি বৃত্তিপরীক্ষা দিতে।

—মানত করতে এসেছ বুঝি? বেশ, বেশ।...সন্নেসী লোকটা হাসতে থাকল। মন্দিরের বারান্দায় উঠে জিনিসগুলো রেখে তারপর বলল—কত মানত করবে?

এখানে এস। বাজারে কী আছে? কত ছাত্র এসে মানত করে যায়। এস—কাছে এস।

মন্দিরের পিছনে, আশ্চর্য, মেয়েটি আর নেই। ওদিকে তাকাচ্ছি দেখে লোকটা বলল—ওখানে কী দেখছ খোকা? সাপটাপ নাকি? ভয় নেই। বাবার পোষা জীব।

আমি আস্তে বলল্ম—সাপ না। একটা মেয়ে।

সন্ন্যাসী লোকটা চমকে উঠে বলল—মেয়ে? কেমন মেয়ে?

—হলদে ছিটের ফ্রক পরা। ফর্সা রঙ। এক্ষুনি তো বসে ছিল।

সে হঠাৎ বিকট চেঁচিয়ে বলে উঠল—যাঃ! যাঃ! দূর! দূর!··· তারপর একটা লকড়ি নিয়ে সেদিকে দৌড়ে গেল। ফের গর্জন করে বলল—ফের যদি আসবি, মুণ্ডু চিবিয়ে খাব হারামজাদি, খবর্দার!

আচমকা ওর ওই বিকট মূর্তি আর লম্ফঝম্প দেখে মনে হল, লোকটা ভাল নয়। সে ফের গর্জন করে উঠলে আমি ভয় পেয়ে পালিয়ে এল্ম।···

তিরিশ বছর পরে সেই শহরে গেছি ব্লক অফিসার হয়ে। সেই অদ্ভুত মেয়েটির কথা ভুলতে পারি নি। এতদিনে এখানে এসে স্মৃতিটা জোর নাড়া দিল। অনেক স্থানীয় ভদ্রলোককে জিগ্যেস করেও ওর হদিস করা গেল না। শুধু এটুকু জানা গেল, রাজবাড়ির শিবমন্দিরে এক সেবায়েত থাকতেন। তাঁর মৃত্যু হয়েছে অনেক বছর আগে। একজন—শিবু ভট্চায্যির কথা বলছেন স্যার? তান্ত্রিক সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন। মন্দিরের পেছনে একটা কুঁড়ে বানিয়ে থাকতেন। তাঁর একটা নাতি আর নাতনী ছিল। নাম এ্যাদ্দিন বাদে আর মনে নেই। এটুকু মনে আছে, ভাইবোনে কোন গাছে পাখির ছানা পাড়তে উঠে প্রচণ্ড আছাড় খেয়ে ছিল। ফুসফুস ফেটে মারা যায়।

ভুতপ্রেতে আমার বিশ্বাস নেই। কিন্তু যা ঘটেছিল, তার ব্যাখ্যা কী? কিছু-দিন পরে আমার কোয়ার্টারে রান্নার কাজ করার জন্য এক প্রৌঢ়া এল। তার নাম জ্ঞানদা বামনী। সে কাজ করতে করতে হঠাৎ থেমে আমার বড় ছেলে পিণ্টুর দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে থাকত। আমার স্ত্রী জিগ্যেস করলে জ্ঞানদা দীর্ঘশ্বাস ফেলত শুধু। কিছু বলত না। একদিন তাকে আমিই প্রশ্ন করে বসলাম। জ্ঞানদা ম্লান হেসে বললে—আমাদের রাজু ঠিক এমনি ছিল দেখতে। অবিকল। তাই দেখি, বাবা।

—কে ছিল রাজু?

—আমার দাদার ছেলে। দাদা আর বউদি কলেরায় মারা গিয়েছিল। আমি তখন বহরমপুরে থাকি। ছেলেমেয়ে দুটোকে কাছে এনে রাখতে চাইলুম, বাবা দিলেন না। সাধু সন্নেসী লোক ছিলেন। ওখানে ভাঙা মন্দিরটা দেখেছেন তো বাবা? ওখানেই উনি থাকতেন। রাজু আর সাজু—ভাল নাম ছিল রাজেন্দ্র আর সন্ধ্যা—বড় দুষ্টু ছিল। ভাইবোনে ইস্কুল বাড়ির গাছে···উঠেছিল

খেলা করতে। পড়ে গিয়ে···

সেই পুরনো অন্ধ জেদ আমাকে পেয়ে বসল। তক্ষুনি হনহন করে ব্লক প্রাঙ্গণ পেরিয়ে খাল পেরিয়ে পোড়ো রাজবাড়ির দিকে চললুম—নিশি পাওয়া মানুষের মতো।

স্কুল বাড়ির চেহারা বদলেছে। সেই শিরীষটা আর নেই। ধ্বংসাবশেষের মধ্যে মন্দিরটা খুঁজে পেলুম একসময়। নির্জন বনভূমিতে দুপুরবেলায় শান্তিময় স্তব্ধতা। কিছু পাখির ডাক। বাতাসের হঠাৎ দু'একটা আলোড়ন। আমার হৃদয়ের সেই পুরানো ক্ষতটা টনটন করে উঠল। মনেমনে বারবার মিনতি করলুম—সন্ধ্যা! ছোট মেয়ে সন্ধ্যা! ছোট মেয়ে সন্ধ্যা! একবার দেখা দাও—শুধু একটি বার।

ফিসফিস করে উঠল কেউ কোথায় কোন গাছের আড়ালে—রাজু! রাজু! রাজু!

চেঁচিয়ে বলতে যাচ্ছিলুম—সন্ধ্যা! আমি এসেছি! কিন্তু এখন আমার বয়স চল্লিশ। আমি রাশভারি ব্লক অফিসার। চুপ করে গেলুম। ফিসফিস ডাকটা আমার চারপাশে ঘুরতে থাকল। তিরিশ বছরকে আগের এক বালিকার বিষন্ন কণ্ঠস্বর হয়ে তিরিশ বছর আগের এক বালককে ছুঁল।

প্লট

হিমানীশ গোস্বামী

রবীন বাবু গল্প লেখেন, লেখেন ঠিক বলা যায় না, লিখতেন বলাই ভাল। রবীন মহাহালদারের নাম আজকাল তেমন কেউ শোনেন না। কোনো বড় কাগজেই তাঁর নাম আর দেখা যায় না। তারা পঁচাত্তর বছরের পুরনো সাহিত্যিকের লেখা গল্প ছাপতে চায় না। বোধ হয় নতুনরাও আজকাল তার লেখা পড়তে চায় না। তবু, একেবারেই তাঁর লেখা গল্প কেউ ছাপেনা তাও ঠিক নয়। বর্ধমানের একটি কাগজ, কেবল পুজোর সময় তার প্রকাশ— প্রতিবছর তাঁর কাছে একটি চিঠি লেখে, আর তিনিও তাঁর সযত্ন লেখা একটি গল্প পাঠিয়ে দেন বৃদ্ধ সম্পাদকের কাছে। এই রকম প্রতি বছর তাঁকে অন্তত গোটা ছয়েক গল্প লিখতে হয়। অথচ এককালে রবীন মহাহালদারের লেখার ছিল কত সম্মান, কত জনপ্রিয়তা। ত্রিশ বছর আগেকার সে সব দিনের কথা এখনও তার মনে পড়ে। তিনখানা বইও তাঁর বেরিয়েছিল। দুখানার আবার একাধিক সংস্করণও হয়েছিল। সে সব বইএর কপিও আর তাঁর কাছে নেই। কেউ দেখতে চায় কেউ দেখতে চায়না। তবে তিনি জানেন, ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে তাঁর বই রয়েছে। দু একবার গিয়ে তিনি নিজেই নিজের বই পড়ে এসেছেন। একজনকে পয়সা দিয়ে কপিও করিয়েছিলেন তাঁর নিজের বই। হাতের লেখায় সেই বইগুলি তাঁর কাছে রয়েছে—কিন্তু পড়বার লোকই নেই। তিনি নিজেও সেগুলি আর পড়বেন না।

এ বছরও তাঁর কাছে বর্ধমানের চিঠি এসেছে। এবারে একটিই চিঠি এল। মালদহ এবং কৃষ্ণনগরের দুখানি চিঠি তিনি আশা করছিলেন, কিন্তু এলনা। কাগজই বোধ হয় উঠে গিয়েছে। কত দিনকার সব কাগজ!

কিন্তু প্লটই পাননা। লিখতে বসে তাঁর সব গোলমাল হয়ে যায়। স্ত্রী মনোরমা মারা গেছেন সাত বছর হল—পুত্র একটিই ছিল, সে বিদেশেই থাকে। ক্যানাডায় ভালই আছে। বছর চারেক আগে একবার এসেছিল। সে নিয়ম মত একশো ডলার পাঠিয়ে যাচ্ছে প্রতি মাসে। ঐ একমাত্র বন্ধন তাঁর। আর সবাই ছিন্ন।

প্লট আর নেই। শুকিয়ে গেছে কি সব? আগে কত সহজে সব প্লট এসে যেত। কয়েকদিন এবং রাত্রি রবীনবাবু ক্রমাগত প্লট ভেবে চলেন, কিন্তু একটিও তাঁর মনের খাঁচায় ধরা দেয়না। তিনি বিচলিত হয়ে ওঠেন।

সময় নেই আর। সেদিন ঘুম থেকে উঠতে দেরি হয়ে গিয়েছিল। কাজের লোক, সুরনাথ ঘুময় সকাল নটা পর্যন্ত—তার আগেই তিনি বাজার করে আনেন। নিজেই চায়ের জল গরম করে দুকাপ চা তৈরী করে সুরনাথকে

ডাকেন। সুরনাথের বয়সও কম হলনা—ষাট ত হয়েই গেল। অনেক রকম অসুখ তার। তার মধ্যে একটা হল রাত্রে ঘুম না হওয়া।

বাজারে যেতে যেতে তাঁর হঠাৎ একটা প্লট মাথায় এল একটা আম গাছের তলায় দাঁড়িয়ে। কলকাতার পথের ধারের আমগাছটা তাঁর বহুদিনকার বিস্ময়ের ব্যাপার। এখানে এসে তিনি অনেকদিনই দাঁড়িয়ে পড়েন। একটা সিগারেট ধরিয়ে কত কি ভাবতে থাকেন। ভাবতে ভাবতেই তাঁর মনে একটা প্লট এল। বেশ জমাটি প্লট। তিনি খুশি হয়ে বাজারে যান।

বাজার থেকে দু একটা জিনিস কেনা কাটা করে তিনি ফিরতে থাকেন। আমগাছের তলায় আবার এসে দাঁড়ান। একটু পরেই আবার হাঁটেন। তালা খুলে বাড়িতে ঢোকেন। এবারে সুরনাথকে তিনি জাগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন—ও সুরনাথ, একটু ওঠ নারে—কতক্ষণ আর ঘুমাবি? কিন্তু সুরনাথ ঘুমাতেই থাকে! যাকৃগে, বলে রবীনবাবু হাত পা মুখ ধুয়ে ঘরে ঢোকেন। তারপর গোলাপী রঙের একটা বড় প্যাড নিয়ে টেবিলে রাখেন। চেয়ারে বসে তিনি লিখতে যান। কিন্তু হঠাৎ তিনি বুঝতে পারেন—না, সে প্লটের কিছুই আর তাঁর মনে নেই। একেবারে ধোয়া মোছা!

তিনি অবাক হন। এই তো কয়েক মিনিট আগে তাঁর মনে সবটাই এসে গিয়েছিল প্লট। কোথায় হারিয়ে গেল? আকাশ বাতাস চিন্তা করতে করতে তিনি থই পাননা। তিনি ভাবতে থাকেন একটু ঐ আমগাছের তলায় গিয়ে ঘুরে আসি না? বোধহয় ওখানে গেলেই আবার মনে পড়বে। চটি পরে দরজা খুলে বেরিয়ে পড়েন তিনি।

বেলা দশটার সময় একটা হৈচৈ গণ্ডগোল শুনে সুরনাথ উঠে পড়ল। কারা যেন দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে। তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দিল।

পাড়ার ভবনাথ বলল—রবীনবাবু রাস্তার ধারে মরে পড়ে আছেন। ডাক্তার বলছেন হার্ট অ্যাটাক। এই একটু আগে ঘটেছে ব্যাপারটা। অ্যামবুল্যানস ডাকা হয়েছে। কিছু অসুখ টসুখ হয়েছিল নাকি রবীনবাবুর? ওঁর ছেলের ঠিকানা জানো?

রবীনবাবু কি গল্পের প্লট খুঁজে পেয়েছিলেন?

মৃত্যুর ফেরিওলা

হীরক রায়

ট্রেনটা আসতেই ওরা হুড়মুড় করে উঠে পড়ল। একসঙ্গে অনেকে ছিল। প্রত্যেকেরই হাতে কিংবা কাঁধে চালের পুটলি। নেমো স্টেশনের এই চাল চলে যাবে শেওড়াফুলির বাজারে। সব চালই যে যেতে পারবে এমন কোনো কথা নেই। মাঝে মাঝে চেকিং হয়। তখন সামলে-সুমলে ঢেকে-ঢুকে রাখতে না পারলে সব গচ্চা। গোটা দিনের পরিশ্রমটাই অর্থহীন হয়ে যায়। চলে যায় সঙ্গে পুঁটলির কাপড়টাও।

ছেলেরা সব ছিটকে পড়ে ট্রেন এলে। কেউ বগির নীচে ছোট্ট খোপে লাইনের অল্প ওপরে বসে পড়ে, কেউবা দুই কম্পার্টমেন্টের মধ্যে শান্টিং-এর জায়গা-টুকুর মধ্যে। মাত্র দু-মিনিট তো সময়। এরই মধ্যে গুছিয়ে মাল তুলতে হবে। লুকিয়ে থাকতে হবে, চোখ এড়াতে হবে। মাল পাচার না হলে পেটের দানা জুটবে না। বাজারের যা হাল। আকাল আর কাকে বলে?

ট্রেনটা ছাড়ল। ছোটার মুখেই চিৎকারটা শোনা গেল। কে যেন নীচে পড়ে গেছে। শীতের সন্ধ্যে। কুয়াশা আর অন্ধকারে স্টেশনের মিটমিটে আলো-গুলো আরও নিষ্প্রভ দেখাচ্ছে। দরজায় যারা দাঁড়িয়েছিল তাদের চোখে উৎকণ্ঠা। সবাইকে ঠেলে এগুতে চেষ্টা করল চারজন মহিলা। বয়স সকলেরই তিরিশের ঘরে বলে মনে হয়। পরনের কাপড় ময়লা। কোমরে কিংবা হাতে চালের পুঁটলি। একজন চেঁচিয়ে বলল, কে পড়ল, দেখলেন কিছু!

কে যেন উত্তর দিল, বোঝা যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে কোনো ছোট ছেলে।

—ওরে, সন্তুরে। চিৎকার করে উঠল একজন মহিলা। বোঝা গেল সন্তুর মা।—ওই ছেমরাই দুই বগীর মাঝখানে বইছিল। নির্ঘাৎ ওইখান থিকা গড়াইছে। কান্নার সন্তুর মার গলা বুজে এল। —আমি কইছিলাম ঐখানে বসিস না। একদিন কাটা পড়বি শেষকালে, নিশ্চয়ই ওই কাটা গেছে।

দলের অন্য এক মহিলা সামনের ভদ্রলোকের পিঠে ক্রমাগত হাত দিয়ে ধাক্কা দিতে দিতে বলল, আচ্ছা, যে পড়ে গেল তার কি নীল প্যাণ্ট আর গেঞ্জি পরা ছিল।

কেউ কোন উত্তর দিল না। সন্তুর মা শুধু চিৎকার করে কেঁদে চলল।

—কেউ বলছেন না কেন। বলুন না। যে পড়ে গেল সে কি নীল প্যাণ্ট আর গেঞ্জি পরে ছিল?

একজন হিন্দুস্থানীর বোধহয় দয়া হল। বলল, মালুম নেই কোনসা কামিজ পিনা হ্যায়। লেকিন ছোকড়া লোক।

মহিলাটি চিৎকার করে কেঁদে উঠল, নির্ঘাৎ ক্ষেতু। ক্ষেতুই গেছে। হায় আমার কপাল রে, ক্ষেতুও গেল।

আর দুটি গলা পাওয়া গেল, একজন মনুর নাম ধরে অন্যজন পানুর নাম ধরে কেঁদে উঠল।
কামরায় অন্য কোন শব্দ ছিল না। কেউ কোন কথা বলছিল না। শুধু চার মা চার ছেলের নাম ধরে চিৎকার করে কাঁদছিল।
চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে নামছিল। পরনের কাপড় ফালাফালা। পানুর মার গলা সবাইকে ছাপিয়ে গেল। —ওরে পানুরে। ছেলেটা আজ সকালে বলল, মা পান্তা খাবো। ছিল না। দিতে পারি নি। রাগ করে কিছু খায় নি। রাগ করে আমার সঙ্গে আসে নি। আমার আগে-আগে থেকেছে। নির্ঘাৎ ও-ই গেছে। ভাঙা গলায় কান্না-মেশানো চিৎকার করতে করতে পানুর মা এক সময়ে বিলাপ বন্ধ করল। মাঝে মাঝে শুধু ডুকরে উঠতে লাগল।
—আমার কপালই এমন। ক্ষেতুর মার গলা বুজে আসছিল কান্নায়। ঘড়ঘড়ে শব্দ। ঘেঁটুও কাটা পড়েছিল। আমার কপাল। আমি চাল তুলছিলাম। ঘেঁটু তুলে দিচ্ছিল। হ্যাঁচকা টান দিয়ে ট্রেন ছাড়ল। চালের বস্তা ছিটকে গেল। চোখের সামনে ঘেঁটু লাইনের নীচে চলে গেল। আমি পেটে ছেলে ধরি শুধু ট্রেনে কাটা পড়ার জন্য। ক্ষেতুর মা জোরে-জোরে পেটে চাপড় দিল। পেট। পেটটাই আমার শত্রু। এই পেটের জন্যই চাল নিয়ে বের হই। এই পেটের ধান্ধাতেই পেটের ছেলেরা ট্রেনের তলায় কাটা পড়ে।
মনুর মার চোখ লালচে হয়ে গেছে—হাত দিয়ে চোখ ঘসতে ঘসতে। চোখ জলে ঢাকা পড়ে যাচ্ছে।—আজকে ওর শরীরটা খারাপ ছিল। বললাম, মনু বেরুস না। ওরে মনুরে। কোন কথা শুনল না। দুর্বল শরীর। ও-ই গেছে। কি যে সর্বনেশে অভ্যাস ওই একরত্তি রডে বসা। বলেছি বার বার। তবু শুনলে তো আমার কথা! আজকে এই চাল নিয়ে গেলে কাকে খাওয়াবো? মনুরে তুই গেলি—আমাকে সঙ্গে নিতে পারলি না।
দলে অন্য যারা ছিল তারা অসহায় ভাবে তাকিয়েছিল চার মায়ের দিকে। তারা এখন কিছুটা অসতর্ক। চালের পুঁটলি বেরিয়ে গেছে। লুকোবার কথা মনে নেই। বয়স্কা দু-জনে এগিয়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল চার মায়ের পিঠে।
এ রকম সময় সান্ত্বনার কথা শরীরে হুল ফোটায়। একা চিৎকার করে কাঁদতে পারলে যেন বুকের চাপ-চাপ জমাট ব্যথাটা কিছু কমে। তবু সান্ত্বনা লোকে দেবেই, আর শুনতেও হয়। একজন বৃদ্ধা বলল, আহা কে পড়েছে তার তো ঠিক নেই। তোমরা সবাই ভাবছো কেন তোমাদেরই ছেলে। অন্য কেউও তো হতে পারে।
চার মা একই সঙ্গে চিৎকার করে কেঁদে উঠে বলল, না। নাগো, আমারই কপাল গেছে।
বৃদ্ধা আবার বলল—কিন্তু একটাতো মাত্র ছেলে পড়ে গেছে। মারা গেছে কিনা তারও ঠিক নেই। তাই না?

বৃদ্ধার কথা শেষ হতে চার মা মুহূর্তের জন্য থামল।—তাই তো, যদি বাঁচে! কিন্তু বুকের সেই গুমরে ওঠা ব্যাথাটা গলা দিয়ে আবার চিৎকার হয়ে বেরুল। নোনা জলে ভিজল গাল। চার মা একই সঙ্গে পুত্র বিয়োগের যন্ত্রণায় ককিয়ে চলল।

ট্রেন যখন চলে তখন বাইরের শব্দ ভেতরে আসে না। শুধু ট্রেন চলার শব্দ একই সঙ্গে ক্রমাগত শোনা যায়। অন্যান্য দিন হকাররা নানা জিনিসপত্র নিয়ে আসে। অদ্ভূত সব ভাষায় আর কায়দায় বিক্রি করে। কিন্তু এই কামরায় আজ কেউ কিছু ফেরি করল না। যারা উঠেছিল তারাও চুপচাপ রইল। পরের স্টেশন এলে তারা নেমে যাবে।

প্রতি ট্রেনে এমন ঘটনা ঘটে না। প্রতিদিনই যে ঘটে তাও নয়। তবে নিত্যযাত্রী যারা তাদের অনেকটা গা-সওয়া হয়ে গেছে। কাটা গেলে আজকাল আর সহসা ট্রেন দাঁড়ায় না। গতি বড্ড বেশি! তাই দাঁড়াতে অন্য স্টেশনের মুখ দেখা যায়। তখন আর ফেরার কোনো মানে হয় না।

হঠাৎ ট্রেনের গতি থেমে এল। চার মা সেই দুই বৃদ্ধাকে বলল, আজ তোমরা সব সামলাও। এখানেই নামি। পরের ট্রেনে ফিরে গিয়ে দেখিকার কপাল পুড়ল। মনুর মা ডুকরে উঠল, মনুরে, সন্তুর মা কপাল চাপড়াল, সন্তুরে ক্ষেতুর মা চিৎকার করে উঠল, ওরে আমার ক্ষেতু রে।

বৃদ্ধা দু-জন এবং অন্য সকলে অভয় দিল। ওরা চারজন নেমে গেল। বাকিরা দরজায় দাঁড়িয়ে ওদের দিকে তাকিয়ে রইল। চারজন কাঁদছে। ওরা দেখল। চারজন সামনের গাছের নীচে বসল। ওরা দেখল। ট্রেন ছাড়ল। ওরা চলল। একই সঙ্গে ওরা প্রায় সবাই দীর্ঘশ্বাস ফেলল। গভীর ভাবে। যারা নেমেছিল তারা চলে গেল। খোলা আকাশের নীচে চার মা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসে রইল। চারপাশে আর কোনো লোকজন ছিল না। দূরে কোথাও একটা শিয়াল ডেকে উঠল। পরের ট্রেন না আসা পর্যন্ত এখন এখানেই বসে থাকতে হবে। যতক্ষণ ট্রেন না আসে ততক্ষণই যেন ভাল। ট্রেন এলেই তো যেতে হবে। আর গেলেই তো দেখতে হবে।

সে দিনও এই রকম নিঃঝুম অন্ধকার ছিল—ক্ষেতুর মার গলা যেন বহুদূর থেকে ভেসে এল। একটু পরে চাপাকান্না আরও পরে চিৎকার করে সে কান্নায় ভেঙে পড়ল—আর মাত্র তিন স্টেশন। তারপরই বাড়ী। আমি বললাম, ঘেঁটুরে তুই পরের ট্রেনে আয়। কিন্তু কপাল! মরণ তখন তারে ডাকছে। সে কি শুনবো আমার কথা। কইল, না তোমার লগেই যামু।

কৃষ্ণচূড়া গাছ থেকে ঝুরঝুরে পাতা উড়ে এসে পড়ল। চারদিক চুপচাপ। ক্ষেতুর মার কান্না যেন আর থামবে না। মনুর মা বললো, মনুর বাবাকেও তো একদিন ট্রেন খেতে চেয়েছিল। বিরাট মানুষটা ছিটকে পড়ে গেল লাইনের ওপারে। একটা পায়ে বাড়ি মেরে ট্রেনটা চলে গেল। —ক্ষেতুর মা কান্না

থামিয়ে মন্নুর মার কথা শুনতে লাগল। —সবাই বলল, গেল। আমার দিকে তাকিয়ে মানুষটা বলল, কোনো ভয় নেই। পায়ে একটু লেগেছে। ধর তো আমাকে একটু! লোকটা আমাকে ধরে উঠতে গিয়ে চিৎকার করে পড়ে গেল। শক্ত লোহার মত পাথর ওর পাঁজরে মাথায় লাগল। রক্তে পা ভেসে যাচ্ছে দেখলাম। লোকজনেরা ধরাধরি করে ডাক্তারখানায় নিয়ে গেল। কত ইঞ্জেকশন দিল। ব্যাণ্ডেজ দিল। কিন্তু শেষ রাত্রে এল কাঁপিয়ে জ্বর। শরীরে খিঁচ ধরে গেল। খিঁচ ধরেই চোখের সামনে কাঠ হয়ে গেল। তাও তো সয়েছিলাম। কিন্তু মনু! —মনুর মার গলা ভেঙে গেল—এখন তুইও চলে গেলি। এখন কি নিয়ে থাকবো? কার মুখ চেয়ে সইবো?

পানুর মা হঠাৎ বলে উঠল, আমি আর বাড়ী ফিরবো না। কথাটা বলেই সে ডুকরে কেঁদে উঠল। যদি পানু-ই মারা যায়, নির্ঘাৎ ও-ই গেছে, তাহলে আমিও ট্রেনের নীচে গলা দেব। ছেলেটা একমুঠ ভাত চেয়েছিল। দিইনি। দিতে পারিনি। এখন আমার গলা দিয়ে ভাত নামবে কেমন করে! এত লোককে সাপে কাটে, কলেরায় মরে, আমার আর কিছুতেই মরণ নাই। —মুহূর্তের জন্য থেমে আবার সে ডুকরে কেঁদে উঠল। ভাঙা গলায়, চাপা কান্নায় আর্তনাদ উঠল, ওরে আমার পানুরে।

সন্তুর মা ফিসফিস করে ক্ষেতুর মাকে বলল, দিদি, কাটা পড়ার পর ঘেঁটুকে চেনা গিয়েছিল?

হু-হু করে কেঁদে উঠল ক্ষেতুর মা। কিছুক্ষণ কেঁদে সে মাথা নাড়ল,—না, ঘেঁটুরে একদম চেনা যায় নাই। কাইটা ফালা ফালা হইয়া গেছিল। লাল চাপচাপ দলা মাংস। জুতা আর পায়ের খানিকটা দেইখা চিনছিলাম। মাথা, মুখ কিছুই আর খুঁজা পাই নাই। ক্ষেতুর মা আবার কাঁদল। বুকফাটা কান্না।

দূরে আলো দেখা গেল। আলোটা এগিয়ে আসছে। চার মা এগিয়ে কামরায় উঠল। ট্রেন ছাড়ল। ট্রেনটা ছুটতে শুরু করতেই চার মা'র কান্না হঠাৎ একদম থেমে গেল। মুখ থমথম করতে থাকল। বুকের ধুপুর-ধাপুর শব্দটা যেন ভীষণ ভাবে বেড়ে গেল হঠাৎ। কেউ কারো দিকে তাকালো না। চার মা বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে রইল। জমাট কান্নায় চার জোড়া চোখ ছলছল করছিল।

নেমো স্টেশনটা খুব ছোট। নতুন হয়েছে। এখনও পাকা হয়নি। শালবল্লা আর সিণ্ডার ডাস্ট দেওয়া এই প্ল্যাটফর্মে লোক ওঠে কম, নামেও কম। ট্রেনটা এক দমে নেমোতে পৌঁছুতেই চার মা ছিটকে নেমে পড়ল। সন্তু একটা নুড়ি কুড়িয়ে খেলছিল। সন্তুর মা তাকে দেখতে পেয়ে ছুটল। অন্য তিন মা তার পিছুপিছু।

সন্তুর মা সন্তুকে জড়িয়ে ধরল। ইতিমধ্যে ট্রেনটা চলে গেছে। ওপাশের

লাইনে কাটা দেহটা পড়ে আছে। ফালি ফালি হয়ে গেছে। ক্ষেতুর মা সেদিকে তাকিয়ে ডুকরে উঠল। মনুর মা সন্তুকে ধাক্কা মেরে বলল, সন্তু বল তো কে কাটা পড়েছে? দেখেছিস? দেখেছিস? বল না। মনুই গেছে। মনুরে!

সন্তু একবার মার দিকে একবার মনুর মার দিকে তাকাল। পানুর মার তর সইছিল না। কাঁদতে কাঁদতে বলল, সন্তুরে, বল, বল কে মারা পড়ল।

সন্তু আঙ্গুল তুলে মৃতদেহের দিকে দেখিয়ে বলল, ঐ যে ওটা!

তিন মা একসঙ্গে বলে উঠল, হ্যাঁ হ্যাঁ, বল কে কাটা পড়ল।

এবার সন্তু হেসে ফেলল, বলল, যাঃ, ওটা তো একটা কুকুর তোমরা যে ট্রেনে গেছ সেই ট্রেনে কাটা পড়েছে।

চার মার কান্না যেন এক ধাক্কায় হঠাৎ থেমে গেল। চার মা আর সন্তু সেই ফালি ফালি হয়ে কেটে যাওয়া কুকুরটার দিকে এগিয়ে গেল। কুকুরটার সামনে গিয়ে ক্ষেতুর মা আবার চিৎকার করে কেঁদে উঠল। কপাল চাপড়ে বলল, আমার ঘেঁটুর বেলায়ও কেন এমন একটা কুকুর কাটা পড়ল না।

মরা কুকুরটার পাশে ওরা দাঁড়িয়ে রইল। ক্ষেতুর মা ঘেঁটুর নাম করে ডুকরে ডুকরে কাঁদল। অনেকক্ষণ।